রূপসী রাত্রি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা—৯।

বর্তমান বৎসরের শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায় "রূপসী রাত্রি" প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে তার পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে।

ফাল্গুন, ১৩৬৫

১

এখানে একটি নদী আছে না? সেই দিকে নিয়ে চলো।

আহা, কি না-জানি নাম নদীটার। কথায় কথায় কতবার বলেছে। দু অক্ষরের ছোট নাম ডাক-নাম। কে আর তখন নদীর নাম শোনে, নদীকেই প্রত্যক্ষ ক'রে। সে-নদী কথার নদী, হাসির নদী, স্তব্ধতার দুই পারে সান্নিধ্যের নদী।

খরা না ক্ষীরা, আশ্চর্য, মনে করতে পারছে না। তবু ডাক-নামটি শুনলে বোবা মনও গুন গুন করে ওঠে। দূরের মানুষ চলে আসে কাছটিতে।

'তোমাদের এখানে নদীর নাম কি?' রিকশাওলাকেই জিগগেস করল সুপ্রভাত।

'খড়ে।' বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললে রিকশাওলা।

কি উদ্ভট নাম কদাকার নাম। ডাক-নামের কোনো জাতধর্ম নেই, অর্থানর্থ নেই, যা মনে আসে, যা মুখে আসে রেখে দিলেই হল। ভেবে দেখেও না, এর ফল কি দাঁড়াতে পারে কি ভীষণ পস্তাতে পারে মানুষ। সারা জীবন একটা ভয় বা লজ্জা হয়ে থাকতে পারে ডাক-নাম। বিদ্রুপের কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকতে পারে চিরদিন।

কিন্তু যেই মুহূর্তে অনুরাগের সুরটি এসে লাগবে, কোথায় বা বিদ্রূপের খোঁচা, কোথায় বা লজ্জার কুয়াশা। অনুরাগের সুরটি আনবার জন্যেই তো ডাক-নাম। পোশাকিকে আটপৌরে করা। সরকারিকে ঘরোয়া। যা জবড়জঙ্গ, তা নিমেষে খোলসা করে দেওয়া।

সোহিনীর ডাক-নামটি না জানি কি।

আশ্চর্য, এতদিন জিগগেস করেনি কি বলে! মনে হয়নি বুঝি? কেন মনে হবে না? কে বলেছে? আজ বুঝি এতদিন পরে খোঁজ নিতে ইচ্ছে জাগছে? [illegible] অনায়াসে বলা যায়। একবার না, একশোবার। [illegible] নিয়ে। যখন-তখন।

'খড়ে! সে আবার [illegible] কি নাম!' আপত্তি জানাল সুপ্রভাত, 'খড়িমাটির দেশ তো আর নয়। তা কি প্রচুর খড় হয় এ-অঞ্চলে?'

'কিন্তু মশাই, ভালো নামটি ভারি সুন্দর।' স্টেশনের বাইরে রিকশা-স্ট্যাণ্ডের সামনে যে ভিড় হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে কে একজন বললে।

'কি ভাল নাম?'

'জলাঙ্গী।'

জলাঙ্গী! যেন চমকে উঠল সুপ্রভাত। এমনও একটা নাম হয় নাকি নদীর? এমন গভীর মদির নাম!

জলাঙ্গী নাম নদীর না হয়ে সোহিনীর হলেই ঠিক হত। ঐ নামটির মতই সে ঠাণ্ডা, নম্র, ধীরস্থির। তার অঙ্গে জল, চক্ষে জল, অন্তঃকরণে জল।

'জল কোথায় মশাই?' কে আরেকজন নামের বাচ্যার্থে বিরক্তি জানাল, 'একটা ছিটেফোঁটাও নেই। মাঠঘাট খাক হয়ে গেল। গরু-বাছুর পার হচ্ছে এখন পায়ে হেঁটে।'

'কিন্তু বর্ষায়? যখন বর্ষা নামবে?'

বক্তাদের চোখের দিকে তাকাল সুপ্রভাত। দুজনের চোখেই ভয়ঙ্করের স্পর্শ।

'তখন আর দেখতে হবে না। মরা নদী রণচণ্ডী হয়ে উঠবে। দুকূল ছাপিয়ে যাবে উন্মাদের মত। গেল বছরই কি হল বলুন না।' একজন তাকাল আরেকজনের দিকে: 'বন্যায় ভাসিয়ে দিল দেশ-গাঁ। তখন সে আরেক চেহারা।'

তখন আর জলাঙ্গী নয়, তখন তরঙ্গাঙ্গী। তখন চোখে ক্ষুধা, বাহুতে বিস্তার, নিঃশ্বাসে মন্ত্রণা। তখন শুধু এক উত্তাল অশান্তি।

এই অশান্ত মূর্তিটিই দেখতে বড় সাধ সুপ্রভাতের। ঝড়ের রাতে মাথাকোটা অন্ধ নদীর চেহারা। এতদিনের প্রতিবেশিতায় নদীর নামই নিল সোহিনী, রূপটি নিল না। জল তো খালি শীতল নয়, জল প্রবলও। কখনো-কখনো নখে-দাঁতে দুর্দান্ত।

সোহিনী শুধু বলে, 'ধৈর্য ধরো।' বলে একটু হাসে। আবার বলে, 'শুধু এটুকু বলবার জন্যেই কত ধৈর্যের প্রয়োজন। কত ধৈর্যের পথ হেঁটে এসেই না তবে বলা যায়, ধৈর্য ধরো।'

'সোহিনী, তুমি কি কৃপণ, কি কঠিন!'

'আমি ধরিত্রী। আমি সহিষ্ণুতা।'

'আর আমি?' চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সুপ্রভাত: 'পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে।'

হেসেছিল সোহিনী। বলেছিল, 'তুমি কি রঙের সদাগর? তুমি

সুগন্ধের সদাগর। তাইতেই তো তোমার অনেক শক্তি, অনেক সুধা।'

সেবার আসানসোলে কোন এক দিদির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল সোহিনী। খবর পেয়ে সুপ্রভাতও পিছু নিয়েছিল। যে-যে জায়গা যে-যে দিন দেখতে যাবার কথা সোহিনী ঠিক-ঠিক নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রভাতকে। সুতরাং সরজমিনে উপস্থিত হযে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে ভাব করে নিতে সুপ্রভাতের বেগ পেতে হয়নি। তারপর সেই সেতু ধরে সহজেই খুঁজে পেয়েছিল স্বভাবকে।

একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে পড়েছিল সোহিনী। ঝোপে-ঝাড়ে বাঘ-ভালুক আছে, এমন উড়ো খবর কে না শুনেছে সে-অঞ্চলে! কিন্তু ভারি একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে জানোয়ার ভেবে সোহিনী সত্যিই আঁতকে উঠেছিল। তাকিয়ে দেখল, আর কেউ নয়, সুপ্রভাত।

একমুখ হাসি নিয়ে বললে, 'এস।'

ঘাসের উপর পাশ ঘেঁসে বসল সুপ্রভাত।

সোহিনী বললে, 'ঐ দূরের পাহাড়টা দেখছ! দূর বলেই কেমন সুন্দর, তাই না? যেন একটা মখমলের তাঁবু। মনে হয় ঐখানে গিয়েই থাকি। কিন্তু কাছে গেলেই দেখব, শুধু পাহাড় আর জঙ্গল, শুধু কর্কশের সমাবেশ, নিষেধের কাঁটাতার। নিকটই রূঢ়, দূরই মনোহর। তাই না?'

'পুরোপুরি নয়। কাছের পাহাড়েরও একটা রূপ আছে, মহিমা আছে।' সোহিনীর একখানি হাত তুলে নিল সুপ্রভাত। ঘামে-নরম লতানো এলানো হাত নয়, স্পষ্ট, শক্ত, বিশুদ্ধ হাত। নিস্পৃহতায় বিশুদ্ধ। বললে, 'দূরে মদিরা, কিন্তু কাছেই খাদ্য। আর খাদ্য ছাড়া প্রাণ বাঁচে না সোহিনী।' একটু কি নিজেব দিকে আকর্ষণ করতে চাইল সুপ্রভাত? নিস্পৃহ নির্মম হাতে আনতে চাইল কি একটু সমর্পণের উষ্ণতা?

'ধৈর্য ধবো।' হাতের ঔদাসীন্যে শৈথিল্য ঘটতে দিল না সোহিনী। বললে, 'কালের ফলই মিষ্টি, অকালের ফল তেতো।'

'কালের ক্যালেণ্ডার নিয়মের দেয়ালে টাঙানো থাকে না কোনোদিন। যদি মন্ত্র ঠিক থাকে, অকাল-বোধনেব পুজাও সফল হয় সোহিনী।'

'হয় না। মন্ত্রে ভুল হয়ে যায়। চঞ্চল হতে গেলেই উচ্চারণে ছন্দচ্যুতি ঘটে।'

বড় বেশি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে অবাস্তবের কুহকে।

সরল সাদামাঠা হবার চেষ্টা করল সুপ্রভাত। কাছে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কেউ নেই ধারে-কাছে।'

'কে বললে?' সুন্দর করে হেসে উঠল সোহিনী। গায়ের আঁচলটা একটু টান করে সরে বসল, আঁচল তো নয় একটা যেন শক্ত পাথরের দেয়াল। বললে, 'আমারাই তো আছি। আমরাই তো দেখছি আমাদের। আমরাই বা আমাদের কী বলব।'

অসম্ভব। স্নায়ু শিরায় ছটফট করে উঠল সুপ্রভাত। দস্যুর মত ভেঙে দেওয়া যায় না এই নিষেধের দুর্গ, এই নিষ্প্রাণতার স্তূপ?

আবার সেই পুরোনো সুরে ফিরে গেল সোহিনী: 'শোনো, শুধু খিদে পেলেই চলে না। খাওয়ারও একটা পরিবেশ চাই পরিবেশন চাই। ভুখা কি দুহাতে খায়? শোনো, ধৈর্যই সুর, ধৈর্যই লাবণ্য।' যে ছেলের ঘুম আসে না তাকে যেমন তার মা ঘুম পাড়ায় তেমনি স্নেহ যেন সোহিনীর স্বরে।

মাটির থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল সুপ্রভাত। বললে, 'ধৈর্য-ধরার সাধন আমার নয়, আমার বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন।'

চোখের কোণে ছোট্ট একটু হাসির ঝিলিক তুলল সোহিনী। 'বাঁধন আগে পড়ুক—'

'সে তো বৈধতার কথা, স্বত্ব-স্বামিত্বের কথা। এই যে এখন একটু নিষেধের শীত, আবরণের কুয়াশা, অনধিকারের খোলা মাঠ, জীবনে এ-পরিবেশ আর পাব কোথায়?' কি রকম প্রার্থীর মত শোনাল সুপ্রভাতকে।

কানের কাছে মুখ আনল সোহিনী। স্বর গাঢ় করল। 'বলি—

সুপ্রভাত উন্মুখ হয়ে রইল।

'বলি, চাকরি জোটাতে পেরেছ?'

যেন মুখের উপর প্রহার করল প্রশ্নটা। কথার মধ্যে যেন ব্যঙ্গের বিষ ঢালা। তোমার চাকরি বাকরির কদ্দুর—এমনি একটা মোলায়েম প্রশ্নই যেন উপযুক্ত ছিল। কিংবা কাজের জন্যে এত যে চেষ্টাচরিত্র করছ কোথাও হল কোনো সুবিধে? কোথাও আশা পেলে? তা নয়, বৃশ্চিক-দংশন, গ্রাস যে মেলেছ আচ্ছাদন আছে? পাহাড়ে যে উঠতে চাইছ আছে তোমার নিশ্বাসের ক্ষমতা?

গম্ভীর হয়ে গেল সুপ্রভাত। মনে হল, তার যদি শক্তি থাকত, যদি কাঁদাতে পারত সোহিনীকে। যদি তাকে ব্যাকুলতায় কাদা করে ফেলতে পারত!

যদি বলাতে পারত, তোমার নিটোল আর্থিক সাফল্যকে নয়, তোমার

সামাজিক মূল্যবত্তাকে নয়, খাঁটি তোমাকেই ভালোবাসি। যদি বলাতে পারত, তুমি পাশে থাকলে ঝড়ের রাতে হালভাঙা হালহীন ডিঙিতে ভেসে পড়তে পারি সমুদ্রে। যদি বলাতে পারত, তুমি যদি দূরে থাকো তা হলে চিরন্তন রাত্রি শবরীর মত জেগে কাটাই।

যে করে হোক চাকরি একটা যোগাড় হবেই। তারপর দেখা যাবে। দেখা যাবে উচাটন করা যায় কিনা সোহিনীকে, তার দুই চোখে আনা যায় কিনা কান্নার ভরা কোটাল!

কাঁদাবে অথচ নিজে কাঁদবে না এ কেমনতরো কথা! সুপ্রভাতের ইচ্ছে হয় এমন একটা মামলা দেখতে যেখানে মেয়ে আকুল অথচ পুরুষ কঠিন। সুপ্রভাত নিজে কেন এমন হতে পারল না? সে বেশ কল্পনা করে আনন্দ পায় সোহিনী তার জন্যে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে আর সে চোখ ফিরিয়েও দেখছে না। কত সোহিনীর সাধ্যসাধনা আর সুপ্রভাত নিশ্ছিদ্র নিশ্চুপ। বেশ ভালো লাগে ভাবতে। কিন্তু তা কি হবার? একটু চেষ্টা করে দেখলেই বা ক্ষতি কি। কঠিন হয়েই তো কঠিনকে ভাঙতে হয়। মুখ ফিরিয়ে নিলেই তো দেখা যায় বিমুখকে। প্রত্যাখ্যানই ঔদাসীন্যের প্রতিষেধ। সুপ্রভাতের ইচ্ছে হয়, গম্ভীর হয়, অপমানিত বোধ করে, 'আচ্ছা তুমি বোস' বলে উঠে পড়ে সহসা।

কি দরকার। তবু এখনও তো কাছে রেখেছে, ঘা দিতে গেলে কে জানে হয়তো পথে বসাবে!

বড় ভয় করে সুপ্রভাতের। রৌদ্র হয়ে সে ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছে, যদি সে-ছায়াটি তার জীবনে না পড়ে। সুরের লোভে ঢিলে তার আঁট করতে গেলে তারটুকু না ছিঁড়ে যায়।

কি দেখেছে সে সোহিনীর মাঝে! যদি তা সে জানত। যদি কেউ জানত!

দাঁড়াও না। এর শোধ তুলব। পুরুষ মানুষ আকাশ ফুঁড়ে না হোক মাটি খুঁড়েই চাকরি যোগাড় করব একটা। তারপর বিয়ে করব। উদ্ধতকে বশীভূত করব, বিশুদ্ধকে বিলোড়িত। দেখব তখন কোথায় থাকবে স্পর্ধা কোথায় বা অনুকম্পা!

হ্যাঁ, ধৈর্য না ধরে উপায় নেই।

'এই যে তোমরা এখানে।' দিদির দেওর স্বয়ম্ভু গাঙুলি পাইপের খোদলটা হাতের মুঠোতে চেপে ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। 'জানি পাখিরা দাঁড় ছেড়ে ডালে এসে বসেছে। এবং বেশ মগডালে। ইউরোপেও তাই দেখেছি—'

'এ দেখতে ইউরোপে যেতে হয় না।' উঠে পড়ল সোহিনী। স্যাণ্ডেলে পা ঢোকাতে-ঢোকাতে বললে, 'ভিড় যদি মনঃপূত না হয় তাহলে না পালিয়ে উপায় কি।'

'তাহলে তো একলা পালায়।' পাইপ মুখে না থাকলেও দাঁতের দু পাটি প্রায় যুক্ত করে কথা বলারই অভ্যেস স্বয়ম্ভুর: 'দুটিতে মিলে কেটে পড়ে কে?'

'একলা পালানো মানে ছোটা,' সোহিনী বেশ হাসিহাসি মুখে বললে, 'দুটিতে পালানো মানেই ছুটি।'

এ তো পষ্টাপষ্টি সুপ্রভাতের পক্ষ ধরেই কথা বলছে সোহিনী। আর সকলকে নিয়ে তার ভিড়, সুপ্রভাতকে নিয়েই তার ছুটি, এ তো শুধু স্বীকারোক্তি নয়, এ ঘোষণা। এ প্রায় সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিদ্রোহীর কথা। তবু ভয় যায় না সুপ্রভাতের। এখনো তার চাকরি হয়নি। আর স্বয়ম্ভু চাকরির মনিহারি দোকানের শো-কেসের জিনিস। একটা বিদেশী ফার্মের উপরতলার চাকুরে। তারপর এখনো একক। সুতরাং সর্ব অর্থে বলবান।

'তাহলে রসভঙ্গ করলুম বলো।' করুণায়-তাকানো বিজ্ঞের মত বললে স্বয়ম্ভু।

'ভঙ্গ ছিল বলেই তো রসের এত দাম।' বেশ সমানে-সমানের মত বলছে সোহিনী 'কাজের পর-পর দেয়ালগুলো ছিল বলেই তো ছুটিটা মাঠের মত।'

'বেশ, তবে ছোটো মাঠ দিয়ে।' ডান হাতটা অর্ধেক শূন্যে তুলে হতাশার ভঙ্গি করে স্বয়ম্ভু বললে. 'গাড়ির দেখা নেই।'

'একটারও নেই?'

'স্টেশন-ওয়াগনটা আছে।'

'আপনারটা?' ক্লান্ত চোখ তুলে ধু-ধু-ধু রাস্তার দিকে তাকাল সোহিনী।

'সেই যে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল আর দেখা নেই।'

'ফিরে আসতে বলেননি?'

'বা, বলেছিলাম বইকি। ঘণ্টাখানেক পরেই ফেরবার কথা।' স্বরে উদ্বেগ ফুটল স্বয়ম্ভুর, 'এখন তো সন্ধে প্রায় হয়-হয়।'

'আপনার কি রকম ড্রাইভার?' প্রায় ধমক দিয়ে উঠল সোহিনী, 'সময়ের দাম জানে না? কথার মান রাখে না? আর তাকে ঘণ্টাখানেকের ছুটি দেবারই বা কি হয়েছিল? এসেছিল, ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে পার্ক

করে। যে-কাজে এসেছে সে-কাজ করে যাবে। এক কাজ করতে এসে আরেক কাজ কেন?'

আশ্চর্য, কি রকম করে কথা বলছে দেখ! যেন গাড়ির মালিক স্বয়ং সোহিনী আর স্বয়ম্ভু ড্রাইভার। বুকটা দুরদুর করে উঠল সুপ্রভাতের। যেখানে এমনি দাপটে কথা বলা যায় সেখানে সম্পর্কটা না-জানি কোন স্তরের।

স্বর একটু সঙ্কুচিত করল স্বয়ম্ভু। বললে, 'গাড়িটা কোম্পানির। কাছেই একটা জরুরি কাজ সারতে গেছে।'

'কোম্পানির?' খিলখিল করে হেসে উঠল সোহিনী। 'কোম্পানির গাড়িকে নিজের গাড়ি বলে চালাচ্ছেন! কোম্পানির সভ্যতাকে নিজের সভ্যতা।'

এতটুকু দমল না স্বয়ম্ভু। পাইপ কামড়ে ধরে নির্বিকার মুখে তার গহ্বরে অগ্নিসংযোগ করলে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'সর্বত্রই এই নিজের বলে চালানো। জিনিসে কারু নাম খোদাই করা থাকে না। পরের জিনিসও ব্যবহারের জোরে নিজের জিনিস হয়ে ওঠে।'

'কখনো না।' দস্তুরমত ঝাঁজ মিশিয়ে তর্ক করছে সোহিনী। 'আগে স্বত্ব তার পরে ব্যবহার। যার স্বত্ব নেই অথচ যে পরের দ্রব্য ব্যবহার করে, আইনে তাকে কি বলে জানি না, শুদ্ধ ভাষায় তাকে তস্কর বলে।'

'কিন্তু অনুমতিসূত্রে দখলের কথা তো শুনেছ।' স্বয়ম্ভু এবার মুখের ধোঁয়াটা শূন্যময় আকাশের দিকে ছুঁড়ল: 'দেখতেই পাচ্ছ জীবনটা অনুমতিসূত্রে দখল ছাড়া কিছু নয়। মৃত্যুর অনুমতিতে জীবনের দু দণ্ড গাড়ি চালানো। তারপরে প্রেম—'

'প্রেম?' ঠোঁট বেঁকিয়ে বিদ্রুপের টান দিয়ে সোহিনী বললে, 'কথাটার বানান জানেন তো?'

'বানানো জিনিসের বানান জেনে কাজ নেই। তবে এটুকু জানি, প্রেমের জন্মমূলে সুবিধের অনুমতি।'

'সুবিধের?'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ সুবিধে, ততক্ষণই ভালোবাসা। যেই অসুবিধে হবে অমনি লেজ গুটোবে।'

'যারা হনুমান তারাই লেজ গুটোয়।'

এসব তো অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত কথা হচ্ছে। সুপ্রভাতের মন ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কত গভীর স্তরে নেমে এলে এমন খোলাখুলি আলাপ

কয়া যায়। দৃষ্টিতে বিস্বাদ কাঠিন্য এনে তাকাল সোহিনীর দিকে, কিন্তু সোহিনীর চোখ এখন অন্যত্র।

'হনুমানের কথা বোলো না। হনুমান বীর, এক লাফে সমুদ্র ডিঙোয়।' মাঠ ছেড়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললে স্বয়ম্ভূ, 'কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে এই—যতক্ষণ ও-পক্ষের হাতছানি ততক্ষণই এ-পক্ষের উদ্যম-উদ্যোগ। ও-দিকের জানলা বন্ধ হয়ে গেলেও এ-দিকের জানলা খুলে রেখেছে এ অসম্ভব। ঝড়ে যদি ও-বাতি নেবে এ-বাতিও জ্বলবে না।'

'আপনার তো বেশ কবিত্ব আসে।'

'সবই আসে। শুধু একজনই আসে না।'

'কে?' কি দুর্দান্ত সাহস, জিগগেস করে বসল সোহিনী।

তুমি—যেমন বেপরোয়া দুঃশাসন হয়তো তাই বলে বসবে স্বয়ম্ভূ। সুপ্রভাতের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ল।

কিন্তু স্বয়ম্ভূ মধ্যম পুরুষে না গিয়ে প্রথম পুরুষকে নির্বাচন করল। বললে, 'সে।'

'কে সে?' ছি ছি, অতদূর ঘাঁটাবার কি দরকার সোহিনীর? সে কি তার নাম-ঠিকানা জেনে তার নামে মামলা দায়ের করবে? না কি দিতে যাবে বরমাল্য?

'সে এক আশ্চর্য নারী। যে সারাজীবনে একজন হয়ে আসবে, একজন হয়ে থাকবে সেই পরম গরবিনী।'

'তাকে পাচ্ছেন না বুঝি কোথাও?'

'না, শুধু নেতি-নেতি করে চলেছি। দিনই ফুরিয়ে যাচ্ছে। বয়সই আর বসে থাকছে না।'

'তাহলে সে নিশ্চয়ই কোথাও নেই।'

'না, আছে।'

না, এই তো আছে, আমার পাশেই আছে। ক্ষণিকের মুঠি ভরে দেবার জন্যে আছে। এই বলে নিশ্চয়ই এবার হাত চেপে ধরবে সোহিনীব। যে হঠকারী, কোনও দুর্ব্যবহারই তার পক্ষে বেমানান নয়। যে তেজী তার কিছুতেই দোষ নেই। আর যার পক্ষে টাকা আছে, প্রভুত্ব আছে, সে সমস্ত অপযশের পক্ষেই টেঁকসই। অশোভনও তার পক্ষে ভূষণস্বরূপ।

হঠাৎ মাত্রার বেশি তিক্ততা মিশিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সুপ্রভাত। 'গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। স্টেশন-ওয়াগনটাতেই ঠাসাঠাসি করে যাওয়া যাবে।'

কথাটা কি বলল সুপ্রভাত, স্বয়ম্ভু গ্রাহ্যের মধ্যেও আনল না। কিন্তু সোহিনীও একটু কান খাড়া করবে না, তদ্গত হয়ে থাকবে, এ যেন ভাবনার বাইরে ছিল। পাইপের গর্তে নতুন করে তামাক ভরতে ভরতে স্বয়ম্ভু যেন কি বলছে নিবিষ্ট হয়ে আর কুরঙ্গী যেমন বাঁশি শোনে তেমনি শুনছে সোহিনী।

'জানো, কখনো-কখনো সেই রক্তিম আশ্চর্য সামান্যের ছদ্মবেশ পরে দেখা দেয়।' এক ঝলক উচ্ছ্বসিত আগুনে স্বয়ম্ভুর মুখও হঠাৎ আরেক রকম দেখাল : 'ঘটে যায় দুর্ঘটনা। বলা যায় না, ক্ষণিকের মুঠিতেই শাশ্বত বাঁধা পড়ে।'

পা ফেলার মাপগুলি ছোট করেও অবশেষে রাস্তায় এসেই উঠতে হল। স্টেশন-ওয়াগনে মালপত্র সব তোলা হয়ে গিয়েছে, খাবারদাবারের বাসনকোসন, কুঁজো সতরঞ্চি, পেয়ালা ট্রে স্টোভ কেতলি, মায় হার্মোনিয়মের বাক্স। কে কোথায় গাদাগাদি করে বসবে তাই নিয়ে জটলা চলেছে। আসবার সময় স্বয়ম্ভুর গাড়িতে স্বয়ম্ভু, দিদি, জামাইবাবু আর তাদের সেই বৃহদ্বপু প্রতিবেশিনী, যিনি শুধু স্ক্যাণ্ডেল শুনতে ভালোবাসেন, এই কজন ছিলেন। আর ওয়াগনে ছেলেমেয়ের দল, প্রতিবেশিনীর স্বামী সহ ফালতু কজন আত্মীয়, দুটো চাকর আর সুপ্রভাত আর সোহিনী। এখন একটা খাঁচায় এতগুলি জীবজন্তুর একসঙ্গে কি করে চালান হতে পারে তাই সকলের ভাবনা ধরেছে। তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে মনমেজাজ। তার উপর চটপট দেখা নেই স্বয়ম্ভুব। তিনি শ্লথপায়ে কাব্য করতে-করতে আসছেন।

মুখিয়ে উঠলেন বিশ্বম্ভরবাবু, স্বয়ম্ভুর দাদা। 'তোর গাড়ি কই?'

'এই এখুনি এসে পড়বে।' নির্লিপ্তের মত স্বয়ম্ভু বললে।

'আর কখন আসবে? এক ঘণ্টার কড়ার করে গেল, এখনো চার ঘণ্টায়ও দেখা নেই।' হাতের লাঠিটা রাস্তার উপরে ঠুকলেন বিশ্বম্ভর।

'বেশ তো, আপনারা একদল চলে যান না ওয়াগনে।' স্বয়ম্ভুর কথায় এতটুকু একটুও উদ্বেগের রেখা নেই, 'আমরা না হয় পরে যাব।'

'আমরা—আমরা আবার কারা?' বেশ বিরক্ত হয়েছেন বিশ্বম্ভর।

'সোহিনী, আমি—' কথাটা বিস্তারিত করে শালীনতার পোশাক দিল স্বয়ম্ভু : 'বউদি, তরলাদি, আর ইনি যদি যেতে চান ইনি।' বলে ইঙ্গিত করল সুপ্রভাতকে।

একেই বুঝি বলে পিছন থেকে ল্যাং মারা। সুপ্রভাত আহতস্বরে

বললে, 'না, যেমন এসেছি তেমনিই যাব।' বলে উঠে পড়ল ওয়াগনে। ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে বসল জায়গা করে।

'ঠাকুরপো আবার ড্রাইভারকে হুইল দেয় না, নিজেই চালায়।' নালিশ করল সোহিনীর দিদি সুমিত্রা: 'আর কি সাংঘাতিক জোরে চালায়! সুখ নেই শান্তি নেই, সর্বক্ষণ সর্বশরীরে ভয়। গাড়ি তো নয় যেন একটা ঝড়।'

'স্ক্যান্ডেলেরও আগে চলে।' পানঠাসা মুখে বললেন প্রতিবেশিনী, তরলাদি। 'আমি বাপু যেখানকার জিনিস সেখানেই যাব। ওয়াগনে যাব।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন।

'আমিও তথৈবচ।' সুমিত্রাও উঠে পড়ল ওয়াগনে।

চাকর দুটো নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফালতু আত্মীয়দের মধ্যে একজন। আর ছোটদের কে কার কোলে বসতে পারে গাড়ির মধ্যে চলেছে তার তুমুল গবেষণা।

স্বয়ম্ভু ভাবছে গাড়ি যদি এসে পড়ে, যে কোনো মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে, চাকর দুটোকে ড্রাইভারের পাশে গুঁজে দেবে। ফালতু আত্মীয়টা কোনো কাজের কথা নয়, ওটার বিনিময়ে ওয়াগনের মধ্য থেকে একটা ছোট মেয়ে কি ছেলে, কি, ধরো, দুটোই, সংগ্রহ করতে হবে। ওরা তাদের সঙ্গে পিছনের সিটে বসবে একপাশে। তারপরেই লম্বা স্পিড। দীর্ঘ, অন্ধ, তীব্র-তীক্ষ্ণ বেগ। যে বেগ কিছু দেখতে দেয় না, বুঝতে দেয় না, চেতনাকে শুধু ধ্বংসের চিন্তায় আচ্ছন্ন করে রাখে। স্বয়ম্ভু সব সময়েই হুইল নেয় না। যোগ্য সময়ে ড্রাইভারকে তা ছেড়েও দেয়। আর ড্রাইভারকে বলে যদি ষাট, ড্রাইভার সত্তরের নিচে কাঁটা নামায় না।

'তুমি স্পিড ভালোবাস?' সকলের মনে অশান্তি, তবু এরই মধ্যে নিশ্চিন্ত স্বর খুঁজে পেল স্বয়ম্ভু।

'বা, ভালোবাসি না? ভীষণ ভালোবাসি।' কি উত্তর পেলে স্বয়ম্ভু খুশি হবে বুঝতে পেরেছে সোহিনী।

'তোমার ভয় করে না?'

'করে। কার না করে।' সোহিনী সুন্দর করে হাসল: 'ভয় আছে বলেই তো জয়। ভয় আছে বলেই তো বেঁচে সুখ ভালোবেসে সুখ।'

এখন এসব কথা সুপ্রভাত কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। জানলা দিয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছে ওদের। রাস্তার পাশে দুজনে দাঁড়িয়েছে ঘন হয়ে। নৈকট্য থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন তাদের কথা গাঢ়, স্বর অস্ফুট। তাদের শব্দের চেয়ে নীরবতাই এখন বেশি উচ্চারিত। একটা উচ্ছৃঙ্খল

শ্যাতির দ্যুতিতে ফেটে পড়বার জন্যে তারা ঔৎসুক্যে মন্থর হয়ে রয়েছে।

একটা নতুন যন্ত্রণা সুপ্রভাতকে বিদ্ধ করল সর্বাঙ্গে। এ-যন্ত্রণা এর আগে আর কোনোদিন সে টের পায়নি। ছেলেবেলায় হাতে যে একবার বিছে কামড়েছিল তার চেয়েও এ অসহ্য। এ-যন্ত্রণা দিশেহারা করে ফেলে, আর যন্ত্রণায় দিশেহারারাই খুন করে আত্মহত্যা করে। যুক্তির নামগন্ধ নেই এতে, নেই বা ক্ষমার লেশস্পর্শ। এ অসহায়ের ঈর্ষার যন্ত্রণা।

কিন্তু একটু স্থির হয়ে যুক্তি প্রয়োগ করলে অনায়াসে ক্ষান্ত হতে পারত সুপ্রভাত। তার তুলনায় স্বয়ম্ভু জোনাকির কাছে চাঁদ, ফিঙের কাছে ময়ূর। ছোট আদালত থেকে সেরা আদালত, সর্বত্রই স্বয়ম্ভুর মামলা তার বিরুদ্ধে ডিক্রি হয়ে আছে। স্বয়ম্ভুর দিকেই সোহিনী হেলবে-খেলবে তাতে আর বিচিত্র কি! যতই সে আসুক কলকাতা থেকে বেড়ানোর টানে, খোলা-মেলা একটু আঁচলের হাওয়া পাবার লোভে. আজকের বেড়ানোটা যে স্বয়ম্ভুর সঙ্গে সোহিনীকে ভিড়িয়ে দেওয়া, এ আর এখন বুঝতে বাকি নেই। আর গাড়ি যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পরে ফিরে আসবার জন্যে এ হচ্ছে স্বয়ম্ভু-সোহিনীর একত্র উধাও হবার চক্রান্ত। আর যে সংযম ও কাঠিন্য সুপ্রভাতের বেলায় অপরিহার্য ছিল তা যে এখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তা স্পষ্ট দেয়ালে লেখা আছে কয়লা দিয়ে। আসলে সুপ্রভাতের মন ক্ষুদ্র না হলে বুঝতে পারত এক্ষেত্রে সোহিনীর কোনো ত্রুটি নেই—বদান্যই দাক্ষিণ্যকে আহ্বান করে। স্বয়ম্ভু বদান্য বলেই সোহিনীও সুদক্ষিণ। স্বয়ম্ভু খোলা মাঠ বলেই সোহিনীও মুক্তবায়ু। আর সুপ্রভাত ছোটঘরের বাসিন্দে বলেই সেখানে সোহিনী স্বভাবতই সঙ্কুচিত, তার না আছে গন্ধ না আছে ঢেউ। সে-দোষ সোহিনীর নয়, সে-দোষ সুপ্রভাতের। মনের এ বদ্ধ অবস্থায় সব তার উদারবুদ্ধিতে বোঝবার কথা নয় তাই তার ইচ্ছে হল ওয়াগন থেকে নেমে পড়ে. কাউকে কিছু না বলে চলে যায় আরেক দিকে। রাস্তার একটা বাস ধরে থেমে-নেমে যে করে হোক ফিরে যায় তার হোটেলে। পরের ট্রেনেই কলকাতায়। জনতার আবরণে নিজের কাছেই নিজের মুখ ঢাকে।

ভালোবাসাই কি ভালোবাসা পাবার একমাত্র যোগ্যতা? শুধু ভালোবাসার জোরেই কি দাবি করা যায় সাধুতা আর ত্যাগ বা একলক্ষ্য সমর্পণ! সংসারে কিছুই যখন স্থির নেই, ভালোবাসাই বা থাকবে কেন? তারও ঋতুবদল আছে, লোকলোকান্তর আছে। অবধারিত রাম রাজা হবে তবুও তো সে চলে গেল বনবাসে। সুপ্রভাত স্থির ছিল বলে তার উচ্ছেদ

হতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। হ্যাঁ, এক মুহূর্তেই হতে পারে। এক মুহূর্তেই প্রলয়ের ঝড়, একটি কটাক্ষেই সাম্রাজ্যের সর্বনাশ।

ঈর্ষার ফল পরের শ্রীতে কাতরতা নয়, নিজের কুশ্রীতায় কাতরতা। আমিই নিকৃষ্ট, আমিই অকর্মণ্য।

কালো বিন্দুর মত কি একটা ছুটে আসছে পূব থেকে।

'দেখছ?' জিগগেস করল স্বয়ম্ভু।

'একটা গাড়ি না?' উদ্বেল চোখে তাকাল সোহিনী।

'হ্যাঁ, আমারই গাড়ি।'

এখন আর প্রতিবাদ নেই সোহিনীর। যেন সে মেনে নিয়েছে চরম স্বত্ব বলে কিছু নেই, সত্য যা আছে তা শুধু মনে। যখন যার তখন তার এই ভাবনায়। মুখে শুধু বলল, 'উঃ, কি ভীষণ জোরে আসছে।'

'কালো ফিতের মত সোজা ঢালা পথ—ফাঁকা পেলেই স্পিডে পেয়ে বসে। বেশি শূন্যতায়ই বেশি অসাবধানতা।' তারপর একটু বোধ হয় ব্যক্তিগত হতে চাইল স্বয়ম্ভু : 'বেশি টাকা থাকলেই অপব্যয়ের ঐশ্বর্য।'

'শুধু টাকা থাকলে? হৃদয়ে ঔদার্য থাকা চাই।'

'টাকাই ঔদার্য আনে। নিন্দাই আনে দুঃসাহস।'

গাড়িটা এসে পড়ল।

ড্রাইভার কি একটা কৈফিয়ত দিতে চাইছিল, স্বয়ম্ভু কানেও তুলল না। শুধু সোহিনীকে বললে, 'ওঠ।'

'কে চালাবে?'

'ভয় নেই, আমি নয়। আমি তোমার পাশেই থাকব।'

'তাই ভালো। দাঁড়ান, আমার হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে আসি। ওয়াগনে ফেলে এসেছি।' বলে আনন্দচপল পায়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সোহিনী।

এসেই ঘোষণা করল সোল্লাসে, 'ছেলের দল, তোমাদের ডেকেছেন স্বয়ম্ভুবাবু। যার খুশি যাও তাঁর গাড়িতে, স্পিড এন্‌জয় করো।'

ছেলের দলে হুল্লোড় পড়ে গেল। এক দঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িতে। চলুন, ছাড়ুন, স্পিড দিন।

গাড়িতে-ওয়াগনে ভিড় কি ভাবে চালাচালি হবে বয়স্কদের সমস্যা ছিল, সোহিনী তা অতি সহজে সমাধান করে দিল। সোহিনী যে নিজেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওয়াগনে এসে ঢুকতে পারে, এটাই কেউ হিসেবে আনেনি।

সুপ্রভাতের পাশে বসল। বললে, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি?'

'মোট্রেও না। আমি জানতাম ওয়াগনই তোমার পছন্দ।' সরল নিশ্বাসে বললে সুপ্রভাত।

এদিকে গাড়ির হুইল নিজেই নিয়েছে স্বয়ম্ভু। ছেলেদের উদ্দেশ করে বললে, 'গান জানো?'

সমস্বরে হেসে উঠল ছেলেরা। 'কোরাস হলে গাইতে পারি।'

'হ্যাঁ, কোরাসই গাইব সকলে। ধরো।' মহাস্ফূর্তিতে স্বয়ম্ভু গান ধরল, ছেলেরাও সচিৎকার ধুয়ো তুলল: 'আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না তো আর। তোমারে করি নমস্কার।'

'ওগো কর্ণধার, ঐ তো বুঝি নদী এসে গেল। আর কত বাইবে তোমার রিকশা?' রিকশাওলাকে প্রশ্নে হঠাৎ সন্ত্রস্ত করল সুপ্রভাত, 'কিন্তু এদিকে তোমার বাড়ি কই?'

'কার বাড়ি নাম বলতে পারেন না, আমি কোথায় কি খোঁজ করি বলুন তো!' রিকশাওলা গাড়ি ঘোরাল।

'তোমাকে তো বলেছি বাড়ির নাম 'অজানা'।' মুখ বাড়িয়ে বললে সুপ্রভাত, 'এর বেশি আর ঠিকানা জানা নেই।'

'আহা, যার বাড়ি সেই ভদ্রলোকের নাম কি?' বিরক্ত হয়েছে রিকশাওলা।

'তা জানলে তোমাকে কি আর বলি না এতক্ষণ?'

'কে থাকে সে বাড়িতে?'

'কে? একটি মেয়ে।'

সে আবার কেমনতরো কথা। রিকশাওলা প্রশ্ন করল, 'খালি একা মেয়ে? আর কেউ থাকে না?'

'জানি না, খোঁজ করিনি। এক কাজ করো না। পোস্টাপিসে জিগগেস করো।'

'এদিকে পোস্টাপিস কোথায়? এ তো ভারি ঝামেলায় পড়লাম দেখছি।' রিকশাওলা ভাবলে, তবে বাজারের দিকেই যাই, সেখানেই যদি চিনে নিতে পারে। তাও বা চিনবে কি করে, এখানে আর কখনও আসেনি বলছে। তা ছাড়া বাজারের দিকে নদী কই?

'ও মশাই,' গ্রীষ্মের দুপুরে পথে একটা লোক পাওয়া দুর্ঘট— মুখ বাড়িয়ে জিগগেস করল সুপ্রভাত, 'অজানা' কোথায় বলতে পারেন?'

'অজানা? সে আবার কি জিনিস!' হাঁ হয়ে গেল ভদ্রলোক।

'একটা বাড়ির নাম। নদীর পারে একটা বাড়ি। নিশ্চয় গেটে কিংবা দেয়ালে নেম-প্লেট আছে।'

আগে-আগে যাদের জিগগেস করেছে তারা সরাসরি 'না' বলেছে, এ-ভদ্রলোক অন্যরকমভাবে বলল, 'অজানাকে কি কখনও জানা যায়?'

সত্যি, এ কার সন্ধানে চলেছে, কোন অজানার সন্ধানে? নইলে এই মাংসঝলসানো গরমে ঠিক-দুক্কুর বেলায় গাড়িতে কেউ আসে? সকাল-সন্ধ্যার ট্রেনও তো ছিল সুবিধেমত। একেবারে ধনুকছোঁড়া তীরের মত বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় বিঁধবে কে জানে, ছিলা থেকে তো বেরিয়ে আসি। আশ্চর্য, কি শক্তি তাকে টেনে আনল এমন করে, সমস্ত হিসেবের অঙ্ক বানচাল করে দিয়ে? সে কি একটা কাপড়ের পুঁটলিতে জড়ানো কখানা হাড়ের টুকরো? আর এমন সে শক্তি, আর কিছুকে জানতে দেয়নি, দেখতে দেয়নি পথের ধারে দাঁড়াতে দেয়নি একদণ্ড। নইলে এতদিনের আলাপ, সোহিনীর বাপের সে খবর করেনি, কি নাম, কি করে, ওকালতি না ডাক্তারি, ব্যবসা না ঠিকাদারি, তাও না। সোহিনী ছাড়া আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। সোহিনীর বাইরে আর সব অপ্রাসঙ্গিক। ধ্রুবতারার বাইরে আর সব তারা ধূলিকণা।

দরদরানো ঘামে রিকশাওলাকে কি রকম কালো মসৃণ দেখাচ্ছে। তার চাকার তলায় পথও যদি মসৃণ হত। আর এখানকার রিকশার হর্নের আওয়াজ কি অদ্ভুত রকম করুণ! যেন কেঁদে-কেঁদে উঠছে। পথ ছেড়ে দাও বলছে না, পথ কোথায় বলে দাও বলছে। কে দাঁড়ায়, কে বলে বে দেখিয়ে দেয়!

একটি যুবক যাচ্ছে সাইকেলে করে।

'মশাই, শুনুন—'

কে দাঁড়ায়। কিন্তু আশ্চর্য, যুবক নেমে পড়ল সাইকেল থেকে।

'অজানা' কোথায় বলতে পারেন?'

ভেবেছিল মুখিয়ে উঠবে। কিংবা মুখের এমন একখানা উদাসীন ভাব করবে যা কথার চেয়েও কর্কশ।

'ও, হ্যাঁ, শিবনাথ ডাক্তারের বাড়ি তো?'

ঢোক গিলল সুপ্রভাত। বললে, 'সে-বাড়িতে সোহিনী বলে—'

'ও, হ্যাঁ, তাঁর মেয়ে। হ্যাঁ, এই রাস্তাই, তবে গাড়িটা ফেরাতে হবে। ঐ যে দেখছেন সামনে গাছ, ওখানে নেমে ছোট্ট এক চিলতে মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে গেলেই অজানা।' যুবক তার সাইকেলে লাফিয়ে উঠল : 'যান, আমি আসছি।'

কত সহজ! কত কাছেই, হাতের নাগালের মধ্যেই আছে। শুধু একটুখানি পথ দেখিয়ে দেওয়ার অভাব। শুধু একটি অনুকূল মনের উৎসুক স্পর্শের প্রতীক্ষা। সে স্পর্শটি যদি ঠিক-ঠিক এসে লাগে দূরের দূরূহও অজানা থাকে না, আর যদি না পাওয়া যায় সেই স্পর্শ, এ-পারকেই মনে হয় পরপার, কাছের মানুষকেই মনে হয় সাত জন্মের অচেনা।

মনের এক চুলের ফারাকে এক রাজ্যের তফাত। যদি যুবকটি এত সহজে দেখিয়ে না দিত—কি না-জানি নাম যুবকটির—তাহলে এই দুর্দান্ত রোদে কোথায় কি ঘুরে বেড়াত উত্তর-পশ্চিম! না দেখালেও তো পারত। অক্লেশে বলতে পারত, জানিনে মশাই। কিংবা সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে একবার সোজা করে তারপর ডাইনে-বাঁয়ে দুবার বেঁকিয়ে বলতে পারত, তারপর কাউকে জিগগেস করে নেবেন। অত আয়োজনেরই বা দরকার কি! সাইকলে করে যাচ্ছিল সাইকলে কবে চলে যাবে। জানা থাকলেই কি মনে পড়ে? না কি মনে পড়লেই কেউ নেমে পড়ে সাইকেল থেকে! একেকটা মন কি সুন্দর সোনামাখা আবার একেকটা মন কি একতাল সিসে! আলাদা-আলাদা কেন? এক মনেরই কত রকমের, কত রোদজ্বলা দুপুর কত বা তারা-জাগা রাত্রি। শুধু এক অনুপল বা এক পরমাণুর ব্যবধান। সুইচে সূক্ষ্ম একটি তারের মৃদু একটু কারসাজি। যে বোবা সে কখন ডেকে ওঠে নাম ধরে আবার যে নামডাকা সে রুদ্ধ বোবা হয়ে যায়। যে সিসে সেই কষ্টিপাথরে সোনার দাগ ফেলে, আবার যাকে সোনা বলে জানি সেই সোনার মুহূর্তে সিসে।

কিন্তু যাই বলো, বাড়ি দেখাক তো দেখাক, তাই বলে ও-ও ও-বাড়ি আসবে কেন? ও কি এ-বাড়িরই একজন? সোহিনীর দাদা?

ফালি মাঠটুকু পেরিয়েই পাওয়া গেল বাড়ি। একেবারে নদীর গা-ঘেঁসা। মাঝখানে ডালপালামেলা ছাযাছড়ানো একটা কি গাছ। নাম জানে না সুপ্রভাত, জেনে দরকারই বা কি! হিজল বকুল সীসু জামরুল যা হোক কিছু হোক না। ঘরের মধ্যে সোহিনী, তার শিয়রের জানলার কাছে গাছ আর গাছের পরেই নদী—আর সমস্ত কিছু আস্বাদ করবার মত তার একটি মন, আকাশের সমস্ত আগুন যেন তুষার হয়ে গেল। চিত্তে যার স্নেহ থাকে দেহে আবার তার দাহ কি!

আকাশের মনটিই দেখ না। রুদ্ররোষে জ্বলছে কিন্তু কখন কি হাওয়ায় উড়িয়ে আনবে কালো মেঘের মমতা, রুপোর ধারায় বৃষ্টি ঢালবে, একই শীতল মৈত্রীর পঙক্তিতে বসিয়ে দেবে মানুষ মাটি গাছ নদী পশু

পাখিকে। রোদে যে কাছের মানুষের বেশি দেখতে দেয় না, বৃষ্টিতে সেই আবার দূরের মানুষ অদেখা মানুষকে দেখিয়ে ছাড়ে।

'এই যে আপনার অজানা—' রিকশাওয়ালাও চিনতে পেরেছে বাড়িটা। দেয়ালের গায়ে বাড়ির নাম আলকাতরায় লেখা।

'কত দেব?' পকেট থেকে ব্যাগ বের করল সুপ্রভাত।

রিকশাওয়ালা একটা লম্বাইচওড়াই হেঁকে বসল।

'এত?' দরটা যাচাই করে নেবে ধারে-কাছে কাউকে দেখা গেল না। যে-বাড়ির নাম করে এসেছে তার দরজা-জানলা আদ্যন্ত বন্ধ।

শুধু নদীর দিকে শিয়রের জানলাটি খোলা। বাড়িটার আকৃতি-প্রকৃতি বুঝে নেবার জন্যে নেমেই সে এক পা গিয়েছিল নদীর দিকে, আর পলক ফেলতে না ফেলতেই সব সে দেখে নিয়েছে। দেখে নিয়েছে দুপুরের খাওয়া সেরে ঘর প্রায় অন্ধকার করে তার দেয়ালঘেঁসা খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে কাত হয়ে। নদীর সঙ্গে অনেক দিনের চেনা বলেই শিয়রের জানলাটা বন্ধ করেনি যদি নদী মাঝে-মাঝে পাঠায় তার স্নেহশ্বাস। চোখের একটি কণিকাতেই সে দেখে নিয়েছে সোহিনীর শাড়ির পাড় থেকে বালিশে এলানো ভেজা চুলের কাঁড়ি। কিন্তু সোহিনীর পাশে শুয়ে আরেকটি যে মেয়ে—ঐ মেয়েটি কে? ঘুমুচ্ছে না, একটা পাতাখসা ঢিলেমলাট বাঙলা উপন্যাস পড়ছে, তার মানে ঘুমোব-ঘুমোব করছে। আসানসোলে সোহিনীর দিদিকে দেখেছিল, এ কি তবে তার ছোট বোন, নাকি মফস্বলের ঠান্ডা মেয়ে, পাড়াসুবাদের বন্ধুনী?

প্রথমে কিছু খানিকটা দিল রিকশাওলার হাতে। এটা কি? চড়, না, লাথি? খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল রিকশাওলা। পারে তো পয়সাগুলো সোয়ারির মুখের উপর ছুঁড়ে মারে, নয় তো বা নদীর দিকে। এত দৌড়-ঝাঁপ করে এত কাণ্ডের পর বাড়িতে নিয়ে এল—এই মাথাভাঙা রোদ্দুরে—তারপর কিনা এই বিবেচনা এই ব্যবহার? তুমুল তোলপাড় করতে লাগল রিকশাওলা।

তবু, সুপ্রভাত লক্ষ্য করে দেখল, বাড়িঘর যেমন নিসাড় তেমনি নিসাড়।

'এত হৈচৈ করছ কেন? দেখ না কত দিই? এক খাবলায় কি সমস্ত ওঠে?'

এবার যা দিল, যা রিকশাওলা চেয়েছিল তারও চেয়ে কিছু বেশি। হিসেবে কিছু ভুল হল কি না চোখ বড় করে ভাবছিল রিকশাওলা,

সুপ্রভাত বললে, 'ঠিক আছে। রোদে কি মেহনত হল বলো তো তোমার? ঐ যে সামান্য একটু বেশি, এ তোমার বকশিস।'

এ যে না চাইতেই জল নয়, ফসল। প্রাপ্যেরও অতিরিক্ত, এ রিকশাওলার কল্পনার বাইরে। মুহূর্তে তার মনের বদল হয়ে গেল। বললে, 'চলুন, আপনার বাক্সটা বাড়ির রোয়াক পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে আসি। সবাই বুঝি আরামে ঘুম মারছে। কি, খুব কষে নাড়ুন না কড়াটা।'

'আহা, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, কতক্ষণ ঘুমুবে?' রিকশাওলার মধ্যে নতুন মনের স্বাদ পেয়ে সুপ্রভাত হঠাৎ প্রশ্ন করল: 'তোমার নাম কি?'

'আমাদের আবার নাম!' কথাটা চাপা দিল রিকশাওলা। বললে, 'আবার স্টেশনে ফিরে যাবার জন্যে রিকশার দরকার হবে?'

'হবে। কালই ফিরব।'

'কখন ফিরবেন, কোন ট্রেনে? আমায় বলে দিন আমি এসে ঠিক নিয়ে যাব।'

'মোটে এক রাত্রির মামলা। কাল সকাল বেলা ফার্স্ট ট্রেনেই ফিরব।'

'ফার্স্ট ট্রেনে? সে তো মাছতরকারির ট্রেন। সেটা সুবিধের হবে না, সেকেন্ডটাতে যাবেন।'

'না, দেরি করবার সময় নেই। আমার শুধু অদ্য-রজনী।' নিজের মনেই হাসল সুপ্রভাত: 'ভোর না হতেই পলায়ন।'

'ঠিক আছে। রাইট টাইমে আমাকে হাজির পাবেন দরজায়।'

'তোমার নাম কি এবার বলো।'

'নাম?' লাজুক হাসিতে প্রীতির রস মিশিয়ে রিকশাওলা বললে, 'আমার নাম গফুরালি। নাম আপনার কষ্ট করে মনে রাখতে হবে না, করেক্ট টাইমে আমি ঠিক আসব দেখবেন গাড়ি নিয়ে। আদাব।'

নিজের মন অমৃতে ভরে আছে বলেই না রিকশাওলাকে আনন্দ পেঁাছে দিতে ইচ্ছে হল। ভাগ্যের হাতে নিজের পাওনার বেশি পেয়েছে বলেই না ইচ্ছে হল রিকশাওলাকেও তার পাওনার বেশি পাইয়ে দিই। আমিই তার সৌভাগ্যের রূপ ধরি। এককণা আনন্দের দামে তার এক মুহূর্তের মন, এক ইতিহাসের সাম্রাজ্য, সাফকবালায় কিনে নিই।

যেতে-যেতে গফুর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আরেকবার, ভদ্রলোক দরজা এখনও খোলা পেল কিনা। কতক্ষণ অমনি দাঁড়িয়ে থাকবে বাইরে?

২

কতক্ষণ রাখবে দাঁড় করিয়ে? দেখি না তোমার ঘুম ভাঙে কি না।

সোহিনীর গায়ের অনেকখানি ধরে ঠেলা মারল পরমা। 'ওলো, ওঠ্, কে যেন এসেছে।'

'কোথায়? ঘরে?' ঘুমের অন্ধকার থেকে বললে সোহিনী।

'না রে, বাইরে।'

'চোর?'

'তোর মুণ্ডু। মনে হচ্ছে কোনো অতিথি-আত্মীয়। ভরদুপুরের ট্রেনটিতে এসেছে। একটা রিকশারও যেন আওয়াজ পেলাম—'

'অতিথি-আত্মীয় তো দরজার কড়া নাড়ে না কেন?' সোহিনী পাশ ফিরল। শুধু পাশ ফিরল নয় ঘুমের নির্বিঘ্নতায় প্রশস্ত হল।

'ঐ!' উপুড় হয়ে দু কনুয়ের উপর ভর রেখে কান খাড়া করল পরমা: 'জুতোর পায়চারি শুনছিস না?'

'তারপর বুঝি গানের গলাসাধা শোনাবি। রক্ষে কর বাপু, একটু ঘুমুতে দে। তোর নিজের যদি না আসে হাতপাখাটা আছে, একটু হাওয়া কর।'

'কিন্তু সত্যি করে বল,' গায়ের উপর পড়ে জোর করে সোহিনীর চোখ খোলাল পরমা: 'একটা মানুষের চলাফেরা তুই শুনতে পাচ্ছিস না?'

'কতক্ষণ চুপচাপ থাক তুইও আর শুনতে পাবি না।' গালের নিচে হাত রেখে কাত হয়ে আবার চোখ বুজল সোহিনী: 'নইলে এখন উঠে অতিথি সৎকার করতে গেলেই হয়েছে। ঘুমকে ঘুম নষ্ট, সৎকারকে সৎকার।' হাঁটু দুটো একত্র সঙ্কুচিত করে গলাটা উঁচু করে রইল: 'পাইচারিটা থেমে গেলে খবর দিস।'

এ একটা কথা হল? এক পায়ে হালকা লাফ দিয়ে নেমে পড়ল পরমা। রাস্তার দিকের জানলার দু পাল্লার মাঝখানে যে ফাঁক আছে, তাতে চোখ রাখল।

ছিটকে চলে এল খাটের কাছে। উত্তেজিত হয়ে বললে, 'মাইরি, একজন ভদ্রলোক—'

'কত বয়স হবে?'

'ছোকরা-ছোকরা। তোর পাশে দাঁড়ালে বেশ মানাবে।'

'তাহলে তোর পাশে দাঁড়ালেও।' এত সব তত্ত্বকথা বলছে, তবু চোখ মেলছে না সোহিনী। 'যে পাশে দাঁড়ায় সেই মানিয়ে যায়। যে যোগী হয়ে আসে সেই ভোগী হয়ে দেখা দেয়। পাশে দাঁড়িয়ে সব ভদ্রলোকই ছোকরা-ছোকরা।'

'চোখে চশমা আছে।'

'তা হলে নীলুদা নয় তো?' এবাব কি চোখ মেলল সোহিনী?

'আহা, তোর নীলুদাকে যেন আমি চিনি না! দাঁড়া,' জানলার ফাঁকে আবাব চোখ রাখল পরমা। পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বললে, 'পকেটেব রুমাল কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, কোঁচাতেও আব কুলোচ্ছে না—'

'কোঁচা? প্যান্টকোট নয়?'

'এখন সুটকেস থেকে তোয়ালে বের করে সবিস্তারে ঘাম মুছছে।'

'ব্লাডপ্রেসার আছে বোধহব।' ঘুমের রেশটুকু আবার ধরতে চাইল সোহিনী: 'জিগগেস করে দ্যাখ তো বাবাব কাছে কোনো রুগী কি না।'

ওদের বাড়ির লোক, তা কিনা পবমাকেই জিগগেস করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়, অলস ভিতু মেয়েকে যখন বন্ধু করেছে তখন তার দায়িত্ব একটু না নিয়ে উপায় কি!

আধখানা জানলা খুলে পবমা জিগগেস করল, 'কাকে চান?'

'সোহিনী আছে? সোহিনী?'

জানলা থেকে তাড়াতাড়ি সবে গেল পরমা। যখন কোনো উত্তর দিল না, তার মানেই আছে। কিন্তু বহালতবিয়তে আছে কি না বোধহয় এইটুকু গেল খোঁজ করতে।

দু হাতে প্রবল নাড়া দিল ঘুমন্তীকে। 'ওলো, ওঠ্, তোর কাছে এসেছে। তোকে চায়।'

ভয়ে মুখ পাংশু হয়ে গেল সোহিনীর। এলোমেলোকে তাড়াতাড়ি যা হোক গুছিয়েগাছিয়ে দাঁড়াল গিয়ে জানলায়। নিমেষে কণ্ঠস্বরও বিবর্ণ হয়ে এল: 'এ কি, তুমি? এই অসময়ে?'

ওপার থেকে উত্তর এল: 'হ্যাঁ, একটা খবর আছে।'

তবু তক্ষুনি-তক্ষুনি দরজা খুলছে না সোহিনী। তবু, তাব মতে, এখনও যেন অসময়। খবর ছিল, একদিন পরে বললেই তো হত।

কিন্তু কে জানে কি খবর! এমন হয়তো খবর যে একদিনেরও তর সয় না। ভয়ের আবার একটা কালো ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহিনীর উপর।

কানের কাছে মুখ আনল পরমা : 'এ তোর সুপ্রভাত না?'

মুখ টিপে হাসল সোহিনী : 'হ্যাঁ, সুপ্তিপ্রহর।'

'তবে দরজা খুলে দিচ্ছিস না কেন?'

'দাঁড়া, দিচ্ছি।'

নিজেকে, এরই মধ্যে, টুকটাক পরিপাটি করছে। যতদূর সম্ভব শ্রী আর শালীনতা আনছে পোশাকে। অসময়ে এসেছে কেন তারই যেন শোধ তুলছে, শাসন করছে।

তুই একটা কী সোহিনী! পরমা মনে মনে ধিক্কার দিয়ে উঠল। কোথায় উত্তাল হয়ে দরজা খুলে দিবি, হাত ধরে টেনে আনবি ঘরের মধ্যে, তা নয়, চুল ঠিক করছিস, আয়নায় মুখ দেখছিস। সব সময়েই তোর হিসেব, ফলটা দেখে নিয়ে অংক কষা, নিচের অন্ধকারটা বুঝে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙা। কোথাও তোর যেন একটু অসতর্ক হবার সুখ নেই। একমাত্র যে অসময়ে আসতে পারে জীবনে, সেই এসেছে তোর দুয়ারে, দেখিস তোর যেন না চলে যায় সুসময়।

পরমার ইচ্ছে হল, দু হাতে নিজেই খুলে দেয় দরজা। অসময়ের আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে।

যার অসময় বলে কিছু নেই তার এক নাম মৃত্যু, আরেক নাম বুঝি প্রেম। সে নিরত বাসিন্দে নয়, সে আগন্তুক। সে নবাগত।

ভদ্রলোককে কেমন না জানি দেখতে! একনজরে তখন যেন কিছুই দেখা হয়নি। কে লোক দেখে, কে বা ভদ্রতা—প্রেমের ক্ষেত্রে শুধু প্রেমকে দেখ। আকাশভরা রোদ্দুরকে দেখ। বন্ধ দরজার বাইরে দেখ নিশ্চল প্রতীক্ষাকে।

ছিমছাম ভদ্র সাজল সোহিনী, প্রায় যেন অপরিচিত। ধীরে ধীরে, একটুও প্রায় শব্দ না করে, দরজা খুলল।

'বাবাঃ, কতক্ষণ লাগে তোমার দরজা খুলতে!' সুটকেসটা হাতে নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সুপ্রভাত : 'শিগগির এক গ্লাস জল খাওয়াও।'

'এ বেয়াড়া ট্রেনটায় এলে কেন?' সোহিনী তবুও আপত্তি করতে ছাড়ে না।

'আর বেয়াড়া। বিষয়টাই তো তাই আগাগোড়া।' যেন তৃষ্ণার কথা ভুলে গিয়েছে এমনি তৃপ্তিতে বললে সুপ্রভাত : 'ফার্স্ট ট্রেন ধরব বলেই

বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। ধরতামও। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছেই মনে পড়ল হঠাৎ, ইস, জিনিসটা তো নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে! যদি জিনিস না দেখলে বিশ্বাস না করো। তাই ফের ফিরলাম বাড়ি। জিনিস নিয়ে আবার যখন এলাম স্টেশনে, তখন নিদারুণ ভাগ্য, দ্বিতীয় ট্রেনটা বেরিয়ে যায়নি।'

কি জিনিস? আশ্চর্য, জানতে চাইল না সোহিনী। শুধু বললে, 'আগামীকাল বিকেলেই তো দেখা হতে পারত কলকাতায়।'

'আগামী কাল? আজকের দুপুরের কাছে আগামী কালের বিকেল! হাতের পাখির কাছে ঝোপের পাখি! আজকের দুপুরটা আছে বলেই তো আগামী কালের আশা। কি বলো, জামাটা খুলে ফেলি?' বলার অপেক্ষা না করেই সুপ্রভাত গা থেকে ঘামে-সপসপ জামাটা খুলে ফেলল।

ভঙ্গি একেবারে জয়ীর মত। খাটের পাতা বিছানার একধারেই বসে পড়ল। ভাবখানা এমন, শেষ গেঞ্জিটাও বুঝি খুলে ফেলে!

কিন্তু পরমা — পরমা কাছে আছে বলেই রক্ষে।

বিছানাটায় অসংস্কৃতির চিহ্ন বর্তমান এই ভেবে মনে-মনে কুণ্ঠিত হল সোহিনী। একেবারে সময় দিতে চায় না, এমন দুর্দান্ত হলে কি চলে? যেটুকু সময় পেয়েছে নিজেকেই শোধন করেছে, বিছানাটার মার্জন হয়নি। পরমাও তো তাড়াতাড়ি একটু টান করতে পারত চাদরটা।

চমৎকার হবে। বাবা-মা সব আত্মীয়স্বজন এসে দেখুক ভরদুপুর-বেলায় কে এক অপরিচিত যুবক তার ধামসানো বিছানার উপর খালি গায়ে বসে আছে।

'একটা পাখা নেই?' ঘরের চারদিকে ক্ষিপ্রচোখে তাকাল সুপ্রভাত। দেখল, বিজলীর আলো আছে কিন্তু পাখা নেই। পযেন্ট থাকলেও বসেনি এখনো। পুবের জানলা দিয়ে তাকাল নদীর দিকে। নদী নির্নিশ্বাস। নদী নিরর্থক।

সোহিনীর দিকে হাত বাড়াল সুপ্রভাত। বললে 'একটা হাতপাখা নেই?'

পিছনে, বিছানার উপরেই পড়ে ছিল। সোহিনী পরমার দিকে ইঙ্গিত করল 'দে তো পাখাটা।'

তখন থেকে জল দেয়নি একগ্লাস। এখন একটু পাখা করতে নারাজ। কুঁজো না হয় দেখতে পাচ্ছি না ঘরে, কিন্তু পাখাটা তো খানিক আগেই হাতের মুঠোতে ধরা ছিল। একটু হাওয়া করতে পারত তো অন্তত। এ কেমনতরো শালীনতা!

পাখাটা কুড়িয়ে নিল পরমা। নিজেই হাওয়া করতে লাগল সুপ্রভাতকে।

'ছি, ছি, আপনি কেন?' বাধা দিতে গেল সুপ্রভাত, কিন্তু বাধায় হটবার মতন নয় কখনো পরমা। আরো জোরে সে পাখা চালাতে লাগল। আরো জোরে। সোহিনীর সমস্ত নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে। শ্রান্তের প্রতি যত না সেবা, অকর্মার প্রতি তত তিরস্কার।

'ইনি কে সোহিনী?'

'আমার বন্ধু, পরমা। বি-এ।'

'উপাধি দিয়ে বলার কি দরকার!' পাখা করতে-করতে বললে পরমা, 'বল না পাড়ার মেয়ে। ছেলেবেলার সই।'

পরমার পরিচয় কত সহজেই দেওয়া গেল। কিন্তু সুপ্রভাতের পরিচয় পরিবারের মধ্যে কি ভাবে সে ঘোষণা করে! এত তাড়াহুড়ো করলে কি চলে। বলাকওয়া নেই, গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজা নেই, একেবারে সটান এসে হাজির। আসরে গান ধরবার আগে তবলায় খানিক হাতুড়িও তো ঠুকতে হয়। সোহিনীকে তো একটু সময় দিতে হয় তা-না-না-না করতে। প্যাঁচ না কষেই কুস্তি। সুপ্রভাত সরকার, এম-এ, এককালের নামজাদা কলেক্টর দ্বিজপদ সরকারের ছেলে, অমুক রাস্তায় অমুক নম্বরের বাড়ি—বললেই মা-বাবা যথেষ্ট মানবে? অনেক কথাই কি অনুক্ত থাকবে না? কতদিনের আলাপ, কোন সাহসে বাড়ি চড়াও হয়েছে, কি তার মতলব, এসব প্রশ্ন কি চাইবে না উঁকি মারতে? কতক বলে কতক চেপে গিয়ে সব কথা কি সমীচীন ভাবে বোঝাতে পারবে? আর যাকেই হোক, মাকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আর, ধরা পড়ে গেলেই মার ধারালো চোখ বলে বসবে, ছি, ছি, তোর পেটে এত! আমাকে লুকিয়েছিস এতদিন?

একদিন জানাতে তো হতই। সে-কথারও একটা স্থান-কাল ছিল, ঝাড়াই-বাছাই ছিল। ঢাকঢোল পিটিয়ে প্ল্যাকার্ড মেরে এমনিভাবে জাহির করার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই, সুষমা নেই। এমন ভরদুপুরে বেআব্রু হওয়ার মধ্যে।

কেন নেই? পরমা ঐ যা বললে, উপাধি বাদ দিয়ে সারটুকু বললেই তো হয়। বললেই তো হয়, আমার বন্ধু। আমার মনোনীত।

কথা শুনে মা ঘরের ঘুপচি কোণে মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে বসবেন, আর বাবা, বাবার যা মুখ খারাপ, বলে উঠবেন : ধাপ্পাবাজ।

দিব্যি গুছিয়ে-গাছিয়ে এনেছিল, সব তছনছ করে দিল। পাড়ের কাছে ভিড়েছিল প্রায় নৌকো, হড়বড় করে ডুবিয়ে ছাড়ল। খোলা

পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে কেউ যদি হঠাৎ উদ্দাম নাচতে শুরু করে, নৌকো বাঁচে কি করে?

'যাই, মাকে বলি গে—' অগত্যা না বলে উপায় কি সোহিনীর?

তুই একটা কি! পরমার কালো চোখের বাঁকা কটাক্ষ সোহিনীকে খিক্কার দিয়ে উঠল। তুই নিজে এই অবস্থাটা সামলাতে পাচ্ছিস না? ছুটেছিস মার সঙ্গে রফা করতে? কিসের রফা? কিসের বোঝাপড়া? তুই তোর নিজের দাবিতে তোর ডিক্রি হাসিল করে নে। তারপর সেই ডিক্রি জারি করে নিয়ে নে তোর খাসদখল।

তুই স্বাধীন না? সাবালিকা না? তুই না কলকাতার ইস্কুলের এক শিক্ষিকা? নিজের পায়ে দাঁড়ানো রোজগেরে মানুষ?

সামান্য রোজগার। ট্রেনিং পাস করে কলকাতার কর্পোরেশনের স্কুলে টিচারি করি। থাকি মেয়েদের একটা আধা-ছাত্রী আধা-কেরানি মেসে। নিজের খরচখরচা বাদে কি বা বাঁচাতে পারি বল। কটা টাকাই বা মাকে পাঠাতে পারি মাস-মাস? আমার টাকার উপর পরিবার নির্ভর করে নেই, দেখতেই পাচ্ছিস, আমাদের এমন কোনো অভাবের সংসার নয়। তাই আমি কবেই ছাড় পেয়েছি বিয়ে করার। আমার মা-বাবা জানেন আমার নিজের একটা মত আছে, আর আমিও জানি আমার মা-বাবার একটা মন আছে। তাই ওঁরা যদি নির্বাচন করেন সেটা আমার মতের বিরুদ্ধে হতে পারবে না, আর আমি যদি নির্বাচন করি, আমি দেখব, সেটা তাঁদেরও মনোগত হয়। মতে-মনে সংঘর্ষ না হয় সেইটেই দেখা দরকার। সেইটেই আমি দেখতে চেয়েছি বরাবর। কিন্তু এখন সব প্রায় ভেস্তে যাবার সামিল।

আমি যদি জোর করে বলি ঠিক হচ্ছে আর মা-বাবা যদি জোর করে বলেন ঠিক হচ্ছে না, তা হলেই ত সংঘর্ষ। যা এড়াতে চাই তাইতেই জড়িয়ে পড়া।

এড়াতেই বা চাইবে কেন? যা সত্য তাই উজ্জ্বল তাই পবিত্র। সত্যের জন্যে ছাড়তে পারবে না মা-বাপ? যদি পারত বলে উঠত পরমা।

কি সত্য কে জানে, পালটা জবাব ছিল সোহিনীব। তবে আত্মসুখই সত্য নয়। আত্মসুখেই সুখ নেই। আমার যে সুখ অন্যকে আহত করে, অন্যের শুভসমর্থন কুড়িয়ে আনতে পারে না, তা আমাকে স্বস্তি দেয় না। আর সে-সম্ভোগে সুখ কোথায় যে-সম্ভোগে স্বস্তি নেই?

মিথ্যে কথা। যদি পারত ঝঙ্কার দিয়ে উঠত পরমা: কাউকে না কাউকে বঞ্চিত না করে লাঞ্ছিত না করে সাধ্য নেই তুমি সুখী হও। তোমার সুখ মানেই কোথাও না কোথাও আর কারু দুঃখ।

'যাই, মাকে ডেকে আনি—' আরেকবার বলল সোহিনী।

'এক গ্লাস জল নিয়ে আসিস।' মনে করিয়ে দিল পরমা।

গলা তো সোহিনীর নিজেরই শুকিয়ে যাচ্ছে, পেলে সেই আগে কেড়ে খায়। কিন্তু খবরটা মাকে বললে মারও তেষ্টা পেয়ে যাবে। পাট-ওঠা সংসারে আগন্তুক অতিথিকে নিয়ে কি বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না-জানি। এমন একটা সময় বিকেলের চা দেওয়া যায় না, দুপুরের ভাত তো দূরস্থান। আর বাবা বেচারির দুপুরের এই একটু তন্দ্রা, এটার অকালমৃত্যু ঘটবে। যেখানে ভালোবাসা সেখানে কেন এই অকারণ রূঢ়তা এই ছন্দ-ভ্রংশ? সুন্দর একটি সুনীতি বজায় রেখে কেন হতে পারে না এর প্রস্ফুটন?

হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে নজর পড়ল সোহিনীর। রৌদ্রদগ্ধ হাহাকারের শূন্যতায় হঠাৎ একটা সান্ত্বনার ছায়া' সাইকেলে একটা লোক।

আর কে! নীলুদা।

'এ কি, নীলুদা, তুমি কোত্থেকে?' দরজার কাছে উথলে এল সোহিনী।

'আমিও যে এলাম এই ট্রেনে—' কি কতগুলি জিনিস এনেছে সাইকেলে বেঁধে তাই খোলবার চেষ্টা করতে লাগল নীলাদ্রি।

সোহিনী ছুটে চলে এল বাইরে। দড়ির বাঁধন আলগা করতে পারে এমন তার সাধ্য নেই, তবু সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যেন সামনে দাঁড়ানোটাই বাঁধন খোলার সাহায্য। বললে, 'এসব কি এনেছ নীলুদা?'

'দুটো ডাব।' বাঁধন খুলতে পেরেছে নীলাদ্রি।

'ডাব? ডাব দিয়ে কি হবে?'

'কি আবার হবে? খাবে।'

'কে, আমি?'

'তোমাকে যদি দেয় তবে তুমিও।' নীলাদ্রি প্রায় শাসনের সুরে বললে, 'বলি, ভদ্রলোক উঠেছেন তো তোমার এখানে? কই, কোথায়?'

মুহূর্তে পাংশু হয়ে গেল সোহিনী। অতর্কিতে আবার চোখের সামনে ভয় দেখল, কালো ঠাণ্ডা ভয়। ভালোবাসার জানলা খুলে তাকালে ভয় ছাড়া আর কিছুই কি চোখে পড়বার নয়? দূরে কোথাও কি একটা তারা নেই, পাহাড়ের চূড়া নেই, শুধুই কি পায়েহাঁটা মরুভূমির মাঠ?

'কে ভদ্রলোক?' মেয়েলি অভ্যাসবশে তবু জিগগেস করল সোহিনী।

'যা, রাস্তার দেখা হল যে। চারদিকে শুধু তোমাকে খুঁজছেন, অজানাকে। গরমে-ধুলায় একেবারে হাক্লান্ত। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল

আমার সঙ্গে, অনায়াসেই দেখিয়ে দিলাম পথ। নইলে গোলকধাঁধায় কতক্ষণ যে ঘুরতে হত তা কে জানে?' দিব্যি প্রশান্তমুখে হাসল নীলাদ্রি।

আশ্চর্য, একেবারে রব তুলে এসেছে। পাণ্ডলাইট জেবলে, ব্যান্ড বাজিয়ে। সদর-মফস্বল সর্বত্র সচকিত করে। এমনকি নীলুদার হাতেও পোঁছে দিয়েছে হ্যান্ডবিল। শুধু দেখা দিয়ে আসেনি, একেবারে চেনা হয়ে এসেছে। শুধু একটিমাত্র জিজ্ঞাসায় জানিয়ে দিয়ে এসেছে হৃদয়ের আদিম সম্ভাষণ।

বুকের দুরুদুরু চেপে রাখবার চেষ্টায় সোহিনী বললে, 'ওটা আবার কি?'

চেন না জিনিসটা? টেবলফ্যান।' দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করে নীলাদ্রি বললে, 'এটা যোগাড় করতেই তো দেরি হয়ে গেল। প্লাগ-পয়েন্ট আছে না?' বলে ফ্যান নিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকল। যেন প্রায় কলম্বসের আবিষ্কার এমনি উল্লসিত হয়ে বললে 'আছে। আমার ধারণা ভুল হবার নয়।'

একটা উঁচুমতন টুল যোগাড় করে তাতে বসিয়ে দিল ফ্যানটা। কোন গভীরে ক্ষুদ্র একটি স্পর্শের সঞ্চার হল হুহু শব্দে ঘুরতে লাগল ফ্যান। নির্জীব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হাওয়ার ঢেউ ডুবিয়ে দিল সুপ্রভাতকে।

পাখাটা তারই উদ্দেশে, তারই দিকে তাক করা. সুপ্রভাত একটু লজ্জিত বোধ করতে চাইল। কিন্তু লজ্জা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কি! আর তা ছাড়া সুখ মানেই তো নির্লজ্জতা। সংসারে বিধাতা একেক-জনকে এমন কদর্যভাবে সুখী করেন যে লজ্জা বলে কিছু থাকলে নিজেই মুখ লুকোতেন।

যাক অন্তত গা থেকে গেঞ্জি খুলে ফেলার লজ্জা থেকে বাঁচা গিয়েছে।

'আঃ—' হাওয়া খাচ্ছে সুপ্রভাত, আর আরামের আওয়াজ তুলল নীলাদ্রি। যেন অতিথি ঠাণ্ডা হলে সেও ঠাণ্ডা।

কত আর বওয়াবে নীলাদ্রিকে দিয়ে, ডাব দুটো সোহিনীই নিয়ে এল হাতে করে।

পকেট থেকে ছুরি বের করল নীলাদ্রি।

'পকেটে ছুরি নিয়ে বেড়ান নাকি?' হাতের পাখা বন্ধ হয়ে যাবার কথা, সেটা এখন দু পা এগিয়ে এসে নীলাদ্রির প্রতি প্রয়োগ করলে পরমা।

'না, না, আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।' যেন অপরাধীর মত বললে নীলাদ্রি, 'শুধু ডাবের মুখটা ছাড়াবার জন্যেই সাময়িক প্রয়োজনে নিয়ে এসেছি দোকান থেকে। আর কোনো মহৎ প্রয়োজন এর নেই।' পরমার হাওয়াটুকু

সে গায়েও মাখল না। বললে, 'তা ছাড়া সম্বল থাকলেই কি সব সময়ে তা মহৎ প্রয়োজনে লাগানো যায়?'

ছুরি দিয়ে মুখটা খানিকক্ষণ চাঁছল। তারপর ফলাটা বিদ্ধ করে দিল ভিতরে। সোহিনীর মনে হল জল নয়, রক্ত বেরিয়ে আসবে বোধ হয়। টাটকা লাল রক্ত।

'এ কে খাবে?' খাটের উপর পা তুলে মৌরশী হয়ে বসেছে, প্রশ্ন করল সুপ্রভাত।

'যিনি তৃষ্ণার্ত তিনি খাবেন।' নীলাদ্রি সুপ্রভাতের দিকে ডাবটা হাসিমুখে বাড়িয়ে ধরল।

'ডাব খেলে তৃষ্ণা যায় নাকি? আমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা সাদা জল চাই।'

'জল আসছে। তার আগে ডাবটা খেয়ে ফেলুন। এটা খাবেন ওষুধ হিসেবে, শরীর ধাতস্থ করতে। নিন, ধরুন, রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি তো আর কম করেননি।'

যেন একা সুপ্রভাতই ঘুরেছে। তবু তো রিকশার মাথায় ঢাকনি আছে, কিন্তু সাইকেল?

দ্বিতীয় ডাবটার দিকে করুণ চোখে তাকাল সোহিনী। নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করে বললে, 'ওটা তুমি নাও।'

'পাগল, না, মাথাখারাপ! আমি কি কখনও ক্লান্ত হই, না, দগ্ধ হই?' নীলাদ্রি এগুলো সুপ্রভাতের দিকে: 'কি, গলা উঁচু করে খেতে পারবেন না?' বলেই বুঝতে পারল ভঙ্গিটা শিষ্ট হবে না, সুশালীন হবে না। 'কিন্তু স্ট্র এখানে কোথায় পাব?'

'খড়কুটো চাই না। একটা কাচের গ্লাস হলেই যথেষ্ট।' হাসল সুপ্রভাত।

'হ্যাঁ, গ্লাস, কাচের গ্লাস। গ্লাসই ভাল। নিঃশেষে উপুড় করে ঢালা যাবে, বোঝা যাবে কতটুকু এর সঞ্চয়।' ব্যস্ত হয়ে পরমার হাতে ডাবটা সমর্পণ করে নীলাদ্রি নিজেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

সোহিনীকেই উচিত ছিল পাঠানো। কিন্তু, আহা, থাক, তাকে ঠাঁই-নাড়া করে লাভ কি! এত সব ঝক্কি পোয়াবার মত তার কি কায়দাকানুন জানা আছে! অনর্থক হাঁসফাঁস করে মরবে। কি বলতে কি বলবে, কি ধরতে কি ফেলবে তার ঠিক নেই। যতক্ষণ পারে, থাক ফাঁকায়-ফাঁকায়। থাক কাছাকাছি।

যাবার আগে পরমাকে উদ্দেশ করে বললে, 'ধরো-লক্ষ্মণ হয়ে থাকো কিছুক্ষণ।'

নীলাদ্রি সটান এল শৈলবালার ঘরে।

'কি করছেন মাসিমা?'

বাসি খবরের কাগজটাকে বিছানার চাদর করে শৈলবালা নাক ডাকাচ্ছেন।

দেয়ালে ফোটানো তাকের উপর কটা পেয়ালা ডিশ কাচের গ্লাস সাজান। সংসারের এজমালি বাসনের এরা সগোত্র নয়। এরা আলাদা, কুলীন। এরা যত না বাসন তত আসবাব। মধ্যবিত্ত শৌখিনতা। এদের ধ্বনিও আলাদা। পিরিচে চামচের শব্দ ক্ষুধার্ত হৃদয়ের কাছে নতুন এক রোমাঞ্চের সুর।

একটা গ্লাস তুলতে গিয়ে একটা পেয়ালা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

'কে?' চোখ গোল করে তাকালেন শৈলবালা। ঘুমের ঘোর তবু কার্টোন বোধ হয় এমনি অদ্ভুত সেই ভঙ্গি: 'সে কি? তুমি? নীলু? তুমি কোত্থেকে?'

'কাঁচড়াপাড়া থেকে।'

'তা তো জানি। কিন্তু এখানে এই ঘরের মধ্যে কিসের জন্যে?' সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলেন শৈলবালা।

'কাচের গ্লাস নিতে এসেছি।' পায়ের কাছে পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বললে, 'হাতে আলগোছে এমনিতে উঠে এলেই হয়, তা নয়, পাশের নিরীহ চুপচাপ পেয়ালাটাকে না ফেলে না ভেঙে না গুঁড়ো করে ছাড়বে না।'

'কাচের গ্লাস দিয়ে কি হবে?'

'বাড়িতে ভদ্রলোক অতিথি এসেছেন, ডাব খাবেন।'

'কে অতিথি?' তক্তপোশ থেকে নেমে পড়লেন শৈলবালা: 'নাম কি? থাকেন কোথায়?'

'যতদূর বুঝতে পারছি, কলকাতায়। নাম? নাম অবান্তর।'

কৌতূহলে তীক্ষ্ণ হলেন শৈলবালা তুমি চেন না?'

'আগে চিনতাম না, এখন যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে!' সাদা সুস্থ দাঁতে হেসে উঠল নীলাদ্রি।

'উনি কোথায়? ওঁকে খবর দাওনি?' শৈলবালা স্বামীর ঘরের দিকে লক্ষ্য করলেন।

'আপনাদের কারুর কাছে আসেননি। এসেছেন সোহিনীর কাছে।'

'কার কাছে?' কথাটা যেমন খারাপ, সুরটাকে তেমনি কর্কশ করলেন শৈলবালা।

'সোহিনীর কাছে।' একটু বা গম্ভীর হল নীলাদ্রি: 'সোহিনীর কলকাতার কোনো বন্ধু!'

'কলকাতার বন্ধু?' দিনে-দুপুরে শৈলবালা যেন ভূত দেখলেন, ভয়ে এমনি ম্লান হয়ে গেল তাঁর মুখ। ডাকাত পড়লে প্রতিবেশীদের ডাকা যেত, এখন কাকে ডাকবেন ভেবে পেলেন না। এখন বুঝি প্রতিবেশীরাই ডাকাত।

চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল নীলাদ্রি। কেন, কলকাতার বন্ধু হতে দোষ কি? সোহিনী যখন কলকাতাতেই থাকে তখন বন্ধু তো কলকাতারই হবে।

আগাগোড়া সব সময়েই কলকাতা থাকে কোথায়? শনি-রবিবার তো এখানে চলে আসে নিয়ম করে। ছুটিছাটায়ও তো গরহাজির কলকাতা থেকে।

হপ্তায় পাঁচদিন যে নিয়ত বাস করে কলকাতায় তাকে আপনি এখানকার বাসিন্দে বলবেন? তা ছাড়া দু-একটা ছুটি তো মাঝে-মধ্যে সফর থেকে বাদ পড়ে। পড়ে না? সে সব বাদের মধ্যেই তো সংবাদের গন্ধ।

কোন কোন ছুটি বাদ পড়েছে মনে মনে হিসেব করতে গিয়ে অন্ধকার দেখলেন শৈলবালা।

সে কি দু-চার মাসের কথা? সেই কবে আই-এ পাস করে কলকাতা গিয়েছে, ট্রেনিং পাস করে নিয়েছে টিচারি। গঙ্গা দিয়ে তারপর কত জল বয়ে গেল, পথ দিয়ে কত মানুষের ভিড়। জলের মধ্য থেকে কেউ একটা ঢেউ কুড়িয়ে নেবে না, ভিড়ের মধ্য থেকে বন্ধু?

কিন্তু বরাবর থেকেছে তো একটা মেয়েদের হসটেলে। সেখানে কত কড়াক্কড়।

না, তর্ক করতে হয় মাসিমার সঙ্গে। উপায় নেই ধরো-লক্ষ্মণ হয়ে আরও খানিকক্ষণ থাকতে হবে পরমাকে।

হসটেলে ঢোকা-থাকা নিয়ে কঠোরতা থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে পথঘাট বেকড়ার। পার্ক আছে, স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম আছে, সিনেমার ম্যাটিনি আছে। রেস্তরাঁ, লেক ট্যাক্সি। ফণা-তোলা ফিটন। তারপরে চারদিকে এই, বিশৃঙ্খলা, ছুটোছুটি, এলোমেলোমি। এই যুদ্ধের ব্ল্যাক-আউটের কলকাতা। বিমান-আক্রমণের শেলটার। স্লিট ট্রেঞ্চ।

আমার মেয়ে সে-রকম নয়।

কোন রকম আবার! সব মেয়েই সে-রকম এক রকম। আমি বলছি, এমত সব অবস্থায় কলকাতায় বন্ধু সংগ্রহ করা আয়াসের নয়। এ নিয়ে

আপত্তি করতে যাওয়া অনর্থক। মেয়েকে যখন চরতে দিয়েছেন তখন তাকে ধরতেও দিয়েছেন। আর কখন ফ্লুর মত পান-বসন্তের মত মনের মানুষের ছোঁয়াচ লাগবে কেউ জানে না। আব সে-মানুষের কলকাতা-হাওড়া নেই, সদর-খিড়কি নেই। শীত-শরৎ নেই। বৃষ্টি হলেই বৃষ্টি। জ্বর হলেই জ্বর।

কিন্তু আমাকে এতদিন এ-সব বলোনি কেন?

আমাকে কি বলেছে! এ-সব কি কেউ বলে? এ-সব ক্রমে জানতে পায়। প্রথমে প্রচ্ছন্নে রোপণ, দ্বিতীয়ে গভীরে সঞ্চার, তৃতীয়ে অঙ্কুর। তারপরে যখন পল্লব জাগে তখনই কথা পল্লবিত হতে শুরু করে। শেষকালে যখন ফল আসে তখনই লোকে চরমকে দেখতে পায়। এই চরম দেখবার জন্যেই হয়তো এসেছে আগ বাড়িয়ে। প্রবল শব্দে পা ফেলে।

কে জানে হয়তো বা আরো দূর। যতদূরই হোক, যখন অভ্যাগত, ভাব করতে এসেছেন, সেবাচর্যা করতে হয় একটু।

'বলে দাও এ-সব চলবে না এখানে।' যেন কেউ হাতেব বালা ছিনিয়ে নিতে এসেছে এমনি গর্জে উঠলেন শৈলবালা।

'কি সব?'

'ঐ তোমাদের ভাব-টাব চলবে না।' আবার ঝঙ্কৃত হলেন।

'ডাব-টাব বলুন—' হাসতে লাগল নীলাদ্রি। চলে গেল গ্লাস নিয়ে।

যাই, ওঁকে, সোহিনীর বাবাকে বলিগে। কিন্তু তার আগে একটু উঁকি মেরে দেখে যাই কে এল! কে এমন বন্ধু এল বাড়িতে!

পা টিপে-টিপে এগুলেন শৈলবালা। বাবান্দায় গিয়ে খোলা জানলা দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি মারলেন।

আতঙ্কে মুখ তাঁর কালো হয়ে উঠল।

কেমন গৌরবর্ণ কান্তিমান ছেলে! ছাঁচে ঢালা নয় হাতেহেতেরে গড়েপিটে পরিস্ফুট করা। নিশ্চয়ই বামুনের ছেলে, তাঁদের আল-এলেকার বাইরে। সন্দেহ কি, এক মাঠের জমি নয়, এক গাছের ছাল নয়। জোড়া-তাড়া চলবে না, হবে না এক লপ্ত। কিন্তু এক মন হলে কি না হতে পারে? ভাবলেন একবার শৈলবালা। এক মন হলে সমুদ্র পর্যন্ত শুকোয়। শুকোক, কিন্তু জাতের বাইরে বিয়ে হতে পারে না।

তাড়াতাড়ি চলে গেলেন স্বামীর ঘবে।

শিবনাথও ঘুমুচ্ছেন।

হুড়মুড় করে তাঁর গায়ের উপর এসে পড়লেন শৈলবালা। বোঁটা-খসা

ফুল পাবার জন্যে যেমন শিউলি গাছকে নাড়া দেয়, তেমনি করে তাকে দু হাতে ঝাঁকাতে লাগলেন। 'ওঠো, ওঠো, বন্ধু এসেছে।'

'কি?' অনেক পরে চোখ চাইলেন শিবনাথ: 'বন্দুক নিয়ে এসেছে? কে বন্দুক নিয়ে এল? মিলিটারি?'

'বন্দুক নয়, বন্দুক নয়। আমার পোড়া কপাল! বন্ধু, সোহিনীর কে এক বন্ধু এসেছে।'

'বন্ধু, তা আসুক না!' প্রায় ধমকে উঠলেন শিবনাথ: 'পাড়ায় কত তার সই-স্যাঙাত আছে, এসেছে কেউ।'

'মরণ আর কাকে বলে! বন্ধুনি নয় গো, বন্ধুনি নয়, বন্ধু, পুরুষ বন্ধু।'

'তাতে ক্ষতি কি?' পাশ ফিরলেন শিবনাথ: 'জন্তুই বন্ধু হয়, পুরুষ বন্ধু হতে পারে না?'

'সে কি বলছ? শেষ পর্যন্ত সোহিনী পুরুষ-বন্ধু করবে?'

'কেন, বাধা কি? নিজের পায়ে চলা স্বাধীন রোজগেরে মেয়ে, সে একটা বন্ধু জোটাতে পারবে না? যদিও পুরুষ শেষ পর্যন্ত জন্তুই হয়ে দাঁড়ায়, গোড়াতে বন্ধুর বেশবাস পরেই দেখা দেয়। দিতে হয়। তাই দিয়েছে।'

'তুমি তোমার মেয়েকে বাঁচাবে না?'

'কত দিক থেকে বাঁচাব? একদিকে বোমা, আরেকদিকে দুর্ভিক্ষ, আবার আরেকদিকে বন্ধু। যে নিজে না বাঁচে সাধ্যি নেই কেউ তাকে বাঁচায়।'

'তাই বলে তোমার বাড়িতে দিন-দুপুরে ও বন্ধু আনবে?'

'রাত-দুপুরে আনলেই বা কি করতে পারতাম!'

'ছি ছি,' ধিক্কার দিয়ে উঠলেন শৈলবালা· 'তুমি এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করবে না? কে ঐ ছেলেটা তোমার মেয়ের কাছে এল জানতে পেরেও খোঁজ করবে না তুমি? জিগগেস করবে না ছেলেটাকে? ও যদি অন্য জাতের ছেলে হয়! নির্ঘাত অন্য জাতের, উঁচু জাতের ছেলে। নইলে অমন ফুটফুটে রঙ হয়? ময়ূরচড়া চেহারা হয়? ওগো, ওঠো না, একটু আলাপ করো না গিয়ে। কিছু একটা হয়ে বসলে তাড়াবার উপায় থাকবে না—'

'মেলা ফ্যাচফ্যাচ করো না।' হুমকে উঠলেন শিবনাথ: 'ঘুমুতে দাও, আমাকে তিনটের সময় কলে বেরুতে হবে।' আবার পাশ ফিরলেন: 'তুমি তোমার মেয়েকে অত বোকা ঠাওরাও কেন?'

'বোকা, সব মেয়েই বোকা। আগুনের কাছে সব ঘি-ই বোকা।' সাহসে ভর [illegible] মারলেন শৈলবালা : 'তুমি একটু ওঠো। বন্ধুটাকে [illegible]।'

[illegible] তা হল। চোখ বন্ধ করে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন [illegible]।

বরং মেয়ের [illegible] হওয়া ভালো। যদি স্বাধীনতার ঝলস দেখাতে চাও মা-বাবার চোখের বাইরে সমাজের চৌকাঠেব বাইরে।

ব্যস্ত পায়ে ছুটে এল নীলাদ্রি। বললে, 'উনুনটা ধরাতে হয় মাসিমা।'

'এই অবেলায়?'

'ভদ্রলোককে দুটো ফুটিয়ে দিতে হয।'

'কেন, হোটেল নেই শহরে? হোটেলে উঠতে বলো না।' বেআন্দাজী জোবে বলে ফেললেন শৈলবালা।

'অতিথিকে কি সেকথা বলা যায়?'

'না যায় তো তোমাব এত যখন দবদ তখন নিজেব বাড়িতে নিয়ে যাও। গেলাও গণ্ডেপিণ্ডে।'

হায়, আমার বাড়ি! আমার কি না আপনি জানেন মাসিমা! কত ছোটবেলা থেকেই জানেন। এই বছর আড়াই কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে স্টোর্সে খুদে কেরানির কাজ করছি, ভাতা নিয়ে মাস-মাইনে এক শ সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা। সুস্থ মানুষ, দু বছর আগে, ভাত খেয়ে আঁচাচ্ছেন, বাবা হঠাৎ পড়ে গেলেন। বাঁ অঙ্গ অবশ হয়ে গেল। দুর্ধর্ষ রুগী নিয়ে সমস্ত সংসার জেরবার। হেসে-খেলে যাচ্ছিল যে নৌকো, চড়ায় ঠেকে প্রায় ডুবতে বসল। ভাই নেই, একপাল বোন, একটারও বিয়ে হয়নি। বড়টা নার্স হতে না পেবে ভ্যাকসিনেটার হযেছে, সামান্য আয়, দ্বিতীয়টা সেলাইয়ের ট্রেনিং নিযে বসে আছে বাড়িতে। আবগুলো ছোট, ইস্কুল থেকে নামকাটা হয়ে ঘ্যানবঘ্যান কবছে রাতদিন। তাবপব এটাব অসুখ ওটাব বিসুখ, এটার অমুক জ্বালা ওটার অমুক লজ্জা। চালে-বেড়ায় এত বড সব ফুটো গোঁজা দিয়েও আর মিল দেওয়া যাচ্ছে না। সেই নিত্য অভাবের সংসার কি অতিথির জায়গা?

মার চড়া আওয়াজ শুনে সোহিনী বেরিয়ে এল। মার পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল মার ঘরে। সারা গায়ে রোদের ঝলস দিয়ে। ভাবখানা এই, যা হবার তা হোক। যখন বাড়িতেই এসেছে তখন বাড়িরই দায়িত্ব। রাখতে হলে রাখুন, তাড়াতে হলে দিন তাড়িয়ে। অমন দায়িত্বহীনের মত আসে কেন? এতটুকু গোপনতা নেই শালীনতা নেই। তাড়াহুড়ো

করে ব্যস্ত হাতে দরজা-জানলা খুলে ফেলার চেষ্টা। [illegible] আলগা হয়ে গেল কি না, খিল-ছিটকিনি ছিটকে পড়ল কি না, সেদিকে নজর নেই। অসহিষ্ণুতার চরম শাস্তি এবার কুড়িয়ে নিচ্ছে। [illegible] ধারার মত আসবে তা নয়, বন্যার জলের মত এসেছে। [illegible] কাণ্ড, পথ থেকে একেবারে নীলুদাকে নিয়ে এসেছে লুট করে। [illegible] নীলুদা ছাড়া যেন আর কারু কাছ থেকে পথের হদিস নেওয়া যেত না। [illegible] শহর, নদীর ধারে একটা নতুন বাড়ি, এ বার করতেই বীরপুরের [illegible] সপ্তদ্বীপ পরিক্রমণ করতে হল। বেশ তো, বাড়ি দেখতে এসেছ, বাড়ি দেখ। বাড়ি দেখে বাড়ি ফের।

'এ ছেলেটা কে?' ঘরে ঢুকে শৈলবালা জিগগেস করলেন। 'কি জাত? বামুন?'

'না। আমাদের জাত।' নতমুখে বললে সোহিনী।

শুধু এটুকুতেই নিশ্চিন্ত নন শৈলবালা। আরও দু-পা কাছে এগিয়ে এলেন। প্রশ্ন করলেন 'ঘর?'

জানি না—এমনি একটা ঝলসানো উত্তর আশা করেছিলেন শৈলবালা। কিন্তু সোহিনী স্পষ্ট চোখের দিকে তাকিয়ে কোণ থেকে একটু ঝিলিক মেরে বলল, 'পালটা ঘর।'

বুকের হাঁপটা খানিক নামল শৈলবালার, কিন্তু সহজ নিশ্বাসের জন্যে মুক্ত মাঠের হাওয়া চাই যে। জলের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে শুধু একটা খুঁটি পেলেই তো চলে না, পাড়ে যাবার জন্যে নৌকোরও দরকার। অনশনে শুধু খাদ্য জুটলেই চলে না, চাই আবার তা হজম করবার ক্ষমতা। শুধু ঘর হলেই চলে না, চাই আসবাব, চাই চুনকামের চাকচিক্য।

'লেখাপড়া কদ্দুর?'

'এম-এ পাস—ফার্স্ট ক্লাস—'

নৌকো বুঝি এগিয়ে আসছে মাঝনদীতে, খুঁটি-ধরা ডুবন্ত লোকটাকে পাড়ে তুলে নিতে। উদ্বেলকণ্ঠে শৈলবালা বললেন, 'সোনার টুকরো ছেলে। কার ছেলে? জানিস?'

একটু বিজ্ঞ হাসি হাসল সোহিনী। জানতে পারতপক্ষে কোনো ত্রুটি করিনি। বললে 'দ্বিজপদ সরকার যিনি কলেক্টর হয়ে রিটায়ার করেছিলেন, তাঁর ছেলে।'

'বলিস কি?' মেয়েকে প্রায় আঁকড়ে ধরলেন শৈলবালা: 'এ তো জানাশোনার মধ্যে। দ্বিজপদ সরকার তো মারা গেছেন শুনেছি—

'হ্যাঁ, কিন্তু কলকাতায় বাড়ি করে রেখে গেছেন।'

'বাড়ি? তাই না?' চোখ বড় করলেন শৈলবালা। এতক্ষণ ভয়ে বড় ছিল, এবার বুঝি লোভে! 'ক' ছেলে দ্বিজপদবাবুর?'

'চার।'

'এটি?'

'কনিষ্ঠ। নাম সুপ্রভাত সরকার।'

'বাড়িতে তাহলে ওয়ান-ফোর্থ অংশ আছে। কি বলিস?'

'নিশ্চয়ই আছে। পার্টিশন যখন হয়নি।'

'পার্টিশন হয়নি, না?' হাসিতে আবার আকর্ণবিস্তৃত হলেন শৈল-বালা : 'বা, তা হলে তো চিরকালের জন্যে মাথা গোঁজবার ঠাঁই নিটুট রইল। কি করে ছেলে?'

'সেই তো গোলমাল।' লজ্জায় হাসল সোহিনী, মনে হল হয়তো এখানেই হেরে যাবে মায়ের কাছে। 'কিছুই করে না। কাজ কাজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে, এই প্রায় দু বছর। আমি বলে দিয়েছি আগে চাকরি পরে বাকরি, বাকি সব। আর চাকরি বলতে টিঙটিঙে হিলহিলে চেহারার রোগাপটকা নয়, দস্তুরমত ঘি-দুধ খাওয়া মজবুত পালোয়ান।'

'তার মানে?' যেন এখুনি সুপ্রভাতের পক্ষ টানছেন শৈলবালা।

'তার মানে এক-শ দু-শতে হবে না, অন্তত তিন শতে স্টার্ট।'

হবে, হবে, এমন বাছেরবাছ ছেলে,' শৈলবালা দরজার দিকে পা বাড়ালেন শাঁসালো চাকরি একটা জুটিয়ে নেবেই। নিজেদের বাড়ি আছে, পরীক্ষায় পাস আছে, মুরুব্বির জোর কোন না আছে, এ ছেলের আর বসে থাকতে হবে না—'

শৈলবালা নিজেই আর বসে থাকতে পারলেন না। ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে চলে গেলেন সামনের ঘরে, সোহিনীর ঘরে।

দেখলেন সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রভাত।

'এ কি, চললে কোথায়?'

'হোটেলে।'

'ছি ছি, সে কি কথা?' চারদিকের অন্ধকারে আলো খুঁজতে লাগলেন শৈলবালা, 'নীলু, নীলু কোথায় গেল?'

পরমা তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, দু-একটা কথা কইছে কি না কইছে। এখন শৈলবালাকে পেয়ে সহজ হতে পারল সহজে। বললে, 'নীলুদা কাইকে করে বেরিয়ে গেছে।'

'কোথায়?'

'যাবার সময় বলে গেল দেখি ভদ্রলোককে আর কোথায় তুলতে পারি।'

টেবলফ্যানের হাওয়ায় পরমার কপালের কাছেকার কোঁকড়ানো চুলগুলি সাপের মত মাথা তুলে তুলে নাচছে : 'ভালো কোনো হোটেলে কিংবা অন্য কোনো বাড়ি।'

'না না, আমরা থাকতে তুমি যাবে কোথায়?' শৈলবালা গায়ে-পড়ার মতন হয়ে বললেন, 'এ-শহরে আমরা ছাড়া আপনার লোক আর তোমার কে আছে?' উথলে উঠলেন শৈলবালা : 'বোস, আমি তোমার স্নানের জল দিচ্ছি বাথরুমে। আমাদের টিউবওয়েলের জলের ঠাণ্ডা বলে খুব সুনাম আছে। তেল-তোয়ালে নিয়ে আসি আর সাবান—বোস বাবা, বোস।'

'না, বসব না।' সুপ্রভাত সুটকেসের হাতলটা আরও শক্ত করে ধরল। 'হোটেল না জোটে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম আছে। সোহিনী—সোহিনীকে একবার ডাকুন।'

'সোহিনী উনুন ধরাচ্ছে।' অনেক কথাই এখন অনর্গল বলতে পারছেন শৈলবালা এবং অনেক কথা যে বলে সে কিছু মিথ্যা বলে। এক-পা এগিয়ে আবার ফিরলেন দু-পা : 'দুটো ফুটিয়ে দেবে, না লুচি তৈরি করবে?'

কথা যেন কানেই তুলল না সুপ্রভাত। বললে, 'সোহিনীকে একটু দরকার। ওর জন্যে একটা জিনিস আছে।'

জিনিস? কই? চারদিকে ব্যাকুল হয়ে তাকালেন শৈলবালা। তবে কি সুটকেসের মধ্যে? পকেটে?

'ডাকুন। ওকে জিনিসটা একবার দেখিয়ে চলে যাই।'

দেখিয়ে? দিয়ে নয়? মনে মনে ছটফট করে উঠলেন শৈলবালা। পরমাকে বললেন, 'যাও, ডেকে নিয়ে এস তো ভিতর থেকে। দেখ তো, রান্নাঘরেই আছে বোধ হয়।'

পরমা সোহিনীকে তার মায়ের ঘরেই পেল। দিব্যি শুয়ে আছে টান হয়ে। কি আশ্চর্য, পারছে শুয়ে থাকতে! চোখ চেয়ে নেই, ঘুমের খনিতে নামিয়ে দিয়েছে অন্ধকারে।

না নামিয়েই বা করে কী। এত ঝামেলা পোষায় না সোহিনীর। যা হবার তাই হোক। যাদের বাড়ি তারা বুঝুক। যেমন গাওনা তেমন পাওনা নিয়ে চলে যাক।

'সে কি রে, শুয়ে পড়লি কেন?' গায়ে ঠেলা দিল পরমা : 'তোকে ডাকছে।'

'ডাকুক।' ঘুমো-ঘুমো চোখ তুলে তাকাল সোহিনী : 'আমার এমন মিষ্টি ঘুমটা মাটি করে দিল।'

'কিন্তু এই কি তোর ঘুমোবার সময়?'

'তবে কি আমার দু হাত তুলে নাচবার সময়?' চোখে আর মেঘ নেই, রোদের টাটকা ঝাঁজ জাগল : 'দ্যাখ দিকি কেন এই হৈ চৈ জানা-জানি, লোকডাকাডাকি? কেন মুখের উপরে এই হেডলাইট? সুন্দর করে নিরিবিলিতে ফুলটাকে দে না ফুটতে। কেন এই মাটি ওপড়ানো?'

'তোর জন্যে কি একটা জিনিস এনেছে। তার জন্যেই ডাক।' পরমা বার দুয়েক বেশি চোখ নাচাল : 'আর বোধ হয় শেষ ডাক। জিনিসটা দেখিয়েই চলে যাবে।'

'জিনিস? সে আবার কি?' বিকেলের রোদ যেমন চলে যায় তেমনি ঘুমটুকু সরে গেল চোখ থেকে। সোহিনী নড়ে-চড়ে উঠল।

হ্যাঁ, জিনিসের কথা একটা বলেছিল বটে। আনন্দের অহঙ্কারে কত কথাই তো বলেছে তখন তত গায়ে মাখেনি। কিন্তু এখন তো আর ঢিলেমি করলে চলবে না। কি জিনিস! একটা না কেলেঙ্কারি করে বসে! ধড়মড় করে উঠে বসল সোহিনী। ছি ছি, হয়তো একটা শাড়ি কিনে এনেছে, কিংবা কে জানে, কি ঘেন্না, হয়তো একটা গয়না! এসব পৌরাণিক গ্রাম্যতা এখনও যে কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাকে সোহিনী সত্যি ভালোবাসতে পারল কি করে?

সতর্ক করে দেবারও হয়তো সময় নেই। হয়তো মার সামনেই বলে ফেলবে, দিয়ে ফেলবে। কৃতিত্ব ফলাবে। দেখাবে এই বুঝি বশীকৃত করাব প্রশস্ত উপায়। সোনার উপায়!

দ্রুতপায়ে সোহিনী আবার গেল সামনের ঘরে, প্রথম ঘরে। যখন এসেই পড়েছে তখন সবটুকুই দেখে যাবে, তাই পরমাও অনুসরণ করল।

সোহিনীকে দেখতে পেয়েই পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা খাম বের কবল সুপ্রভাত। খামটা সোহিনীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'পড়ো।'

এ আবার কি। কতরকম ভয়ের মধ্যেই ফেলছে এনে লোকটা। চোখ নাক ঠোঁট কেমন শুকনো টান টান হয়ে গেল। কোনো দুর্ঘটনা নয়তো? কিংবা কোনো নালিশের নোটিশ? কোনো গোপন শত্রুর পত্র? বেনামিতে কোনো কলঙ্ককথা?

চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল সোহিনী। চোখ কপালে নেই, এ আবার কেমনতরো পড়া?

শ্বাসরোধ করে একটি নিটোল বিন্দুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলবালা। চিঠি পড়া সাঙ্গ করে কি শব্দে ধ্বনিত হয় সোহিনীর তারই অপেক্ষায় কান ধারালো করে রেখেছেন। সাইরেনের সময়ও এমন উৎকর্ণ থাকেন না।

পড়ে তার মানে করতে এত দেরি করছে কেন সোহিনী? একবার পড়ছে, দুবার পড়ছে, আগা পড়ছে, তলা পড়ছে, পাশ পড়ছে। শুধু পড়ছে না, দেখছে খুটিয়ে খুটিয়ে। এ পিঠ দেখছে, ও পিঠ দেখছে, খাম দেখছে, ডাকটিকিটের উপর পোস্টাপিসের ছাপ দেখছে। এ যেন আদালতের দলিল তজদিগ! শৈলবালার ইচ্ছে হল সোহিনীর হাত থেকে কেড়ে নেন চিঠিটা, হলই বা না ইংরিজীতে লেখা, ঠেকে-ঠেকে পড়ে ভাসা-ভাসা যা তিনি অর্থ করতে পারবেন তা নিশ্চয়ই সোহিনীর চেয়ে আগে হবে।

আস্তে আস্তে এ কি হতে লাগল! সোহিনীর মুখ ভরে যেতে লাগল হাসিতে। টলটল তলতল করে উঠল। ভুরু ঠোঁট নাক চিবুকের রেখাগুলি জলভরা তুলির টানে নরম-নরম হয়ে এল, সাদা জল নয়, সোনার জল। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না সোহিনী।

'কি হল?' শৈলবালা ঠেলা দিলেন: 'কিসের খবর?'

মুখে খাবারপোরা অবস্থায় যেমন লোকে কথা কয় তেমনি গদগদ হয়ে বললে সোহিনী, 'সুপ্রভাতের চাকরি হয়েছে। শুরুতেই সাড়ে তিন শ।'

'বলিস কি?' শৈলবালার সাধ হল এখুনি এক ঝাঁক উলু দিয়ে ওঠেন। কি দেখবেন, কি বুঝবেন কে জানে, ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়ালেন মেয়ের দিকে: 'দেখি, দেখি—'

সোহিনী ছাড়ল না চিঠি, এখুনি যেন তা ছাড়বার নয়। এ যেন আরো একটু নেড়েচেড়ে দেখবার মত, আরো বারকতক তলিয়ে বোঝবার।

'তোর বাবাকে খবর দে।' উছলে উঠলেন শৈলবালা। কে খবর দেবে, কারু নড়নচড়ন নেই, সুতরাং তিনি নিজেই চললেন ব্যস্ত হয়ে। প্রায় হালকা পায়ে।

ঘুমন্ত স্বামীর ঘরে গিয়ে হামলা দিলেন: 'ওগো, শুনছ, সুপ্রভাতের চাকরি হয়েছে—'

'কার?' খ্যাঁক করে উঠলেন শিবনাথ।

'সুপ্রভাতের।'

'সে আবার কে?' শিবনাথ ঘুমভাঙা লাল চোখে কটমট করে তাকালেন।

'ওমা, তুমি তাকে চেন না? দ্বিজপদ সরকারের ছেলে, কলেক্টর না কন্ট্রাক্টার ছিলেন যিনি, বছর দুই গত হয়েছেন, তাঁর ছোট ছেলে সুপ্রভাত।' হঠাৎ গলা গভীর খাদে নামিয়ে বললেন, 'সোহিনীর কাছে তার যে বন্ধু এসেছে সে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বই কি, খুব চিনি। বিজনপদ সরকারকে কে না চেনে? তিনি এসেছেন?' ধড়মড় করে উঠে বসলেন শিবনাথ।

'ইডিয়ট!' শৈলবালার দু পাটি দাঁতে সম্মুখ সংঘর্ষ হল: 'তিনি কেন আসতে যাবেন? তাঁর ছেলে, ছোট ছেলে, আমাদের সুপ্রভাত। এম-এ পাস, দেখ না গিয়ে কেমন হীরের টুকরো চেহারা! সোহিনীর বন্ধু, ইংরিজীতে কি বলে বলো না, তার চাকরি হয়েছে। সোনার চাকরি। গোড়াতেই সাড়ে তিন শ।'

'বলো কি? কোথায় সে? কি চাকরি?' পুরোপুরি না সামলেই নেমে পড়লেন শিবনাথ।

'গিয়ে একবার দেখ না নিজের চোখে।' যেন ওঁচানো চেলাকাঠে তাড়া করলেন শৈলবালা: 'যার বাড়িতে অতিথি এসেছে সে কিনা অচেতন! আদর-আপ্যায়ন না করলে ফিরে যাবে যে, তখন কি হবে! যাও, আস্তে আস্তে কথাটা গিয়ে পাড়ো, কবে যাবে কলকাতায়, কবে তার দাদাদের মত নেবে, দাদারাই যখন অভিভাবক—'

মুখ কাঁচুমাচু করলেন শিবনাথ: 'চাকরি হল অন্যের আর খাটুনি বাড়ল আমার! আমাকে আবার ওসব হাঙ্গামায় কেন? রুগীপত্তর নিয়ে নিরীহ মফস্বলে পড়ে আছি—'

'তাই বলে তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না? বাপের পক্ষে সামাজিক প্রস্তাব করবে না একটা?'

'মেয়ে এতদূর পেরেছে আর বাকিটুকুও সেরে নেবে। সামাজিক হতে গেলেই খরচ বেশি।' কাছাকোঁচায় প্রকৃতিস্থ হলেন শিবনাথ: 'বিয়ের আপিসে গিয়ে সাক্ষী রেখে একটা দলিল সই করে দিলেই খোলসা। চালাকি দিয়ে মহৎ কাজ হয় না, যে বলেছে ভুল বলেছে। চালাকি দিয়ে বিয়ে হয়, আর কে না মানবে, বিয়ে একটা মহৎ কাজ—'

এবার যে কাঠ উদ্যত করলেন শৈলবালা তা জ্বলন্ত কাঠ। বললেন, 'চালাকি দিয়ে যে মহৎ কাজ হয় সে হচ্ছে তোমার ডাক্তারি। যাও, আর জুতো পরতে হবে না, খালি পায়েই চলে যাও। দেরি হলে হোটেলে গিয়ে উঠবে—হোটেল!' সে একটা কি ভীষণাকার জিনিস, দু হাতের দশটা আঙুল মুখের কাছে তুলে শৈলবালা দাঁতে মুখে বিকৃত ভঙ্গি করলেন।

খাটের তলা থেকে স্যাণ্ডেল জোড়াও কুড়িয়ে নেওয়া হল না। পড়ি-মরি করে ছুটলেন শিবনাথ।

'বোস বাবা বোস, দাঁড়িয়ে কেন?' শিবনাথ উচ্ছ্বসিত হলেন: 'বা, টেবলফ্যান এসে গিয়েছে বুঝি? শুধু ডাব, বরফ আনতে পারেনি কেউ?

দে,' মেয়ের দিকে তাকালেন : 'স্নানের জল দে তুলে। কতক্ষণ ধরে এসেছে, এখনো এতটুকু হুঁশ নেই! কি পড়ছিস ওই চিঠি?'

বিজয়িনীর মত চিঠিটা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল সোহিনী।

সত্যি সত্যিই চাকরির চিঠি। যুদ্ধের বাজারের ভুঁইফোঁড় ঠুনকো সদাগর নয়, দস্তুরমত নামকরা শিকড়গাড়া আমেরিকান ফার্ম। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন চিঠি, কাল থেকেই শুভারম্ভ। ধাপে-ধাপে উন্নতি, হার যা বিদেশীদের প্রাপ্য। প্রায় ধারণা-ভাবনার বাইরে।

শিবনাথ চিঠিটাকে কপালে ঠেকালেন। বললেন, 'তোমার কৃতিত্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু বাবা, শুধু নিজের জোরে হয় না। এ তোমার বাবার আশীর্বাদ, আমাদের আশীর্বাদ—'

এক ঝলক ধুলোর ঝড়ের মত নীলাদ্রি সাইকেলে করে হাজির। বললে, 'ডাকবাংলোটাই ঠিক করে এসেছি। হোটেল-টোটেল এখানে সুবিধের নয়। চলুন, দেরি করবেন না, একটা রিকশা নিয়ে নেব মোড়ের থেকে—'

'নাও নাও, রান্না চড়িয়ে দাও।' শৈলবালাকে উদ্দেশ করে উল্লাসের ইস্তাহার জারি করলেন শিবনাথ : 'কিছু বাজার চাই তো, বেশ বলো নীলুকে। ডিম দই মিষ্টি।' পরে নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে 'তোমার ডাকবাংলোর ডাক আছে আর আমার পর্ণকুটিরের ডাক নেই? ডাক কি আড়ম্বরের? ডাক আন্তরিকতার।' পরে সোহিনীকে লক্ষ্য করে : 'কি, জলটল দিলি?'

'দিচ্ছি।' এতক্ষণে যেন পায়ের বেড়ি খুলে গেল সোহিনীর। ছুটে ভরাভর্তি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে হেসে সুপ্রভাতের হাতে দিল। জল দিতে হলেও বুঝি প্রাণে জল চাই।

'বাবাঃ, এতক্ষণে খাবার জল পেলুম।'

সুখ বুঝি মানুষকে নির্লজ্জ করে। কিছু ভেবে বলেনি, তবু বলে ফেলল সোহিনী, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : 'সব পাবে।'

'ডিম দই মিষ্টি—' নীলাদ্রি সোহিনীর দিকে তাকাল।

'না না, ওসবে দরকার নেই। আমি নেক্সট ট্রেনেই ফিরে যাব।' সুপ্রভাত দরজার কাছ বরাবর একটু নড়ল-চড়ল।

'সে কখনও হয়? হতে পারে?' শিবনাথ কলমের এক আঁচড়ে মামলা উড়িয়ে দিলেন : 'অতিথি অপীত-অভুক্ত হয়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।' বলে সুটকেসটা তুলে নিয়ে ভিতরের ঘরে রাখতে গেলেন। 'তাছাড়া চিঠিটা এখনও আমার হাতে।'

আরো একটু দুর্বল প্রতিবাদ করল সুপ্রভাত : 'কালকেই আমার জয়েন করার কথা।'

'বেশ তো, রাতটা থাকো, ফার্স্ট ট্রেনে যেও।' চোখের দিকে তাকিয়ে কি না তাকিয়ে টুক করে বলে ফেলল সোহিনী।

দেখতে পাচ্ছ না কি হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। রোদে হলদে হয়ে যাওয়া শুকনা ডাঙায় ঝিরঝির করে জল নেমে এল। চোখজুড়ানো সবুজ হয়ে গেল চারদিক। দেখছ না জংধরা লোহার দরজা খুলে গেল আলগোছে। যে মুষ্টি প্রতিরোধে বদ্ধ হয়েছিল তা খুলে গেল নরম হয়ে। যে দূরে প্রত্যাখ্যানে নিশ্চল ছিল নিজের থেকে কাছে চলে এল হেঁটে-হেঁটে।

এমনও হয়!

মনের একটুখানি এদিক-ওদিক, আর তাতে কোথায় যাচ্ছিলাম নাম-না-জানা শূন্যতার বন্দর, এখন দেখি একেবারে গ্রামের ঢালু ঘাটটিতে এসেই নোঙর নিয়েছি। সব নদীই পৌঁছে দেয় যদি হালের বাঁকটুকু ঠিক থাকে।

এখন দেখছি এসে ভালোই করেছ, বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। কত সহজে চালু হয়ে গেল কথাটা। শুধু চালু হওয়া নয়, কথাটা কেমন কাছিয়ে এল। নিজেকে শুধু আবির্ভূতই করলে না, প্রতিষ্ঠিত করলে। শুধু ভাসা-ভাসা নয়, হাতের উপর হাতের চাপরাখা সমর্থন আনলে। সন্দেহের গুমটের মধ্যে বওয়ালে স্বীকৃতির প্রসাদবায়ু। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি।

আর সত্যি, কি আশ্চর্য তোমার আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা! আগুনের মত দেখতে। আর, আগুন দেখতে কি সুন্দর! কি লোভনীয়! সোমবার কলকাতায় দেখা করেই দিতে পারতে খবরটা, হয় স্কুল-ফেরত রাসবিহারীর মোড়ে, নয়তো আগে থেকে কোনো ঠিক-করা জায়গায়। মার্কেটের গোল চাতালে নয়তো পর্দাটানা রেস্তরাঁর কামরায় নয়তো সারকুলার রোডের পার্কের নিরিবিলিতে। সে বলায় শুধু বলাই হত, এমনি করে এক-ডাকে জয় করে নেওয়া হত না। শুধু চলে যাওয়া হত, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হত না। তোমার উৎসাহকে বলিহারি। ঔৎসুক্যকেও।

এখুনি যাবে কি। আহা, কত শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এসেছ, একটু সেবা নিয়ে যাও, স্পর্শ নিয়ে যাও।

'তাছাড়া,' আগের কথার জের টানল সোহিনী : 'এখনো কোনো কথা হল না—'

আর ৺যায় কোথা! গাম্ভীর্য খসে পড়ল হাত থেকে। মাঝখানে পাঞ্জাবিটা পরেছিল আবার তা খুলে ফেলল সুপ্রভাত।

নীলাদ্রি ফোড়ন দিল : 'তাছাড়া, মফস্বলের শহর, বিকেলে চারদিক ঘুরে ফিরে একটু দেখুন। ব্রিজ, গির্জে, কলেজ—'

হাইকোর্ট! ভাগ্যিস হাইকোর্ট বলেনি। মনের বক্রতাটুকু সুপ্রভাতের ঠোঁটে ফুটে উঠল বোধহয়।

সোহিনীর ভালো লাগল না। বললে, 'কিন্তু এখানে নদী তো দেখবার।'

নদী শুনলেই মন আনচান করে ওঠে। পুবের খোলা জানলা দিয়ে সুপ্রভাত তাকাল বাইরে। কিন্তু এ কি চেহারা! জল দেখা যায় না, শুধু একটানা একটা ফাঁকা রেখা শুষ্ক হাহাকারের মত তাকিয়ে আছে। এর চেয়ে তোমার নদী, অগাধ ঢেউয়ের নদী, অনেক বেশি সুন্দর। তোমার নদীই স্নিগ্ধ করে, শুদ্ধ করে, তৃপ্ত করে। সুপ্রভাত মধুমাখা চোখে পরিপূর্ণ করে দেখল সোহিনীকে।

'যদি বল তো' নীলাদ্রি বললে, 'একটা গাড়ি যোগাড় করে নিয়ে আসি। ইচ্ছে করলে কিছুটা দূরেও ঘুরে আসা যায়।'

'ভগবান রক্ষে করুন। র‍্যামশ্যাকল একটা গাড়িতে চড়ে মফস্বলের শহর ঘুরি!' সুপ্রভাত তাচ্ছিল্যের সুর আনলে।

এতে অবিশ্যি সোহিনীরও অনিচ্ছা। যেটুকু বা বাকি ছিল মোটরের শব্দে চতুর্দিক ঢি-ঢি পড়ে যাক। নীলুদা তো গাড়িতে আসবে না। নীলুদা সেই সাইকেলে। তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে সে আসবে পিছু-পিছু ব্রিজ দেখাতে গির্জে দেখাতে, কলেজ দেখাতে, সে এক কেলেঙ্কারির একশেষ। দরকার নেই গাড়ি চড়ে। কলকাতায় অনেক গাড়ি, অনেক গির্জে-ব্রিজ।

'তার চেয়ে এক কাজ করো—' নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করল সোহিনী : 'বিকেলে এখানে ছোটখাটো একটা জলসা বসাও।'

'জলসা?' আঁক করে উঠল সুপ্রভাত . 'ভিড়ের গান?'

'ভিড় আবার কি! আসলে নীলুদাই গাইবে।' আর, পরমার দিকে তাকাল সোহিনী : 'আর পরমা যদি গায় এক-আধটা।'

'আপনি গাইবেন?' কৌতূহলের চেয়ে যেন উৎসাহই বেশি এখন সুপ্রভাতের।

পরমা হাসল। বললে, 'সোহিনী এখন সর্বত্রই গান দেখছে। ওর এখন পাথরেও গান, নিথরেও গান। ওর কথা গ্রাহ্য করবেন না। সব

কথা নয় অবিশ্যি—আমার সম্বন্ধে কথাটা। তবে নীলুদা যদি গায় সে একটা শোনবার মত—'

'তোমার সেই গানটা নীলুদা—' পরমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে উষ্ণ হল সোহিনী : 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে—কি আশ্চর্য যে শোনায়!'

নীলাদ্রির অকৃতী চেহারার দিকে করুণ চক্ষুর ছায়া ফেলল সুপ্রভাত। বললে, 'কই, নাম শুনিনি তো।'

'সেই তো মফস্বলী গুণীদের ট্র্যাজেডি। কেউ তাদের কল্কে দেয় না, নাম শোনে না।' নীলাদ্রির পক্ষে যেন উকিল হয়ে দাঁড়াল সোহিনী : 'কিন্তু যদি তুমি ওর গান শোনো তোমার ইচ্ছে হবে বলতে তুচ্ছ কেরানিগিরি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও তোমার কুনো এঁদো শহর, চলে যাও কলকাতায়, মহানগরীর জনতায়, প্রাণের জন্যে গান দিও না, গানের জন্যে প্রাণ দাও।'

সূক্ষ্ম একটি ব্যঙ্গের রেখা এঁকে সুপ্রভাত বললে, 'অত সময় কই শোনবার! তাছাড়া, যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে কে শোনে গান!'

যুদ্ধের মধ্যেও শোনে।' জোর দিল সোহিনী : 'গান সব সময়েই গান। আকাশ সব সময়েই আকাশ।'

ভালোবাসা সব সময়েই ভালোবাসা পরমার ইচ্ছে হল এটুকুও সোহিনী বলুক শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সোহিনী খাদের কিনারায় এসে হঠাৎ থেমে পড়ল।

আবার সওয়াল ধরল সোহিনী 'নীলুদার যদি গান শোনো তবে মনে প্রশ্ন জাগবে মূল্য দেবে কাকে? যে গান লিখেছে তাকে, না, যে গান গেয়েছে তাকে?'

হো-হো শব্দে হেসে উঠল সুপ্রভাত। 'এও আবার প্রশ্ন নাকি? সব সময়েই, যে লিখেছে তাকে। কে গাইত যদি বা যিনি লিখবার তিনি না লিখতেন।' হাসির শব্দেই মামলা নস্যাৎ হয়ে গেল।

কিন্তু উকিল সব সময়েই কথা কয়। মুখের উপর বিরুদ্ধ রায় পাবার পরেও তর্ক করে। তাই সোহিনী বললে, 'কিন্তু লেখকই বা কি করত যদি কেউ না গাইত তার গান?'

মামলা কি মক্কেলের, না, উকিলের নিজের? আবার হাসির শব্দে ফেটে পড়ল সুপ্রভাত : 'সবাই পড়ত, স্রেফ পড়ত। পুরো না হোক কিছু অন্তত রস নিত, অন্তত কবিতার রস। কি দরকার আমার গায়কের? আমি নির্জনে বসে পড়তাম আর আমি নিজে গাইতে না পারলেও আমার মনে, সকলের মনেই যে বাউলবৈরাগী আছে, সে গেয়ে উঠত।'

'থাক, দরকার নেই জলসায়।' সোহিনী নথি গুটোল: 'বিকেলে নদীর পাড়ই অপরূপ। ছায়া করে আসবে আর হাওয়া দেবে অফুরন্ত।'

'নদীর পাড়ও কিছু নয় যদি নিভৃতি না থাকে। আসলে অপরূপ হচ্ছে নিভৃতি।'

এও কি একটা খোঁচা নাকি সুপ্রভাতের? সোহিনী বললে, 'নিভৃতি মনে। বাহ্যিক পরিবেশে নয়। মনই পরিবেশ।'

'আমি বলি উলটো। পরিবেশই মন। পরিবেশটি অনুকূল হল মনও সাড়া দিল। চিঠি এল চাকরির অমনি বেজে উঠল জলতরং।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে শৈলবালা ঘরে ঢুকলেন। দু হাত নেড়ে বলতে লাগলেন, 'নাও, বাথরুমে সব রেখে এসেছি, যাও স্নান করে এস। রান্নাও চাপিয়ে দিয়েছি স্টোভে। তুমি, নীলু,' নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি আর কি করতে আছ?' কথাটা যেন কেমন বেকায়দার হল, মুহূর্তে সামলে নিলেন: 'অনেক ঘোরাফেরা করেছ রোদ্দুরে, যাও এবার বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করে ঠাণ্ডা হও। আর তুমি—' পরমার দিকে তাকালেন শৈলবালা।

পরমাই বা কি করতে আছে? ঘরের মধ্যে ঠিক দুপুরের মতই আটপৌরে নয় যেন শাড়িটা, শৈলবালার মনে হল, একটু যেন বেশি। চুলটা কি একটু বেশি ঠিক করা? ওর দিকে একটু বেশি করে তাকাচ্ছে নাকি সুপ্রভাত? কি দরকার বাপু পরের ঘরোয়া ব্যাপারে পা মাড়াও। ভিড় না বাড়িয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাও, নিজের চরকায় গিয়ে তেল দাও। কে না জানে বাপু প্রত্যেক মেয়েই ঈর্ষার একটি বারুদঘর। কখন কোন ফাঁক দিয়ে এক কণা আগুন এসে পড়বে, অমনি তার চণ্ডমূর্তি। কুকথা বলতে শুরু করবে, স্বনামে-বেনামে ভাঙচি দেবে। শেষ পর্যন্ত বলবে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আমি যে ছিলাম কাছে কাছে অন্তত পাশের ঘরে। মেয়ের শত্রু মেয়ে। আর সে শত্রু জঘন্যতম।

'না, আমি যাই।' আঁচলে দোলা দিল পরমা।

সোহিনী ধরে ফেলল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, পরমা থাক।'

শকুন্তলার বুঝি অনসূয়াকে দরকার। ফুলের দরকার পত্রচ্ছায়ার। দরজার দরকার একটি পর্দার অন্তরাল।

পরমা থাকল, ধাপ্পাবাজ অঙ্কের আরো ক' ধাপ দেখে যাক পরমা। কি করে কড় গুনে-গুনে হিসেব মিলিয়ে প্রেম করা যায় স্বচক্ষে দেখে যাক তার উদাহরণ। দুই ভুজ সমান হলে দুই ভিত্তিকোণও সমান হবে এ

সার্থক জ্যামিতি। কিন্তু দুই হৃদয় সমান হলে জাত-পাত বংশ-বিত্ত পাস-চাকরি সব আকাঙ্ক্ষায় সঙ্গে মিলে যাবে লোকতন্ত্রে এ কোথাও লেখা নেই।
সমস্ত মেলবার পর এগিয়ে গিয়ে বিয়ে করো, বুঝি। সমস্ত মেলবার পর পৌঁছিয়ে গিয়ে প্রেম করো, এ কি দুর্ঘটনা। দেখেশুনে বিয়ে হয়, এ দেখি দেখেশুনে প্রেম। যেচে-বেছে তেমন লোকের সঙ্গেই প্রেম করো যার চেহারাটি উত্তম, জাতি-গোত্রে যে খাপ খায়, বিদ্যায় যে বাজারে বিকোয়, অবস্থায় যে কুলীন। যে পথে কোথাও এতটুকু কাঁটা-খোঁচা নেই, ঠোকাঠুকি নেই, উঃ, কি নিখুঁত ও নিপুণ কারুকাজ! ছোটমনের বদহিসেবের যোগফল!

পরমা, এ তোমার হিংসে ছাড়া কিছু নয়। সোহিনীর দোষ কি! নিয়তিই তাকে কুসুমের পথ করে দিয়েছে, মাখনের স্তূপের ভিতর দিয়ে ছুরি চলে যাওয়ার পথ। তার জন্যে এতটুকু কোথাও বাধা রাখেনি, আঘাত রাখেনি, ঘাসের মতই সহজ করে দিয়েছে, ঘুমের মধ্যে নিশ্বাসের মত সহজ। ওর শ্রীতে কাতর হওয়ার কোনো মানে নেই। নরম-ভিতু মানুষ, স্নেহে-সোহাগে মানুষ হয়েছে, ও খোলা মাঠে লড়বে কি করে? তাই ও কেল্লার দিক দেখেছে, মজবুত কেল্লা। আহা, ও সুখী হোক, শান্তি পাক, ওর হিসেব মিলুক।

পরমা থাকবে এ শৈলবালা পছন্দ করলেন না। আর সুপ্রভাত বুঝল, দুপুরটা অদানে-অব্রাহ্মণে গেল।

খাইয়ে-দাইয়ে সোহিনীর ঘরে আপাতত বিছানা করে শৈলবালা সুপ্রভাতকে শুইয়ে দিলেন। বললেন, 'বাবা, একটু গড়িয়ে নাও। টেবল-ফ্যানটা হয়ে ভালোই হয়েছে। যদি একটু ঘুম আসে তো আসুক।'

ঘুম এলেও মন্দ ছিল না এলেন শিবনাথ।

'চলবে?' হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। বদান্যতার সীমা ছাড়ালেন শিবনাথ।

যদি বা চলত, ভাবী গুরুজনকে সম্মান দেখাবার প্রয়োজনে কুণ্ঠিত হল সুপ্রভাত। বললে, 'না, দরকার নেই।'

এর পর চলে যাও গুটিগুটি, তা নয়, খাটের একধারে বসলেন শিবনাথ। বাড়িঘরের কথা আত্মীয়স্বজনের কথা আসন্ন শুভকর্মের কথা জিগগেস করো তা নয়, পাড়লেন কিনা যুদ্ধের কথা। 'কি মনে হয় তোমার অবস্থা?'

'ভালো।' সংক্ষেপে সারতে চাইল সুপ্রভাত।

'কে জিতবে মনে হয়?'

যেন তার মনে হওয়ার উপরেই সব নির্ভর করছে এমনি গম্ভীর মুখ করে সুপ্রভাত বললে, 'আমরা।'

'আমরা মানে? ইংরেজরা?' মুখ শুকিয়ে গেল শিবনাথের।

'আমরা মানে আমরা। ফোকটে আমরা স্বাধীন হয়ে যাব। পরের চাল পরের কলা কিন্তু ব্রত করব আমরা।'

পরিহাসের ছোঁয়াচে মুখভাব নরম হবার কথা কিন্তু শিবনাথ যেমন কঠিন তেমনি কঠিন। 'তা হলে তো বড় বিপদ হবে।' যেন মূর্তিমান আতঙ্ক দেখছেন।

'এই আমাদের স্বাধীন হওয়া?'

'নিশ্চয়। কে আমাদের তখন দেখবেশুনবে? আমরা চালাব কি করে?'

'বিপদ আবার কি! পড়ে পাওয়া বিছানায় দিব্যি দিবানিদ্রা দেব।'

ইঙ্গিতটা এতক্ষণে বুঝলেন। বললেন 'হ্যাঁ, তুমি একটু বিশ্রাম করো। আমার রুগী দেখতে বেরুবারও সময় হল—'

ভাগ্যিস বিছানায় শোয়া মাত্রকেই তিনি রুগী ভাবেন না। পাশ ফিরল সুপ্রভাত।

পাশেব পশ্চিমের ঘরে শৈলবালার খাটে সোহিনী আর পরমা শুয়েছে। আর শৈলবালা নড়ে-চড়ে টুকিটাকি কাজ করছেন এটা-সেটা। যখন একবার উঠে পড়েছেন তখন অনেক ঘুমন্ত কাজও চোখের সামনে জেগে-জেগে উঠছে। হাত উদ্যত করলে অনেক কাজই হাতের কাছে মাথা পাতে।

'তোবা দেখি শুয়ে পড়লি—' ক্ষীণকণ্ঠে একটু যেন অনুতাপ করলেন শৈলবালা: 'ও ঘরে গিয়ে একটু গল্প-টল্প কবলে—বেচারা একেবারে একা—'

চোখবোজা দুই বন্ধু চুপ করে রইল।

পালিয়ে না যায়! ত্রস্ত হয়ে উঠলেন শৈলবালা। দেখলেন ও ঘরে নয়, এ ঘরেই সুটকেস, আর সুটকেসের মধ্যেই সোহিনী পুরে রেখেছে তখন চিঠিটা। আর কথা হয়েছে শেষ বাত্রের ফার্স্ট ট্রেনটাতেই যাবে। গোটা একটা রাত থাকবে এখানে।

হ্যাঁ, ও তো তাঁদেরই অনুরোধ। তাঁরাই তো অকালে-বিকেলে ছাড়তে চাননি তাকে। কি একটু ভালো করে খাওয়াতে পারলুম না, এই রাতটা অন্তত থেকে যাও। এ তো তাঁদের কথা। ফার্স্ট ট্রেনটাতে গেলে হেসে-খেলে দিব্যি আপিস করতে পারবে। এ তো তাঁদেরও আশ্বাস। না, পালাবে কেন? পালাবার জন্যে কি কেউ আসে?

কাজের ঢেউয়ে আবার কখন রান্নাঘরে গেছেন শৈলবালা।

পরমা চোখ চেয়ে বললে, 'তোর কি মনে হয় নীলুদা আবার আসবে?'

'আসা তো উচিত নয়।' চোখ না মেলেই বললে সোহিনী।

কিন্তু ক্লেদ পড়ো পড়ো হতেই নীলাদ্রি এক গাড়ি নিয়ে হাজির। এবং আনতে পেরেছে বলে বেশ খানিকটা গর্বে ডগমগ। বলছে, 'বিপিন জোয়ারদারের সেই ভাঙা লজঝরটা নয়, ডিরিকুইজিশন করা নতুন গাড়ি, এখানকার ইনসিয়োরেন্স ম্যানেজারের। লম্বা ড্রাইভ যদি দিতে চাও তাও আটকাবে না, আকণ্ঠ পেট্রল আছে। রাত আটটা পর্যন্ত মেয়াদ।'

এও একটা প্রস্তাব! গাড়ি নেওয়া মানেই আরো কতকগুলো প্যাসেঞ্জার নেওয়া। ঐ দেখ না গাড়ির শব্দে আশে-পাশের বাড়ি থেকে দঙ্গল-দঙ্গল শিশু বেরিয়ে এসেছে। সোহিনীর সঙ্গে কার কি খাতির, যতদূর ধরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে। ছেঁকে ধরবে। ক'টা বা কোলেই চড়ে বসে কিনা ঠিক নেই। আগে ছিল গুরুজনের ভয়, এখন দাঁড়াবে লঘুজনের। এ বেড়ানোর অর্থ কি? কি সুবিধে?

'না, না, গাড়িফাড়ির দরকার নেই।' হাতের এক নিষ্ঠুর মুদ্রা করে বাতিল করে দিল সুপ্রভাত।

'হ্যাঁ, গাড়ি ফিরিয়ে দাও।' সোহিনীও সায় দিল।

'উনি তো ফাস্ট ট্রেনে ফিরবেন,' নীলাদ্রি তাকাল সোহিনীর দিকে : 'তবে সে সময় কি আসতে বলব?'

'না, না,' প্রায় ধমকে উঠল সুপ্রভাত : 'আমার রিকশা ঠিক করা আছে।'

'রিকশাদের কথা বলবেন না' তবু কথা বলবে নীলাদ্রি : 'কখন কে রাস্তা থেকে টেনে নেবে ঠিক নেই। একটা নির্ভরযোগ্য গাড়ি থাকতে—'

রূঢ় কটাক্ষ করল সোহিনী। তার অর্থ, নিরস্ত হও, পরোপকারে আর প্রসারিত হতে হবে না।

কি ভেবে হঠাৎ উল্লসিত হল সুপ্রভাত। সোহিনীকে জিগগেস করল, 'তুমিও তো কালই ফিরছ।'

'সন্দেহ কি, কাল যখন সোমবার—'

'তবে আমরা তো একসঙ্গেই ফিরতে পারি, ফাস্ট ট্রেনে—'

সে না জানি কি চমৎকার হবে, এই একসঙ্গে ট্রেনে যাওয়া, এক কামরায়। ঐ রাত-সীমান্ত ট্রেনে নিশ্চয়ই ফাঁকা কামরা পাওয়া যাবে, নিচু ডালে না হয় মগডালে। একটা ছোটোর মধ্যে তাদের স্থির হয়ে থাকা, ঘন হয়ে থাকা, এর না জানি কি রকম স্বাদ! চোখের সামনে আস্তে আস্তে অন্ধকার আবছা হতে থাকবে, সবুজ হয়ে ভোর জাগবে, প্রথমে সবুজ, আস্তে আস্তে সোনা, পরে হীরে, সে না জানি কেমন চোখমেলা! প্রচ্ছন্ন রহস্যালোক থেকে তারা ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হবে পরিপূর্ণ স্পষ্টতায়, সে না জানি কেমন

চলে আসা, কেমন ফেলে আসা। মন্দ কি, গাড়িটা তা হলে আসুক।

সোহিনী বললে 'আমি থার্ড ট্রেনে ফিরব। আমি ঐ ট্রেনটাতে ফিরি।'

শৈলবালা ওদিক সেদিক আছেন বটে, কিন্তু কান আছে এদিকে। বলে উঠলেন, 'সে তো সঙ্গে কেউ থাকে না বলে। এখন যখন ভালো সঙ্গী আছে—'

ভালো সঙ্গী! সুপ্রভাতের দিকে চেয়ে লজ্জায় একটু হাসল সোহিনী। বললে, 'বা রে, আমি অত সকালে উঠতেই পারবো না।'

'বা, তাহলে আমাকে কে জাগিয়ে দেবে?' সুপ্রভাত ছটফট করে উঠল।

নীলাদ্রি বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, মানে, সেই হয়তো জাগিয়ে দিতে আসতে পারে—সোহিনী আবার ভুরু তুলে শাসন করল তাকে।

শৈলবালা এলেন উদ্ধার করতে। বললেন, 'আমিই পারবো তুলে দিতে। আর যদি একজনকে পারি,' মেয়ের দিকে তাকালেন : 'দুজনকেও পারব।'

'না,' সোহিনী তবু ঘ্যানঘ্যান করে উঠল : 'অত ভোরে যাবার আমার কি দরকার! সোমবারে আমার পিরিয়ড বারোটায়। থার্ড ট্রেনটায় আমার সুবিধে। আমি স্নান করে খেয়ে-দেয়ে বসে-জিরিয়ে যেতে পারি। স্টেশন থেকে সোজা চলে যেতে পারি স্কুলে। আমার তো আর আপিসে প্রথম জয়েন করা নয়।'

সুপ্রভাত বুঝল সকলের চোখের উপর দিয়ে একসঙ্গে ফর্সা-না-হওয়া ঝাপসা ট্রেনে ভ্রমণ করাটা সোহিনীর শালীনতায় বাধছে। এটার মধ্যে থেকে যাচ্ছে কোনো অধৈর্যের ঝাঁজ, কোনো বা স্থূল হস্তের অবলেপ। কিন্তু যে রাতটা আসছে কালো হয়ে, ভারি হয়ে, একান্ত হয়ে তাকে সে কি বলবে? কি করে সরাবে সেই জগদ্দলন বোঝা? হ্যাঁ, থাকা আলাদা ঘরে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু পাশাপাশি ঘরে, এক বাড়িতে, এক ছাদের নিচে। আর যেখানে দরজা খুলে দিলেই নদী আর নদীর কোল ঘেঁষে অবাধ ঘাসের নিমন্ত্রণ। শালীনতা রাখতে হলে তো আশ্রয় দেওয়াই বিড়ম্বনা।

তখন থেকেই লক্ষ্য করছে সুপ্রভাত, তার শোবার জায়গাটা এ-ঘরে, সোহিনীর ঘরে হবে না। সোহিনীর ঘর সোহিনীরই থাকবে। ও পাশে উত্তরদিকে যে সংলগ্ন ঘর আছে তাতেই তার বিছানা হচ্ছে। সুপ্রভাত ভেবেছিল নিজের ঘরটা তাকে ছেড়ে দিয়ে সোহিনী পশ্চিমে তার মায়ের ঘরে চলে যাবে, রাতটা কাটাবে মার সজাগ রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে। তেমন একটা ভঙ্গি বোধহয় মর্যাদায় বাধে যখন উত্তরেই একটা বাড়তি ঘর আছে

আর সেখানে যখন আছে সব সরঞ্জাম। তাড়াতাড়িতে ও-ঘরটা প্রস্তুত করা যায়নি বলেই দুপুরের বিশ্রামের ব্যবস্থাটা সোহিনীর ঘরেই হয়েছিল—সেটা সাময়িক—কিন্তু রাতের বিস্তৃত শান্তির জন্যে একটি নিজস্ব নির্জনতা দরকার, তাই এই কেতাদুরস্ত আয়োজন। সত্যি, মেয়ের ঘর সে নেবে কেন ঘুমের জন্যে, মেয়ের পবিত্র সুস্মিত ঘর! তার জন্যে একটা অব্যবহৃত আনকোরা ঘরই সমীচীন।

কিন্তু মনে রেখো, সেটাও পাশের ঘর। যে বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছ তারই তলদেশে গুহা। ঘুরে-ফিরে হাওয়ার চলাচল দেখতে গিয়ে দরজার কব্জা কব্জাও দেখে এসেছে সুপ্রভাত, কোন দরজা কোন দিক থেকে খোলে! আর অপরপক্ষে আত্মরক্ষারই বা কি সুযোগ! উত্তরের দরজার খিল সুপ্রভাতের ঘর থেকে খুলবে আর পশ্চিমের দরজার খিল সোহিনীর ঘর থেকে। বিপরীত দিকে দুটোরই রয়েছে খাড়া ছিটকিনি। তুমি খিল খুললে কি হবে, আমার দিক থেকে ছিটকিনির বাধা।

কিন্তু মধ্যরাত্রিতে যখন ঘুম নামে এবং ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর নামে তখন মাঝে মাঝে রক্ষী-আরক্ষী প্রহরীরাও নিদ্রায় শিথিল হয় আর দরজার অন্য দিকের খাড়া ছিটকিনিও টুক করে নেমে পড়ে [illegible]জের থেকে।

প্রথম ইনিংসটা দে[illegible]বার, এই ভেবেছিল [illegible], এইখানেই বোধহয় প্রথম ইনিংস শেষ। এখন [illegible]ক সে বাড়তি, [illegible]বেধ। এখন থেকে সে বেসুরো, সে বেরঙা। তাই সে হঠাৎ চঞ্চল হ[illegible]ল, 'এবার তবে আমি যাই।'

'এখুনি?' সোহিনীও যেন আর আগ্রহের জোর পাচ্ছে না।

'এবার প্লেন এয়ার-পকেটের মধ্যে গিয়ে পড়ছে, তাই আগে থেকেই নেমে যাই—'

সোহিনী তার পিঠে চড় কষলো, তার আগেই সে পিঠ সরিয়ে নিয়ে ছুট দিয়েছে।

নীলাদ্রিও চলে যাচ্ছিল. শৈলবালা ডাকলেন। বললেন, 'দুটো মুরগি আনতে পারবে?'

'সোহিনীর অতিথির জন্যে?' এতটুকু বিচলিত হল না নীলাদ্রি : 'এনে দিচ্ছি।' ত্বরিতে চলে গেল সাইকেলে।

হঠাৎ দুজনে দুঃসহ ফাঁকা হয়ে গেল। নিরাবরণ স্তব্ধতায় ঢাকা পড়ল দুজনে। যেন কেউ কাউকে চেনে না, দেখেওনি কোনোদিন। যেন হঠাৎ ডাক দিয়েছে সাইরেন আর দুজন লোক আশ্রয়ের আশায় দুদিক থেকে একসঙ্গে স্লিট-ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল আর মুহূর্তে কঠিন অপরিচয়ের অন্ধকার জ্বলে উঠল সোনা হয়ে। কত সহজেই অনড় অন্ধকারকে সবলে সরিয়ে দেওয়া যায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুপ্রভাত। 'হেরি হেরি না পুরল আশা।' এ যেন 'আঁখি পালটিতে নহে পরতীত।'

বললে, 'এবার আমি জয়ী। উঃ, তোমার বন্ধুটা কি নির্দয়!'

'কে, পরমা?' সোহিনী ভাবল আবার তার দিকে নজর কেন?

'সর্বক্ষণ তোমাকে গ্রাস করে আছে। দয়ামায়া তো নেই, বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই।'

'ওর দোষ কি। আমিই ওকে আটকে রেখেছি।'

'কিন্তু ভবিষ্যৎকে তুমি আটকাতে পারবে? পারবে এই রাতকে? গুহা থেকে বেরিয়ে আসা শ্বাপদ রাত?'

'আস্তে—' গলাটা ঝাপসা করল সোহিনী।

'আমি জয়ী।' বারেবারে বলতে ভালো লাগছে সুপ্রভাতের : 'আর তুমি আমাকে কি করে ফেরাতে পারো?'

'এখনও খেলার এক রাউন্ড বাকি আছে।'

'কিছু বাকি নেই। প্রথমে বললে, পড়া শেষ করো। করলুম। বললে, শুধু পাস করলেই চলবে না। উচ্চ চূড়ায় জ্বলতে হবে। তাই হলুম, নিলুম ফার্স্ট ক্লাস। বললে, চাকরি যোগাড় করো, করলুম, বেশ মোটা-সোটা থাকিয়ে চাকরি। সব বাধা সরালুম একে একে। বাংলার সুসন্তান এর বেশি আর কি করতে পারে?'

'এখনো এক বাধা বাকি।'

'সে তো শুধু একটা রুটিন অনুষ্ঠানের। তোমার বাবাকে বলো না দিনক্ষণ যত শিগগির সম্ভব নিয়ে আসুন এগিয়ে—'

'সে তো হবেই। কিন্তু আরো একটা গিঁট আছে—'

'সে আবার কি?'

'একটা বাড়ি, অন্তত ফ্ল্যাট।'

শৈলবালা কান ঠিক খাড়া করে রেখেছেন। বারান্দা থেকে এলেন বেরিয়ে : 'কেন, নিজের বাড়ি কি হল?'

উৎসাহিত সুরেই বললে সুপ্রভাত, 'সে তো আছেই। তবে সেটায় বড় হাবজাগোবজা ভিড়, যাকে বলে হচ্‌পচ্‌। সেখানে পোষাবে না আমাদের। সব সময়েই হৈ-চৈ, হার্লি-বার্লি। সীমা-সরহদ্দ নেই, নেই মনের মতন গা হাত পা মেলা স্বাধীনতা। হ্যাঁ, বাড়ি একটা নেবই নিশ্চয়।'

বাড়ির এখন অভাব নেই কলকাতায়। খবর একটা পেয়েছি পার্ক

সার্কাসের দিকে, তোমার ইস্কুলের কাছে। এখন কোথায় দীনেন্দ্র স্ট্রিট আর তখন একেবারে ঝাউতলা। চলো, একদিন গিয়ে দেখে আসি দুজনে।

'দাদাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না নাকি?' শৈলবালা বুঝি ভাবিত হলেন।

'না না, তেমন কিছু নয়।' আশ্বস্ত করল সুপ্রভাত : 'বিষয় থাকলেই শরিক আর শরিক থাকলেই ঠোকাঠুকি। বরং আলাদা হয়ে থাকলেই দাদারা আশীর্বাদ করবেন, তাঁদের একখানা ঘর বাড়বে।'

'সবই তাদের ঘর নাকি?' শৈলবালা যেন ফোঁস করলেন ওপার থেকে।

'আহা, আমার স্বত্ব মারে কে, ভাগ-বাঁটোয়ারার স্বত্ব, বিক্রি-বিলির স্বত্ব। কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে ও বাড়িতে থাকা মানে হাটের বারোয়ারি আটচালায় বাস করা--'

'তাছাড়া,' সোহিনী বললে 'ও-বাড়িতে থেকে আমার চাকরি করা পোষাবে না। স্বাধীনতার জন্যেই যখন বিয়ে-' ঘাড় ছোট করে ছোট খুকির মত লজ্জার ভঙ্গি করল সোহিনী।

শৈলবালা সরে গেলেন।

'তবে দেখতে পাচ্ছ বাড়িও তৈরি।' দর্পিত দুটো পা ফেলে সুপ্রভাত এগিয়ে এল সোহিনীর দিকে 'তবে এবার ফেরাও মোরে নয়, এবার কেমনে ফেরাবে মোরে?'

তন্ময় চোখে তাকাল সোহিনী। বললে, 'সাধ্য কি তোমাকে ফেরাই? তুমি কোথাও এতটুকু ঠেকলে না। যা বললাম সব সংগ্রহ করে আনলে। বনের থেকে কস্তুরী, সমুদ্রের থেকে মুক্তো—'

'এবার তবে আকাশ থেকে চাঁদ নিয়ে আসতে দাও। মেঘশূন্য আকাশের কলঙ্কশূন্য চাঁদ। কি, তুমি আমার বউ না?'

কথার এক মুঠো ফাগ মুখের উপর ভেঙে পড়ল। আনন্দে ঝলমল করে উঠল সোহিনী। চোখের পাতা নাচতে লাগল। বললে, 'এখনো তার একটু দেরি আছে।'

'এখনো দেরি?'

'আগে সাতপাক ঘুরি, সিঁথেয় সিঁদুর পরি-'

'উঃ, প্লিজ, তুমি আর সেকেলে থেকো না। একটু দয়া করো। অনুরাগের কাছে কিসের আইন, কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?'

'কিন্তু অনুরাগের কাছেই শ্রী, সংযম, ত্যাগ—'

'জানি জানি তুমি ইস্কুল মিসট্রেস, তুমি শিক্ষিকা—শত ধুলেও রশুনের বাটিতে গন্ধ লেগে থাকবেই—'

'আমি ছাত্রী, আমি তোমার শিষ্যা। দয়া তো তুমি আমাকেই করবে। দখলাই বড় নয় বড় কথা স্বত্ব।'

'আমার স্বত্ব কি হয়নি?'

'নিশ্চয়ই হয়েছে, তাকে এবার সত্য হয়ে উঠতে দাও। আর দুটো দিন, দুটো দিন শুধু—এত অপেক্ষা করতে পারলে—ভালোবাসাই তো পারে অপেক্ষা করতে—'

বৈকালিক জলখাবারে আহ্বান করলেন শৈলবালা। কি পাইনি তার হিসেব মিলিয়ে কি দরকার, যা পেয়েছি তাইতেই হাত ডোবাই। আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল সুপ্রভাত।

মুরগি নিয়ে নীলাদ্রি হাজির। একেবারে কেটে ছাড়িয়ে এনেছে। মহা খুশি শৈলবালা। ইচ্ছে হল নীলাদ্রিকেও নিমন্ত্রণ করেন। জিগগেস করি সোহিনীকে। সোহিনী বারণ করলে।

যাবার আগে নীলাদ্রি ডাকল সোহিনীকে। কাছে এসে দাঁড়াল। জিগগেস করল, 'আমি কি শেষরাত্রে আসব? ফার্স্ট ট্রেনের আগে?'

এক মুহূর্তে ভাবনার রাজ্যের আকাশ-পাতাল ঘুরে এল সোহিনী। কি বলবে ভেবে পেল না।

'যদি তুমি বলো, যদি কোনো দরকার হয়—'

কি ভেবে হঠাৎ বলে ফেলল সোহিনী, 'এস—তোমার কষ্ট হবে, তবু তুমি এস—'

'আমার কোনো কষ্ট নেই—' বাইকে করে চলে গেল নীলাদ্রি।

গা ধুয়ে একটু ফিটফাট হয়ে নিল সোহিনী। যেন ফোটা ফুলের উপর নতুন বৃষ্টির কটা ফোঁটা পড়ল। বললে, 'চলো, নদীর ধারটায় ঘুরে আসি।'

যদি পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকত পুরোনো হয়ে যেত। যে নিশ্চল সেই শেষে উপেক্ষায় স্তূপীভূত। যে চলে সেই ডাকে। নদীর নাম শুনে মনও তাই চলি-চলি করে ওঠে। সাত সামনে থাকলেও তার রহস্য ফুরোয় না কোনোদিন। যার রহস্য ফুরোয়, সম্ভাবনা ফুরোয় সেই মরে থাকে।

'চলো।'

বেরুল দুজনে। নদীর ধার ধরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু কোথায় কি রাষ্ট্র হয়েছে, হাওয়ার আগে কথা ছোটে, কৌতূহলী মেয়ে-পুরুষ ছিটকে-ছিটকে আসছে এদিক-ওদিক। তারা যেন মহিমান্বিতকে দেখছে না, অভিনবকে দেখছে। দৃষ্টিতে জয়ীর জন্যে সংবর্ধনা নেই, যেন অদ্ভুতের

জন্যে অদৃশ্য কৌতুক। যেন রঙ্গমঞ্চকে দেখছে না, দড়িবাঁধা চোরকে দেখছে।

ঘরে-বাইরে কোথাও স্থান নেই, স্থৈর্য নেই।

'চলো ফিরে যাই।' সোহিনী বলল।

'এখন ফিরে গিয়ে কি করবে?'

'মশার পিনপিন শুনব আর খাতা দেখব।' হাসল সোহিনী।

'খাতা?'

'আমার ঘরে তাকের উপর একরাশ খাতা দেখনি? পরীক্ষার খাতা। ওগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কিছুতেই এর থেকে ত্রাণ নেই। যতদিন মাস্টারি ততদিনই খাতা।'

'তার মানে যতদিন জাঁতা ততদিনই ভাতা।' সুপ্রভাত ফোড়ন দিল।

'হ্যাঁ, খাতাতেই শয়ন পাতা। আর কি সব লেখে মেয়েগুলো। 'দম্পতি' মানে লিখেছে কি জানো?'

'কি?'

'দম্পতি মানে যে পতির দম আছে।'

হো-হো-হো করে হেসে উঠল সুপ্রভাত। বললে, 'তাহলে 'জম্পতি' মানে যে পতি লাফাতে, জম্প করতে ওস্তাদ। চলো তোমার সঙ্গে কাগজ দেখি গে।'

বাড়ি ফিরে এল দুজনে। কি করে রাতের খাবার আগেকার সময়টুকু কেটে গেল কে বলবে! মফস্বলের রাত অল্পেই নিঝুম হয়ে এল, গাছে-গাছালিতে মাঠে-নদীতে থমথম করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে প্রস্থান করল। খিল পড়ল চার ঘরের।

আলো নেবাবার আগে ঘরের চারদিকে আরেকবার তাকাল সুপ্রভাত। নতুন খাটে পরিপাটি প্রশস্ত বিছানা, টেবিলে ঢাকা-দেওয়া খাবার জল, শিয়রে ছোট টর্চ, মশারি ফেলা। টেবলফ্যানটাও এঘরে এসেছে, ঘুরছে সশব্দে। যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন নিখুঁত কিন্তু শিব অনুপস্থিত। এ যেন দেনমার্কের যুবরাজ ছাড়াই হ্যামলেট। সভাপতি ছাড়াই সভা। বেশ শব্দ করে জানান দিয়েই খিল দিল সুপ্রভাত। আলো নিবিয়ে ঢুকল মশারির নিচে, শুয়ে পড়ল। পদ্মনাভকে স্মরণ করল, যেন ঘুম আসে।

ওপারে নিজের ঘর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল সোহিনী। শব্দ করে, জানান দিয়ে। দেবার আগে ঠেলে দেখল দরজা সত্যিই বন্ধ কিনা ওদিকে।

পশ্চিমের দরজা খুলে শৈলবালা এলেন সোহিনীর কাছে। বললেন, 'আমার দিকের দরজাটা খোলা থাক।'

যেন ওটা সোহিনীর পালানোর রাস্তা আত্মরক্ষার রাস্তা এমনি শোনাল কথাটা। যেন সম্ভাব্য কোনো ডাকাতির বিরুদ্ধে তোড়জোড়। খাতা থেকে মুখ তুলে সোহিনী বললে, 'শুধু ভেজিয়ে রাখো।'

শৈলবালা চলে গেলেন নিজের ঘরে।

আরো কতক্ষণ নম্বরের যোগ দিতে গিয়ে ভুল করে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল সোহিনী। ছি ছি, আলো জ্বালিয়েই শুয়ে পড়েছে। আলোই কি রক্ষাকর্তা? যখন অন্ধকার আসে তখন সমস্ত আলোকে পর্যুদস্ত করেই আসে। না, অন্ধকারকে কি ভয়? আলো নিবিয়ে দিল সোহিনী। অবগাহন স্নানের মতই অন্ধকার।

কিন্তু ঘুম কি আসে? না আসুক। অঘুমে মেশা এই অন্ধকারই বা কি আশ্চর্য! অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকা। মনে পড়তে লাগল আসানসোলের অদূরে সেই কয়লাখাদের কথা। সেই সেবার দিদির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে খাদে নেমেছিল তারা, সুপ্রভাতও ছিল যেমন থাকবার। ধরিত্রীর ত্বক-মাংসের নিচে কোথায় কোন প্রচ্ছন্ন শিরা বেরিয়েছে তারই থেকে কালোরক্ত শুষে নাও নিঃশেষে। খাঁচায় করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে নামা, কত অতল গভীরে তা কে জানে! ভীষণ ভয় করছিল সোহিনীর। চোখ চেয়ে তাকিয়ে হাত বাড়িয়েও যেন ধরবার-ছোঁবার কিছু নেই চারদিকে। নামছে তো নামছেই, কোন অন্ধ অধঃপতনের আনন্দে। না, শেষ পর্যন্ত থামল খাঁচাটা, যেখানটায় থামল সেটা একটা চাতালের মত, দেয়াল কয়লা, মেঝে কয়লা, সিলিং কয়লা। সবচেয়ে শান্তি, ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে আর যাতে তার জেল্লা বাড়ে, তাই পাশে-উপরে চুনকাম করা হয়েছে। বেশ ঘর-ঘর মনে হচ্ছে এখন, মনে হচ্ছে না মহীরাবণের বাড়িতে এসেছি। দেয়াল চিরে চিরে লম্বা লম্বা কালো সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে এক-টানা, কাটা কয়লার সরু সরু পথ, কতদূরে কে জানে লণ্ঠনের মিটিমিটি আলোতে কাজ করছে মালকাটারা। চলো দেখবে চলো, বুকের মধ্যে সেই সব কালো পথ যেন আঁকুপাঁকু করে ওঠে। চলো আরো দূরে আরো গভীরে আরো অন্ধকারে। হয়তো যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সেখানে এক ছিটে লণ্ঠনের আলো নেই, নেই একটাও বা নিশ্বাসের রেখা—তবু চলো। না, লোক আছে, আলো আছে, আশা আছে—ট্র্যামে বোঝাই করে স্তূপ স্তূপ কয়লা আসছে কাজের মুখ থেকে। আছে শক্তি ও স্বাস্থ্যের উত্তাপ, নতুন নির্মাণের দুঃসাহস।

হঠাৎ সোহিনীর হাত ধরে আকর্ষণ করল সুপ্রভাত। সরীসৃপ পথের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, 'যাবে ঐ পথ দিয়ে খানিকটা?'

'মরে যাব।' এমনি ভয় পেয়েছিল সোহিনী।

'মৃত্যুকে এত ভয়?'

'মৃত্যুকে তত নয় যত বা তোমাকে।' হাসবার চেষ্টায় নির্ভয় হতে চেয়েছিল সোহিনী।

'কিন্তু মৃত্যু একেবারে বুকের কাছে এসে পড়লে আর ভয় নেই।'

'না, তখন আর নেই। তখন তার আলিঙ্গনে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ।' আলো-করা জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে বলতে পারল সোহিনী।

'মৃত্যু ধৈর্যের অপেক্ষা রাখে না- বলা নেই কওয়া নেই সমারোহে সামনে এসে দাঁড়ায়—'

বলতে বলতেই কি কারসাজিতে কে জানে, ইলেকট্রিক অফ হয়ে গেল। সেই ছোট আশ্রয়ের দ্বিধাটুকুও ভরে গেল ভেসে গেল অন্ধকারে। খাঁচার ঘণ্টা বন্ধ হল, বন্ধ হল ট্র্যামের ঝকঝক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দল আর্তনাদ করে উঠল। বয়স্করাও হৈ-চৈ শুরু কবলেন।

সোহিনীর মনে হল, মৃত্যুই বুঝি এসেছে বাহু মেলে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে তাকে অন্ধকারে। কিন্তু যদি ধরতেই না পারে কে করে সমর্পণ! শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই চেষ্টা করে এড়াতে।

কি আশ্চর্য শুযে শুয়ে ভাবছে সুপ্রভাত, কত কাছেই ছিল সেদিন সোহিনী, প্রায বাহু ঘেঁষে, বুড়ো আঙুলের নিচে, কিন্তু যেই অন্ধকার হয়ে গেল, পিচঢালা অন্ধকার, সতর্ক দ্রুততায় ঠিক দূরে সরে গেল পিছলে। যেন বহুদিনেব মহড়া দেওয়া রঙ্গমঞ্চেব দৃশ্য। ব্যাকুল হাত বাড়িয়েও যা ধবতে পেল সুপ্রভাত তা একতাল কয়লা, একতাল সোহিনী নয়। কি দুঃসহ সে নৈরাশ্য! যে মেয়ে মরতে বসেও মরে না, তার না জানি কিসের স্নায়ু। যেন মৃত্যুর চেয়েও আকাঙ্ক্ষাই ভয়ের। মৃত্যু কলুষিত কবে না, আকাঙ্ক্ষাই কলুষিত করে। প্রায় অপমানের মতই মনে হয়েছিল সুপ্রভাতের। কিন্তু আর একটা নতুন সঙ্কল্পে দৃঢ়তর হবার আগেই টুক করে আলো জ্বলে উঠল। প্রসন্নতায় ঝলমল করে উঠল চারদিক। সুপ্রভাত দেখল, সোহিনী কাছেই দাঁড়িয়ে। হাসছে মুখ টিপে টিপে।

একটা থামা বাস্ ধরবার জন্যে ছুটেছিল একটা লোক। বাসের কাছে পৌঁছবার আগেই বাস্ ছেড়ে দিল। তাকে পিছু পিছু খানিক ছুটতে দেখলে থামবে তারই আশায় লোকটাও ছুটল। থামো থামো হয়েও বাস্টা থামল না। সেই না-থামা বাসের পিছে ছুটন্ত লোকটার মতই নিজেকে

বোকা বোকা লাগল সুপ্রভাতের। যেন অপ্রত্যক্ষ কোনো আরোহীর প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের শর বি'ধল তার চামড়ায়।

হ্যাঁ, সমস্ত উদ্যোগ-প্রয়োগ তাকেই করতে হবে। সবই যদি বিধিবদ্ধ হয়, রুলটানা হয়, কপাট-চৌকাঠের নকশা মানা হয়, তাহলে আর জীবনের স্বাদ থাকে না। আর কেনই বা সব সময়েই এই হিসেবের কাছে নিয়মের কাছে কাঙালপনা। দুর্গমের দুর্গ জয় করব এই তো জীবনের ডাক। উন্মেষের জন্যে উন্মোচনের জন্যেই তো যত কান্না সংসারে, আর তারই বিরুদ্ধে যত বাধা যত নিষেধের জারিজুরি।

সুপ্রভাত উঠে পড়ল। যা অবধারিত, নিরূপিত, সে কেন মান পাবে না? নিঃশব্দে নিজের দিক থেকে খিল খুলল। টানল দরজা। অবধারিতই দাঁড়িয়ে আছে ওপারে। ওপার থেকে ছিটকিনি তোলা।

আবার ধীরে ধীরে ঢুকল মশারির নিচে। গুহার মধ্যে পরাস্ত পশুর মত।

মাঝে মাঝে তন্দ্রাভরা তপ্ত একটা ঘোর আসে নীড়ে-বসা পাখির মত ঘন হয়ে, আবার কখন তা শূন্যে চলে যায় পাখা ঝাপটে। কিছুতেই একটানা গা-ঢালা ঘুম আসছে না সোহিনীর। একবার নদীর দিকের জানলা খুলে বসে রইল অনেকক্ষণ। নদী নয় তো চিরন্তনকালের একটি সহজ জিজ্ঞাসা। সহজ প্রশ্নই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু সহজ উত্তর তার চেয়েও দুরূহ। কি রাক্ষস গরম, ঘাসের একটি ডগাও নড়ছে না। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে আবার শুয়ে পড়ল সোহিনী।

কি হয় ছিটকিনি খুলে দিলে? যে আসবে সে তো তার সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে যার কাছে সে বেশি প্রতিশ্রুত। যে নির্ধারিত তার প্রতি কেন এই অবিশ্বাস? এই পরম উৎসব-রাত্রির লগ্ন কি আর আসবে? যা একদিন আসবে তা আপোসের জিনিস, বৈধতায় নিশ্চিন্ত, বৈধতায় বিস্বাদ। তাতে কি থাকবে এই উজ্জ্বল প্রসঙ্গ? উপন্যাসের মাঝখানের একটা পরিচ্ছেদ হয়ে লাভ কি, একটা ছোটগল্পের শেষ হওয়া ঢের ভালো।

এতদূর পর্যন্ত এসে কেউ কি ফিরিয়ে দেয় এ-রাত্রি?

কে সে অনিদ্র, সোহিনীকে আবার টানে, চুপ করে শুয়ে থাকতে দেয় না। সোহিনী আবার এক ঝটকায় উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। পরে গুটি গুটি এগুলো উত্তরের দরজার দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে। এতটুকুও ভুল হল না। নিঃশব্দে এপারের ছিটকিনিটা নামিয়ে দিল।

আবার এসে শুলে তার বিছানায়। বর্ষার আশায় খেত-মাঠ যেমন চুপ করে থাকে, তেমনি চোখ বুজে রইল।

আহা, কত শান্ত আর নিষ্পাপ সোহিনী, কত ছন্দোবদ্ধ। ঘুম-মাখা চেতনার মধ্যে থেকে ভাবছে সুপ্রভাত। আহা, ওকে ব্যস্ত করে লাভ কি, ওকে ছিন্ন করে সুখ কার। ও তো তার হবেই, তার আছেই। ও যে ছিটকিনিটা তুলে রেখেছে তা ভয়ে নয় প্রত্যাখ্যানে নয়, শ্রদ্ধায়, স্বীকৃতিতে। শ্রীকে মানা শৃঙ্খলাকে মানা সুষমাকে মানাই তো সত্যিকার ভালোবাসা। আহা, শ্রান্ত পাখি. ও ঘুমোক। ওর দেহমন তার নির্ভয় নীড় হোক।

কত উদার, প্রশস্তবুদ্ধি এই সুপ্রভাত। মোছা মোছা চেতনার মধ্যে থেকে ভাবছে সোহিনী। খিল খুলে একবারও পরখ করে দেখছে না সত্যি কোথাও প্রতিরোধ আছে কিনা। অন্তত একটা শব্দ করেও জানান দিচ্ছে না, আমি জেগেছি আমি জেনেছি। কত মার্জিত সম্ভ্রান্ত। সমস্ত শূন্যকে মন্থন করে আসছে না তুফান হয়ে। তাকে অনায়াসের মৃত্তিকা করতে চায়নি। তার সহিষ্ণুতাকে চায়নি লজ্জা দিতে। তাকে রেখে দিয়েছে স্থিরসুন্দর প্রতিমার মহিমায়। বলেবুদ্ধিতে কত সমর্থ আহা, ওর ঘুম প্রগাঢ় হোক।

গফুরালি ঠিক সময়ে, ঠিক সময়ের আগেই এসে হাজির। এসে দেখে কে একজন লোক সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সদরের কাছে।

জিগগেস করল গফুরালি, 'বাবু ওঠেনি?'

'তুমি হর্ন দাও না। আমার বেলের চেয়ে তোমার হর্নের বেশি জোর।'

হর্ন দিতে লাগল গফুর। ডাকতে লাগল, 'বাবু, আমি এসেছি।'

এক লাফে উঠে পড়ল সুপ্রভাত। এ কি, সোহিনীকে ডাকতে হয়, সবাইকে ডাকতে হয়। এখনো ওঠেনি দেখছি কেউ। কি বিপদ, দরজার খিলটা তখন আর লাগায়নি বুঝি। ভেজানো দরজার পাল্লা ধরে টান দেবার আগেই হাঁক পড়ল · 'ও সোহিনী ওঠ, ছিটকিনিটা খুলে দাও। রিকশা ঠিক এসে গেছে।'

দেরি হচ্ছে দেখে নিজেই টানতে গেল দরজা এ কি, দরজার ছিটকিনি নেই।

সোহিনীর ঘরে ঢুকে দেখল সোহিনী ছোট্টটি হয়ে শিশুর মত ঘুমুচ্ছে। সুপ্রভাতের ইচ্ছে হল দু হাতের পর্যাপ্ত স্পর্শে ওকে জাগিয়ে দিই। কিন্তু তার আগে শৈলবালা ঢুকে পড়েছেন, ডাকছেন, 'ওঠ ওঠ সোহিনী, সুপ্রভাতের যাবার সময় হল।'

এক ঝটকায় উঠে পড়ল সোহিনী। আলো জ্বালাল। ঘরের সব

জানলা-দরজা খুলে দিল ঝটপট। শেষরাত্রের পরিচ্ছন্ন হাওয়াকে স্পর্শ করল সর্বাঙ্গে।

চোখে-মুখে জল দিতে দিতে সোহিনী বললে, 'যাব, সি-অফ করতে যাব।' হঠাৎ নজর পড়ল ভালো করে : 'নীলুদা, নীলুদাও এসে গিয়েছ দেখছি।'

উপায় নেই, রিকশাতেই বসতে হল দুজনকে। আর নীলাদ্রির যে সাইকেল সে সাইকেল।

বিশুদ্ধ ব্যবধান রেখে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নীলাদ্রি। রাস্তাঘাট নির্জন, কচিৎ এক-আধটা দোকানের একপাট দরজা খুলেছে। আকাশের গায়ে গায়ে এখনও অন্ধকারের লাবণ্য।

সোহিনীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সুপ্রভাত। যেমন আকাশের একটি তারা মাটির একটি ফুল, তেমনি এই স্পর্শ, এই স্পর্শের আকর্ষণ। সুপ্রভাত বললে, 'তুমি কি ভালো!'

ভোরের শিশিরের মতন চোখে সোহিনী বললে, 'তুমি আমার চেয়েও।'

স্টেশনের থেকে বেশি দূরে নয়, রিকশার সামনের চাকা পাঙ্কচার্ড হয়ে গেল।

এখন উপায়? নেমে পড়ল দুজনে। যা দু-একটা রিকশা আছে রাস্তায় সব সোয়ারীর কেরায়া। বাকি পথটুকু না হয় হেঁটেই গেলাম, কিন্তু কুলি পাই কোথায়? সুটকেসটা বয় কে?

রাস্তার ধারে আধ-খোলা একটা দোকানে সাইকেলটা গুঁজে দিয়ে নীলাদ্রি বললে, 'দিন আমাকে। এ আর ভারি কি!'

হাতে করে স্টেশনে বয়ে নিল নীলাদ্রি। সুপ্রভাত তাকে লক্ষ্য করে বললে, 'টিকিটটা কাটব কোথায়?'

'দিন আমাকে--' নীলাদ্রি হাত বাড়িয়ে টাকা নিল।

আজেবাজে ক্লাস নয়, সেকেন্ড ক্লাস, মনে করিয়ে দিল সুপ্রভাত। নীলাদ্রি এগিয়ে চলল টিকিটঘরের দিকে।

সহসা সোহিনী তার পিছু নিল। সুপ্রভাতকে বলে গেল, 'ভুল করে আবার দুখানা টিকিট না করে বসে। আমি যে পরে যাব এ জানে কিনা—'

একটু দ্রুত পা চালিয়েই টিকিট-ঘরের কাছে নীলাদ্রিকে ধরল সোহিনী। চাপা ধমকের সুরে বললে, 'তুমি কি মাল বইতে টিকিট করতে এসেছ নাকি?'

থমকে দাঁড়াল নীলাদ্রি। বললে, 'তুমি কি এতে খুশি হচ্ছ না?'

'না, কখনো না।' দাঁতে দাঁত চেপে সোহিনী বললে, 'তুমি আর কারু কুলি নও চাকর নও।'

কথাটা বলেই আবার স্বস্থানে সুপ্রভাতের কাছে ফিরে এল। বললে, 'বারণ করে দিয়ে এলাম।'

'যা টাকা দিয়েছি তাতে দুখানা টিকিট বোধহয় হয় না।'

'কে জানে কমতিটা হয়তো নিজের থেকেই পুরে দিত।' সোহিনী বুঝতে পারছে কথাটা জুতসই হচ্ছে না, তবু না বললে নয়, বলতেই হবে।

টিকিট নিয়ে এল নীলাদ্রি। ছাড়ো-ছাড়ো ট্রেন প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে। এবার উঠে পড়লেই হয়।

কামরাটা আগাপাশতলা বন্ধ। সুপ্রভাত তাকাল নীলাদ্রির দিকে: 'একটু উঠে জানলা-টানলাগুলো খুলে দিলে হত।'

এ কি নীলাদ্রির কাজ? সে মুখ ফিরিয়ে রইল। কাশ্মীরের পোস্টার দেখতে লাগল দেয়ালে।

সুপ্রভাত নিজেই উঠল। নিজেই জানলাগুলো খুলল পর পর। পাখা চালু আছে কিনা দেখল। দেখল বাথরুমের চেহারা।

একটা ঝাড়ুদার ডাকলে হত। কাকে বলি?

'তোমাব নীলুদা গেল কোথায়?'

'কে জানে কোথায়?' শূন্য চোখে দূরের দিকে তাকাল সোহিনী।

'আচ্ছা, কে এই নীলুদা?' প্রতিদ্বন্দ্বীর কোটের মধ্যে আনতে গেলে সে যে কড়ে আঙুলেরও সমান নয় এ তার চেহারা-চরিত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা আস্তানাহীন স্বদেশী-স্বদেশী চেহারা। কিন্তু চেহারা-চরিত্রই তো সব নয়, কার মনের জড় কোথায় গিয়ে জট পাকায় কে বলবে! তাই একটু নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া মন্দ কি।

'নীলুদা? ও আমাদের পাড়ার ছেলে। ছেলেবুড়ো সকলের নীলুদা।' বলার সুরটাকে শেষ পর্যন্ত ফিকে করে দিল সোহিনী।

পরমাও অমনিধারাই বলেছিল যখন সোহিনীর অসাক্ষাতে তাকে জিগগেস করেছিল সুপ্রভাত। বলেছিল, সরকারি দাদা।

বেসরকারি যদি কিছু থাকেও তাড়িয়ে দাও। কাটা দাগের উপর তোলা-পাঠে আমার নাম লিখবে তা চলবে না। পৃষ্ঠা ওলটাও, স্লেটটাকে নিদাগ করে ফের শুরু করো। জীবন মানেই পৃষ্ঠা ওলটানো।

'কি করে?'

'ছোটখাটো কি একটা কেরানির কাজ করে—' যেন উল্লেখ করবার মত কিছু নয় এমনি সোহিনীর ভাব।

'কলকাতায় ?'

'না, না, কাঁচড়াপাড়ায়—' রাজধানীর উপযুক্ত নয়, সুতরাং আরো যেন উপেক্ষার যোগ্য, সোহিনীর সেই ভঙ্গি।

'গ্র্যাজুয়েট ?'

সোহিনীর ঠোঁটে অনুকম্পা : 'আই-এ, থার্ড ডিভিসন। অই তো ভালো স্কেলটা পেল না শুনছি।'

'অবস্থা ?'

এবার ঘৃণায় নাক কুঁচকোল সোহিনী : 'হতশ্রদ্ধ গরিব—ঘাড়ে আবার এক দঙ্গল আইবুড়ো বোন—'

এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না জিগগেস করলেও চলত। উচ্ছ্বসিত হয়ে সোহিনীর দিকে হাত বাড়াল সুপ্রভাত : 'তুমি উঠে এস না।'

'বেশি দেরি নেই ট্রেন ছাড়বার।'

'তা হোক, লক্ষ্মীটি, তুমি এস।'

'তুমিও তো নামতে পারো—' অকুণ্ঠিত হাত বাড়াল সোহিনী।

'খিল-ছিটকিনি দুই-ই খোলা, তাই না ?' হো হো হো করে হেসে উঠল সুপ্রভাত : 'চলো না এইভাবে, যেমনটি আছ, উঠে পড়ো না হাত ধরে। বেশ একটা পালানো-পালানো ভাব হয় তাহলে। লোকে বলবে, সি-অফ করতে এসে চলে গিয়েছে। ট্রেন বেছে টাইম টেবল দেখে টিকিট কেটে যাবার মধ্যে বাহাদুরি কি!'

'তার চেয়ে তুমিই নেমে এস না। লোকে বলবে চাকরি না নিয়ে বাবু বউ আনতে গিয়েছেন—'

দুটো করে দুবার ঘণ্টা দিল। খানিকটা পিছনে গিয়ে একটা হেঁচকা টান মেরে ট্রেনটা চলতে লাগল সামনে।

প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হতেই নীলাদ্রিকে দেখা গেল দূরে। এমনিতেই দেখা হত, তবু হাত তুলে ডাকল সোহিনী।

কাছে এসে নীলাদ্রি বললে, 'কি, তুমি গেলে না ?'

'আহা, আমার কি এই ট্রেনে যাবার কথা ?'

'কথা বলে কিছু নেই সংসারে, কাজ, কাজই আসল।' একটু বোধহয় গম্ভীর হল নীলাদ্রি : 'চলে যাওয়াই শেষ কথা।'

'শেষ বলে কিছু নেই।' এক সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললে সোহিনী।

'তাহলে তুমি যাবে না ?'

'আমি পরের ট্রেনটাতে যাব।' বললে সোহিনী।

'সেটা তো সেকেণ্ড ট্রেন—আমার ট্রেন। তোমার তো থার্ড।'

'কথা বলে কিছু নেই কাজই আসল।' নীলাদ্রির কথাই সোহিনী পুনরুক্তি করলে। পরে বললে, 'তোমার ট্রেনে, সেকেন্ড ট্রেনেই যাব, আর তোমার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে? সে তো কাঁচড়াপাড়া—'

'কোনো পাড়া-পল্লীতে নয়, একেবারে লোকালয়ের বাইরে অনেক অনেক দূরে—'

হাসল নীলাদ্রি। চলতে চলতে বললে, 'মানচিত্রে যে জায়গা আঁকা নেই সেই জায়গায়?'

'হ্যাঁ, সেই জায়গায়। তোমার সাইকেলটার দিকে আর ফিরে তাকিও না, ওটাকে কোথাও বনে-জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এস। খালি হাত-পা হও। তারপরে দুই হাতে তুলে নাও আমাকে—'

'এ যে অনেক পুরোনো কথা বলছ।'

'পুরোনোই ফিরে ফিরে আসে নতুন হয়ে।' সোহিনী বললে, 'পুরোনো কথাই আর পুরোনো হয় না। কেন, কেন, তুমি আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারো না, নীলুদা?'

'আমার ক্ষমতা কই?'

'তোমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু কি অসম্ভব আশ্চর্য তোমার ক্ষমতা নীলুদা।' কত তুমি বইতে পারো, শুধু একটা সুটকেস নয়, বিরাট গন্ধমাদনের ভার— কত তুমি সইতে পারো কত দুঃখ কত অপমান -'

নীলাদ্রি হাসল। বললে, 'সে ক্ষমতা তো তোমার।'

'আমার?'

'তোমার ছাড়া আর কার। যে এই ভালোবাসা ডেকে আনতে পারে সেইই তো ভীষণ, সেইই তো মহৎ–'

'নীলুদা চলো না ঐ নিরালায় গিয়ে বসি।' হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্ম ফুরিয়ে দিয়ে বললে সোহিনী, 'ঐ ঘাসের উপর। এখুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না, আর তোমার সেকেন্ড ট্রেনের তো এখনো দেরি আছে।'

লাইনেব ধারে একটা কালভার্টের নিচুতে ঢালা ঘাসের উপরে বসল দুজনে। লোকজন নেই, দূরে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের নিবু-নিবু আলো শেষের শ্বাস গুনছে। অন্ধকার এখনো আকাশের গায়ে লেগে আছে একমেটে হয়ে। সমস্ত শূন্য জুড়ে শুধু পাখিদের বাসা ছাড়বার উদ্যোগ।

'আমি আর ভোর হতে চাওয়া এই রাত্রি।' সোহিনীর স্বরে বুঝি বা ভিজে হাওয়ার আমেজ লাগল: 'আমি আলোই জ্বালতে পারলাম,' ভোর হতে পারলাম না। নীলুদা, আমি কেন এত ভীরু, এত দুর্বল?'

'তার জন্যেই তো তোমার জন্যে এত মায়া—'

বৃষ্টির ফোঁটাও বুঝি বা পড়ো-পড়ো হল। বললে সোহিনী, 'কেন আমি তোমার জন্যে পারলাম না কৃচ্ছ্র সইতে? কেন কলঙ্কের কুলো নিতে পারলাম না মাথায়?'

সোহিনীর হাতের উপর নীলাদ্রি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বললে, 'তোমাকে কি ভিখারিনীর সাজ মানায়? তুমি অমর্তলোকের ধন, তোমাকে কি বাঁধতে পারে দরিদ্রের বস্ত্রাঞ্চল? রাজেন্দ্রাণী হয়ে তুমি বিরাজ করবে সংসারে তোমার দেহে মনে সেই প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। আমি কি তোমার সেই স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারি?'

'কত লোকে তো দেয়, নীলুদা।' নিজের হাত ছেড়ে দেওয়া নয়, নীলাদ্রির হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সোহিনী: 'কেন তুমি তাকে ক্ষমা করবে যে শুধু আরাম চাইল সোয়াস্তি চাইল? যে প্রাণ নিল না শুধু স্থান নিল?'

'তাই তো স্বাস্থ্য।' বললে নীলাদ্রি, 'স্থান না হলে প্রাণ বাঁচে কই?'

'জানো কাল রাত্রে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি দুচোখের পাতা পারিনি এক করতে। ইচ্ছে করছে এই আধোজাগা ভোরের আলোয় এই ঠাণ্ডা ঘাসের উপর তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমুই।' সোহিনী সত্যি গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। সরে বসল নীলাদ্রি। নিজের বাহুকেই উপাধান করল সোহিনী।

'তুমি এমন কেন, নীলুদা? তুমি কেন আমাকে ছেড়ে দেবে? কেন আমাকে জোর করে বেঁধে রাখবে না? কেন আমাকে বিপদে ফেলে বন্দী করবে না খাঁচায়? কেন আমার পালানোর পথ বন্ধ করে দেবে না একেবারে?'

'ছি, এসব তুমি কি বলছ!' সোহিনীর চুলে হাত বুলুতে লাগল নীলাদ্রি।

'লোকে কি আর পড়ে না সেই অবস্থায়?' উদ্বেল হয়ে বলতে লাগল সোহিনী, 'পড়লে সেই ভাবেই অনুপাত খোঁজে। পরিবেশের সঙ্গে মীমাংসা করে। খাঁচায় পোরা বাঘিনী দেখনি? সে-বাঘিনী কি বাঁচে না, না, তার কাটে না দিনরাত? নীলুদা, তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না, জ্বলতে দিও না বিজয়িনীর মত, আমাকে তুমি কালো করে দাও, উপহাসের হাত থেকে তোমার পৌরুষকে ত্রাণ করো। নীলুদা—' দুহাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল সোহিনী।

নীলাদ্রি বললে, 'ওঠ, একটা গান গাই।'

'তুমি কেন এই হেয় এই অধমকে এখনো ভালোবাসবে?'

'ভালোবাসা কি কেউ বাসে? ভালোবাসা আসে।' গলায় সুর আনবার চেষ্টায় ক্ষীণ আওয়াজ তুলল নীলাদ্রি।

'তুমি আমাকে তুচ্ছ আবর্জনার মত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে না, পারবে না দেহে মনে প্রাণে বাক্যে দাবানল ঘৃণা করতে. এ আমি সহ্য করতে পারব না, নীলুদা। আমাকে দয়া করো। দয়া করে ঘৃণা করো আমাকে। যাতে ঘৃণা করতে পারো তাই করো। আমি ছোট, অপদার্থ। তোমার অমর্তলোকের ধন নই. আমি ধুলো আমি ছাই--আমাকে বিন্দুমাত্র মূল্য দিও না, নীলুদা।'

নীলাদ্রির কণ্ঠে সুর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মুখ তুলে চাইল সোহিনী, জলম্লান মুখ। বললে, 'জানতাম তুমি মাটির মানুষ, আসলে তুমি পাষাণ।'

'পাষাণ মাটি ছাড়া আর কি!' বললে নীলাদ্রি, 'ধ্যানের মন্ত্র পেলেই মাটি পাষাণ হয়ে ওঠে। আমি তেমনি ভালোবাসার মন্ত্রে পাষাণ হয়েছি।'

'কিছু নয়।' উঠে বসল সোহিনী, মাথার চুল ঠিক করতে লাগল। বললে, 'এ শুধু তোমার শুকনো ব্রহ্মচর্যের স্পর্ধা।'

'প্রেম বলেই ব্রহ্মচর্য।' স্নেহঢালা প্রগাঢ় স্বরে বললে নীলাদ্রি, 'ব্রহ্মচর্যের চেয়েও প্রেম বড়।' গান ধরল নীলাদ্রি:

> 'ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে
> আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে॥
> চোখের জলে সে যে নবীন রবে
> ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে
> পরব বুকের হারে॥'

গানের পরে আর কথা নেই। মন যেন শান্ত হল, দৃঢ় হল, পবিত্র হল। উঠে পড়ল দুজনে। নীলাদ্রি বললে 'তুমি তো বাড়ি ফিরবে। কাউকে দিয়ে খবর পাঠিও আমার সাইকেলটা যেন এসে নিয়ে যায়। আমি সেকেণ্ড ট্রেনে।'

রিকশা করে হুড়মুড় করে বাড়ি ফিরে এল সোহিনী। সাজ সাজ রব তুলল, চারদিকে বিকীর্ণ করতে লাগল তার অস্তিত্বের অমৃত। কি আনন্দ, কি আনন্দ দোলে মুক্তি দোলে বন্ধ। হাটের ধুলো তার গায়ে লাগেনি, দামধরা আঁটা টিকিটের পিন্ ফোটেনি তার গায়ে, অনাঘ্রাত ফুল হয়েই যেতে পারবে দেবতার অর্চনায়।

শিবনাথ বললেন 'আমি কাল-পরশুই যাব কথা ঠিক করতে।'

'কাল-পরশু কেন? আজই বিকেলের ট্রেনেই যাও না। যত তাড়াতাড়ি হয়। শেষে মনে আনতে না পাত্তা ফুরোয়। আর মা, তুমিও যেও। দেখে-শুনে অর্ডার-ফরমাস সব দিতে হবে দোকানে। অন্তত স্যাকরার দোকানে—শুভস্য শীঘ্রং—'

থার্ড ট্রেনের মেয়ে-কামরাতে উঠেছে সোহিনী।

'এ কি, তুমি গীতালি না?' দরজা ঠেলে কে একটি মেয়ে উঠতে যাচ্ছে কামরায়, সোহিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'ও, তুমি, সোহিনী?'

'তুমি যাচ্ছ নাকি কলকাতায়?'

ঢোক গিলল গীতালি। বললে, 'বলতে পাচ্ছি না। একজনকে খুঁজছি।'

'কাকে?'

'তার এখনো ঠিক নেই।' শুকনো হাসি হেসে নেমে গেল গীতালি।

কি যেন বিপদে পড়েছে! এক কামরায় যেতে চায় না, কেটে পড়তে চায়। এই সেদিন ভালো বিয়ে হলো গীতালির, তার আবার এই ছন্নমতি চেহারা কেন? কে জানে কেন? হয়তো অহঙ্কার। অহঙ্কার তো জাঁকিয়ে বসে, তার কি এমন হারানো-হারানো চেহারা হয়! কি দরকার পরের ঘরে আড়ি পেতে? আমি নিজের রুটি গরম করব।

৩

একটা কুকুরকে শিকল দিয়ে জানলার শিকের সঙ্গে বেঁধে বাখা হয়েছে, কলেজের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সে দৃশ্যটা একদিন দেখেছিল পরমা। আপ্রাণ প্রয়াসে যতদূর শিকলটাকে টানা যায়, তীক্ষ্ন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে আর অবোলা ভাষায় আর্তনাদ করছে। যাকে দেখছে, চেনা বা অচেনা, স্ববাসী কি প্রবাসী, তাকেই লক্ষ্য করে দু পা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সামনের পা দুটো নাড়ছে অবিশ্রান্ত আর অনর্গল কান্নায় মিনতি করছে। ভাষা বোঝার দরকার হয় না, অর্থটা এমন স্পষ্ট। বলছে, খুলে দাও খুলে দাও আমার বাঁধন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছুটতে দাও খুশিমত।

পরমার মনে হয়েছিল যত কষ্ট আছে তার মধ্যে বন্ধনের কষ্টটাই বুঝি সব চেয়ে কঠিন। আর সব কষ্ট হয় শারীরিক নয় মানসিক, আর এ কষ্ট, স্বাধীনতা হারানোর কষ্ট, শারীরিক-মানসিক এক সঙ্গে। প্রথমে অসহায়

করে রাখা তারপর অপমান করা। শুধু দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়, সাপ দিয়ে বাঁধা। কিন্তু মানুষ তো কুকুর নয় যে কাকুতি-মিনতি করবে, মানুষ জোর করে ছিন্ন করবে তার নাগপাশ। দেশও তাই তার মুক্তির আন্দোলনে জোর আনছে, আনছে ভেঙেফেলার তোলপাড়। বুঝছে আপোস রফায় যা পাওয়া যায়, যা পাওয়া যায় তুইয়ে-বুইয়ে, কাটছাট করে, তা নয় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, তা তামাসার নামান্তর। গোলমালে ফাঁকতালে যা পাওয়া যায় তা হাতের জিনিস, প্রাণের জিনিস নয়।

ক্ষুধা খাদ্যের নয়, অমৃতের। দেহের নয়, প্রাণস্পর্শের।

বিধাতা এসে বললেন, পরমা, যা তোমার অভিলাষ বর নাও।

পরমা উল্লসিত হয়ে উঠল· দেবে? তুমি এত কৃপণ, তুমি দেবে হাত ভরে?

বুক ভরে দেব। কিন্তু সাবধান, একটি মাত্র বরের বেশি পারবে না চাইতে। জীবনে যা তোমার শ্রেষ্ঠ অভিলাষ তাই একবার চেয়ে নাও।

জীবনে কি আমার শ্রেষ্ঠ অভিলাষ সেইটি বিবেচনা করবার জন্যে আমার সময়ের দরকার। আমাকে তবে সময় দাও।

তোমার তা হলে সময়ই নেওযা হবে পরমা, পরমরমণীয় সেই বর আর নেওয়া হবে না।

তবে আমি কি করি?

যা তোমাব উপস্থিততম তাই নাও। মুহূর্তের সূক্ষ্মতীক্ষ্ন চূড়ায় যে দুলছে তাকে।

তাকে?

হ্যাঁ, উপস্থিততমই পরিপূর্ণতম।

কিন্তু পরিপূর্ণতমই কি উপস্থিততম?

সেই উত্তর তোমার। ক্ষণখণ্ডের মধ্যেই শাশ্বত আছে কি না এ তোমার আবিষ্কার। বীণা শুধু কাঠ আর তার কিনা, না কি তারই মধ্যে আছে আশ্চর্য গীতধ্বনি, অকিঞ্চিৎকরের মধ্যেই অপরূপ, এ শুধু তুমিই বলতে পাবো।

হ্যাঁ আমিই বলতে পারি, আমিই বলব। আমি নিঃশঙ্ক যেহেতু যে নিদারুণ সেই আমার প্রিয়, আমার শ্রেষ্ঠ।

সন্ধ্যার কত আগেই ফিরেছে পরমা, তার মা রাজেশ্বরী পূজার ঘরে জপে যাচ্ছিলেন, মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন: 'কোথায় গিয়েছিলি?'

সম্ভ্রান্ত উত্তর ছিল, তবু পরমা কথা কইল না।

'আবার সেই লোকটার কাছে?'

'লোকটা?' মুখে-চোখে ঝলসে উঠল পরমা।

'তবে কি ভদ্রলোক বলব? চাষা, ইতর, ছোটলোক—' নামে বসলেন রাজেশ্বরী।

'নামী কলেজের মানী প্রোফেসর, তুমি তা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'ভুলে যাচ্ছি? মাস্টার হয়ে ছাত্রীকে যে বখায় যে কুশিক্ষা দেয় অন্যায় পথে চালনা করে –'

'অন্যায়?' আবার ঝলসে উঠল পরমা।

'শুধু অন্যায়? অসৎ।' যত বিষ আছে এক সঙ্গে ঢাললেন রাজেশ্বরী।

'বিয়ে করতে চাওয়া অসৎ?'

'একশোবার অসৎ। মাস্টার হয়ে ছাত্রীকে যে স্ত্রী ভাবে সে ঘোরতর-রূপে কুৎসিত। তার লালসার চেয়ে জঘন্য আর কিছু হতে নেই।'

'ছাত্রী? কে ছাত্রী? আমি আর এখন তাঁর ছাত্রী নই। আমি বি-এ পাস করে বেরিয়েছি।'

'তুমি দ্বিগ্বিজয় করে বেরিয়েছ। বলতে মুখ তোর খসে পড়ল না পোড়ারমুখী?' রাজেশ্বরীর ইচ্ছে হল মেয়ের মুখে এক চড় মারেন: 'ছাত্রী অবস্থাতেই তো প্রেমের অঙ্কুর গজিয়েছ তুমি। বই পড়বার নাম করে প্রেমে পড়া!'

'সে তো তুমিই পাঠিয়েছ আমাকে তাঁর কাছে, তাঁর বাড়িতে, তাঁর কোচিং ক্লাসে।' পরমা বললে শান্ত মুখে, 'আর তাঁর অসুখ হলে তাঁকে একটু দেখতে-শুনতে। কোচিং ক্লাসে ফি-টা যাতে একটু কম করেন কিংবা ফ্রি-ই করে দেন, তার জন্যে তোমার সাধনাও তো কম ছিল না। বাড়িতে ডেকে এনে কত তাঁকে তুইয়েছ-বুইয়েছ। কত খাইয়েছ পিঠে-পায়েস—'

'তখন কি জানি তোমার পুচ্ছে পেখম লুকোনো আছে?' ধিক্কার করে উঠলেন রাজেশ্বরী: 'তখন কি জানি একটা শিক্ষিত লোক গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের স্বাভাবিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করবে?'

'বিয়ে করলে কি পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়?'

'ও একটা বিয়ে?' রি-রি করতে লাগলেন রাজেশ্বরী 'ঐ লোকটার মুখের দিকে দেখেছিস তাকিয়ে?'

কথাটা ঝঙ্কারের মতো লাগল বুকের মধ্যে। সত্যি, পরমা কি দেখেছে তার মুখ? আশ্চর্য, সে মুখ সে এখন মনেও আনতে পারছে না। সে কি মুখ, না, প্রতিভার দীপ্তি, প্রতিভার ক্লান্তি, প্রতিভার রিক্ততা!

মনে পড়ে পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ দেখতে গিয়েছিল একবার। সেদিন

কি একটা উৎসব উপলক্ষে অসম্ভব ভিড় ছিল। মন্দিরের গহ্বরে দিন না রাত্রি বোঝা যায় না, জমজমাট অন্ধকার, শুধু কটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে। যে পারো সেই আলোর আভাতেই দেখে নাও বিগ্রহ। ভিড়ের চাপে চেপটে গিয়ে কে কোথায় পিছলে পড়ছে তার ঠিক নেই। সেই ভিড়ের মধ্যে একটি কিশোরী ওড়িয়া-বউকে দেখেছিল পরমা। কোন দূরান্ত গাঁ থেকে এসেছে, মুখে সেই একটি তৃণাভ কোমলতা; সেই ছায়াচ্ছন্ন রহস্যালোকে ভয়খাওয়া চোখে কি যেন সে খুঁজে বেড়াচ্ছে উদ্‌ভ্রান্তের মত। তার সঙ্গের লোকেরা তাকে ঘন ঘন তাড়া দিচ্ছে, দেখ, দেখ—পরমা লক্ষ্য করে দেখল, ভিড়ের চাপে বউটির মুখ বিগ্রহের থেকে ঘুরে গিয়েছে বিপরীত দিকে, শূন্য শুভ্র দেয়ালের দিকে, আর সেই বউটি তন্গত মনে প্রগাঢ়স্বরে বলছে, দেখছি, দেখছি! তার দুই চোখে অগাধ বিস্ময়, পরিপূর্ণ আনন্দের জ্যোতি। সেই বউটি কি দেয়াল দেখছে, না জগন্নাথ দেখছে? আর সেই জগন্নাথ কি বিকল বিকৃত? না কি সকল সুন্দর-সন্নিবেশ?

'ও লোকটা তোর চেয়ে বয়েসে কত বড়ো তা তোব খেয়াল আছে?' রাজেশ্বরী আরেক ঘা হাতুড়ি মারলেন।

মুখ নিচু করল পবমা। বললে, 'তিনি আমাব চেয়ে সব বিষয়েই বড়ো।'

'বিষয়ে কে বলতে যাচ্ছে? বয়সে বয়সে। তোর দ্বিগুণ ওর বয়েস, তা তুই জানিস?'

দোতলাব বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। পরমা সরে গিয়ে রেলিং ধরল। বাইবের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, 'জানি। ঠিক দ্বিগুণ নয়। আটত্রিশ-উনচল্লিশ হবে।'

'একেবারে কার্তিকের বয়েস!' দুই হাত নেড়ে বীভৎস ভঙ্গি করলেন রাজেশ্বরী।

দূরে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বললে পরমা, 'কার্তিক চিরকুমার, তেমনি ভালোবাসাও চিরনতুন। ভালোবাসার বয়েস নেই।'

'তাই বলে একটু দ্বিধাও থাকবে না?'

'না, দ্বিধাও নেই। ভালোবাসা যে স্পর্শমণি। স্পর্শমণি পুজোর ঘরের ফলকাটা বঁটি আর কসাইয়ের হিংসাব খড়্গ দুইই সোনা করে। সে নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিবাদ।'

'কিন্তু রুচি বলে তো একটা পদার্থ আছে। এতদিন তবে তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম কি করতে?' রাজেশ্বরী চোখে আঁচল চাপলেন।

এবার রেলিং থেকে ঘুরে দাঁড়াল পরমা। বললে, 'লেখাপড়া

শিখিয়েছিলে যাতে বিয়ের কাজে লাগতে পারে। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন শুন্য পুরুষের জন্যেই লেখাপড়া। সেই লেখাপড়া দিয়েই আমি যদি আমার কাম্যফল সংগ্রহ করে থাকি তাহলে আপত্তি কি?'

'কিন্তু ফলের চেহারাটা তো দেখবি।' দাঁতে-দাঁতে ঘষলেন রাজেশ্বরী।

'কন্যা বরয়তি রূপং এই ববাবর শুনে আসছি। কিন্তু রূপ কি শুধু চেহারায়?' রেলিঙে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে তেমনি উদাসীন সুরে বললে পরমা, 'রূপ কি শুধু খোলসের, শুধু হাড়মাসেব? তা ছাড়া ফলের চেহারায কি হবে যদি তা মাকাল হয়? যদি তাতে স্বাদগন্ধ না থাকে?'

'এতে খুব স্বাদগন্ধ! বলি স্বাদগন্ধের খবরও নেওয়া হয়েছে নাকি?' রাজেশ্বরীব মুখে আটকাল না এতটুকু।

'মা!' চিৎকার করে উঠল পরমা। মুখ আবার ফিবিযে দিল রেলিঙের দিকে।

'তা ছাড়া ও-লোকটাব যে বউ আছে সেখবব জানিস?'

রেলিঙের থেকে শরীরের অনেকটা ঝুঁকিয়ে দিল পরমা। উত্তর করল না।

'কি, জানিস?'

'জানি।'

তবু এতটুকু আক্ষেপ নেই মেযেটাব? বাজেশ্ববীর ইচ্ছে হল হাতের চন্দনের বাটিটা পবমার মুখের উপর ছুঁড়ে মাবেন। তাব পাষাণেব মত ঐ স্থির মুখটা ক্ষতে-রক্তে অন্য রকম কবে দেন।

'কি জানিস?' দু পা এগিয়ে গেলেন বাজেশ্ববী।

'সব জানি। সব আমাকে তিনি বলেছেন।'

'বলেছেন! কৃতার্থ করেছেন! যাব বউ আছে সে আবাব বিয়ে কবে কি করে?'

'এমন কোনো আইন নেই, অন্তত এখন পর্যন্ত নেই, যে বাধা হতে পারে।'

যেন বাধা হওয়াটাই বড় কথা। বাধা নেই বা হল কিন্তু তোমাব একটা প্রবৃত্তি বলে কিছু নেই, অভিপ্রায় বলে? তোমার মনোনয়ন কি হাটমাঠের?

'আইন! আইন শিখছেন মেয়ে!' রাজেশ্বরী ব্যঙ্গেও পারঙ্গম: 'হাতিঘোড়া গেল তল, বেতো বলে হাঁটুজল। আইনের কথা বলে কে? বলি নীতি বলে কিছু নেই? আগের স্ত্রী বেঁচে থাকতে যে আবার বিয়ে করতে চায় তার মত দুর্বৃত্ত আর কে আছে, কে থাকতে পারে?'

'আমি সব শুনেছি। সব জেনেছি। অনেক ছেলেবেলায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল, বাপমার শাসনের চাপে পড়ে। সেই স্ত্রীকে তাঁর পছন্দ হয়নি—'

'যত পছন্দ হয়েছে ছাত্রীকে!'

'সে স্ত্রীর মধ্যে কোনো কিছুই তিনি পাননি, না সুরা না সুধা, সে গেঁয়ো, অশিক্ষিত, কুশ্রী, সেকেলে—'

'কিন্তু অপরাধী নয়। সংসারে তুমিই একমাত্র পুণ্যের শিখা, রূপের ডিপো, শিক্ষার ফাটা বিসুবিয়স—'

'তার সঙ্গে নলিনেশবাবুর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তা থাকবে কেন? যত সম্পর্ক ছাত্রীর সঙ্গে। স্ত্রী যদি অশিক্ষিত হয় তুই একটা অগামারা আকাট মূর্খ। সম্পর্ক নেই! স্ত্রীকে সে মাস-মাস টাকা পাঠায় তা জানিস?'

'পাঠিয়েছিলেন কয়েক বছর। আজ প্রায় পাঁচ-ছ বছর পাঠান না। স্ত্রীই লিখে পাঠিয়েছেন আর তাঁর টাকার দরকার নেই। কানপুরে না জোনপুরে কোথায় কোন মাতাজীর আশ্রমে আছেন, তাঁর আর সেখানে কোনো অভাব নেই, অভিযোগ নেই, নেই বা কোনো সংসারে অভিরুচি। সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তাঁদের।'

'হয়েছে তোর মাথার। এই বেলা তোর আইনের ভাঁড়ে মা ভবানী। বলি হিন্দু বিয়ের কখনো বিচ্ছেদ হয়?'

'না হয় তো হওয়া উচিত।' মুখ ফিরিয়ে বললে পরমা, 'সমাজ বড়ো হলে আইনও একদিন বড়ো হবে।'

'ছাই হবে। যে এক স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে সে আরেক স্ত্রীকেও ত্যাগ করবে।' রাজেশ্বরীকে শোনাল প্রায় অভিশাপের মত।

তাকেও তুচ্ছ করল পরমা। বললে, 'করতে হয় করবেন। সেইখানেই তো আমার ভালোবাসার অগ্নিস্নান। প্রত্যেক প্রেমের মধ্যেই ভয় জেগে থাকে, এখানেও থাকবে। তার জন্যে ভয় করে লাভ কি? আগুন যে পোহায় ধোঁয়া তাকে সইতেই হয়।'

'তবু তুই সমস্ত জেনে-শুনে ঝাঁপ দিবি?' রুখে দাঁড়ালেন রাজেশ্বরী।

'কি করব, আমার জীবনে পরমাশ্চর্য যে সেইভাবেই এসেছে। হিসেবের খাতায় অঙ্ক মিলিয়ে আসেনি, আসেনি সমতল সামঞ্জস্যের পথ দিয়ে। এসেছে কলঙ্কীর বেশে, হয়তো বা ভয়ঙ্করের রূপ ধরে, তবু, এই, এই আমার পরমসুন্দর।' মায়ের দিকে তাকাল পরমা: 'তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।'

'আশীর্বাদ করব?' হাতের চন্দনের বাটিটা সজোরে ছুঁড়ে মারলেন

রাজেশ্বরী। বাটিটা লাগল এসে পরমার কণ্ঠার কাছে। জায়গাটা কেটে গেল। রক্তের সঙ্গে মিশল এসে চন্দন।

'দেখব এ বিয়ে তুমি কি করে ঘটাও।' রাজেশ্বরী পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

কাটা জায়গাটা আঁচল দিয়ে চেপে ধরে পরমা বললে, 'তেজ তোমার একলারই আছে তা মনে করো না। আমি তোমার মেয়ে, তোমার তেজে আমারও উত্তরাধিকার।'

বারান্দার দেয়ালে বাবার একটি তেলছবি টাঙানো। মমতাভরা স্থির চোখে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল পরমা। দেখতে-দেখতে জল দাঁড়িয়ে গেল। মা যেমন ঘুমন্ত শিশুর মুখে হাত বুলিয়ে আদর করে তেমনি করে ছবির কাঁচের উপর হাত বুলুতে লাগল। মনে মনে বললে, বাবা, তুমি থাকলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বুঝতে, আমাকে আমার ব্রতোদ্ধারে সাহায্য করতে। অন্ধকার করে শত ঝড় উঠলেও তুমি ঠিক পৌঁছে দিতে তীরে, আমার পূর্ণঘটের ঘাটে। বলো, দিতে না? তুমি জানো, আমি জানি, কে না জানে, মেয়েই মেয়ের শত্রু।

একটু যেন আগেই ফিরেছেন আজ মণিলাল। এসেই ডাক দিলেন, 'রাজু!'

পূজার ঘরে আজ আর মন বসাবার উপায় নেই। রাজেশ্বরী উঠে এলেন। বললেন, 'আমাকে ডাকছ?'

'মেয়েকে আটকাও।' জামার বোতাম এক এক করে খুলতে খুলতে বললেন মণিলাল, 'নলিনেশ নাকি ছুটির দরখাস্ত করেছে।'

কি যেন সাংঘাতিক খবর এমনি আতঙ্কিত মুখ করলেন রাজেশ্বরী।

'আর সে ছুটির কারণ নাকি বিয়ে করবে সম্প্রতি। আর ছুটি নাকি বেশ লম্বা ছুটি।' মণিলাল জামাটা গা থেকে খুলে ফেললেন একটানে।

রাজেশ্বরীর মুখে যেন কে ছাই মাখিয়ে দিল। বললেন, 'ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে?'

'না, এখনো হয়নি। পরশু মিটিং হবে কমিটির, তাতে উঠবে দরখাস্ত।'

'তুমি তো কমিটিতে আছ, দাদা—'

'তা তো আছি।' ভাবখানা এই মণিলালের, কিসে আমি না আছি এই শহরে?

'তবে দেখ ছুটি যেন না পায়। ওর দরখাস্ত যেন নাকচ হয়। বউ

বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে কি? কাকে বিয়ে? আর বিয়ে করতে এক মাসের ছুটি চাইছে কোন হিসেবে?' রাজেশ্বরী তুমুল করে উঠলেন।

'বোধ হয় একেবারে হনিমুন করে ফিরবে—'

'ওকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দাও, দাদা।' রাজেশ্বরী শক্ত করে চেপে ধরলেন খাটের বাজু।

'তা না হয় করব কিন্তু মেয়েকে সামাল দে। মেয়েকে শায়েস্তা কর। কর নজরবন্দী। আমরা যদি ঠেকাতে পারি কার সাধ্যি মাথা গলায়। কথায় বলে, আপনার ঘর সামাল করো পরে গিয়ে পরকে ধরো।' মণিলাল বসলেন চেয়ারে: 'কনে যদি না পায় তো কিসের বিয়ে! সর্বক্ষণ যদি ছুটোছুটিই করতে হয় কিসের ছুটি!'

পাশের বারান্দা থেকে সব শুনেছে পরমা আর আনন্দে সারা শরীরে রুপালি ঝরনার মত ঝিরঝির ঝিরঝির করে কাঁপছে। ভয় নয় অপমান নয় যন্ত্রণা নয়, শুধু আনন্দ। আর কিছুতে নয়, নলিনেশ পেশ করেছে দরখাস্ত। কিছু একটা করেছে। পেরেছে করতে।

বীরহস্তে বরমাল্য নেবে এই বড় সাধ পরমার। লোভকে সে বলি দেবে না, বীর্যকে সে প্রসাদ দেবে। তাকেই সে বরণ করবে যে হরণ করতে প্রস্তুত।

তাই অকুতোভয় পরমা। রাক্ষস তাকে যতই বন্দী করুক আছে তার উদ্ধর্তা।

একটা প্রাচীন গুহার মত নলিনেশকে মনে হত পরমার। আস্তে আস্তে আসত, ভয়ে ভয়ে বসত দূরে দূরে। মনে হত কঠিনের ঘরে গম্ভীরের বসতি। তন্ময়ের ঘরে উদাসীনের। যেন তুষার-চূড়ায় শিব বসেছেন ধ্যানাসনে। অচঞ্চলের সম্ভাষণে। প্রাণ নেই তাপ নেই ধ্বনি নেই, শুধু নিগূঢ়ের শুধু গভীরের নিমন্ত্রণ।

পরমার ইচ্ছে করত একটু বসে থাকি বেশিক্ষণ। অনুভব করে করে অন্ধকার গহ্বরের দু-একটা বা সিঁড়ি খুঁজি। দুর্গমের দুয়ার খুলে দেখি না কোথাও পাই কি না একটু সহজের আভাস, সবুজের ইঙ্গিত। দেখি না চিতাভস্মের নিচে আছে কি না চন্দন, দর্পের নিচে আছে কি না দারিদ্র্য। দেখি না জটাজালের নিচে আছে কি না জাহ্নবী।

কে জানে লীলাচ্ছলেই হয়ত অকিঞ্চন সেজেছেন। শুষ্ক বল্কলের নিচে আছে বুঝি তপ্ত প্রাণসুধা। স্তব্ধতার নিচে গীতলহরীর ইন্দ্রজাল।

এমন একটা অস্তিত্ব যা প্রতীক্ষা করায়। প্রতীক্ষা করাবার মত শক্তি-সম্পদ রাখে। গুহাই তো বসিয়ে রাখতে পারে অন্ধকারে। অরণ্য তার

গহন নির্জনে। দেখ কিছু ঘটে কি না! স্তব্ধীভূত গুঞ্জরিত হয় কি না! শিলীভূত শিহরিত হয় কি না! সন্ন্যাসী অরণ্যে জাগে কি না বসন্ত-বন্যা! দেখ, দেখ। দেয়ালে জাগে কি না জগন্নাথ!

কলেজে কে ধরবে-ছোঁবে নলিনেশকে! বিদ্যার এত দুর্ভেদ্য তার বর্ম, মুখে এমন এক কৌতুককৌতূহলহীন নির্লিপ্তি। কিন্তু যখন কাব্য পড়ান, আবৃত্তি করেন মনে হয় কি অপূর্ব রসের সমুদ্র তাঁর বুকের মধ্যে, কি নিবিড় অনুভবের উত্তাপ! অন্তরে ভালোবাসা না থাকলে দুঃখ না থাকলে কেউ এমন ভালো পড়তে পারে? পড়াতে গিয়ে নিজে হয়ে উঠতে পারে কবিতা! কতদিন বুকের মধ্যে আবৃত্তির সেই ধ্বনি নিয়ে পরমা ঘুমিয়েছে, কণ্ঠস্বরের সেই আকৃতি সমস্ত মর্তবন্ধনের ওপার থেকে ডাক দিয়েছে তাকে। যেন মর্তশিশুর কাছে মৃত্যুর ডাক। ভেবেছে এমন মানুষের সহজ রূপটি না জানি আরও কত বিচিত্র, এই কণ্ঠস্বরের সহজ সম্ভাষটি না জানি আরও কত রহস্যমদির! শুনবে না সেই অগম্যকে? কলেজের পড়া পড়ে নোট মুখস্থ করেই বন্ধ করবে বই?

গুটি গুটি দুটি-চারটি মেয়ে আসতে লাগল নলিনেশের বাড়ি, কোনো তৈরি-করা প্রশ্ন নিয়ে, যাতে তার উত্তরের সূত্রে নলিনেশ খানিকটা বলে, পড়ে, বোঝায়, চকিতে এক টুকরো সোনার মেঘ হয়ে ওঠে। একাই বাকি, দলে থল নেই। আর সে-দলের অগ্রণী পরমা। আমরা সবাই এলাম। যদি বিরক্ত না হন। যদি হাতে সময় থাকে একটু পড়ে শোনান রবীন্দ্রনাথ, কি অন্য কিছু—

উদারসৌম্য চোখে তাকাল নলিনেশ। যেন সে চাহনির অর্থ, সকলে মিলে এলে কেন, তুমি কেন একা এলে না? তা হলে আমার হাতে অনেক সময় থাকত, এক বিন্দু রক্তও বিরক্ত হত না।

নিশ্চয় এ সব ভুল মানে করছে পরমা। প্রস্তরে কি কখনও শ্যামলের স্বাক্ষর ফোটে? দুঃসাধ্যের দেশে সুলভের আতিথ্য? মানে ভুল হোক কিন্তু যে মন ভুল মানে করে সে ভুল নয়। গুহার মধ্যেই মিলে যায় গুপ্তধন।

কবিতা পড়তে লাগল নলিনেশ, আর পরমার মনে হল সন্ধ্যার আরতির আলোকে দেবতার মুখ দেখছে। নিস্তব্ধ গম্ভীরের মুখ।

সেই থেকে মেয়েদের আগ্রহে কোচিং ক্লাসের পত্তন করল নলিনেশ। হ্যাঁ, মাইনে দিও ভাগ করে।

দুখানা ঘরের এক চিলতে বাড়ি, একটা বিদেশী চাকরের হেপাজতে। কোনটা যে বসবার আর কোনটা যে শোবার পার্থক্য করা যাচ্ছে না। দু ঘরেই তক্তপোশ আর চেয়ার, টেবিল আর তাকের বোঝা, আর টাল-টাল

বইয়ের ঢিবি। মোটা থেকে চটি, ছেঁড়াখোঁড়া থেকে রেক্সিনে-বাঁধাই। তাক উপচে নেমে পড়েছে মেঝেয়, টেবিল থেকে ছিটকে এলিয়ে পড়েছে তক্তপোশে। দু ঘরের দুটো তক্তপোশেই ভাগাভাগি করে বিছানা পাতা। এ ঘরে নয় ও ঘরে যেখানে খুশি বোস খাড়া হয়ে বসতে না চাও তো পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে, আর যদি ঘুম পায় ক্লান্তিতে, কোনটা সত্যিই শোবার ঘর বলে যদি দ্বিধা থাকে, তবে এখানেই নিমগ্ন হয়ে যাও। কি আশ্চর্য ঔদাসীন্য, শোবার জায়গা বলেও একটা স্থিরতা নেই, চলাবসার নেই কোথাও সীমাশ্রী। এত বিশৃঙ্খলা, কিন্তু কিছুই যেন স্বকৃত নয়, কৃত্রিম নয়, সমস্ত মিলিয়ে একটি উচ্ছ্বসিত সরলতা। সমস্ত কিছু বেষ্টন করে বিরাজ করছে একটি ধী ও ধ্যানের ধূপগন্ধ। চারদিকে বইয়ের ঢেউ আর তার মধ্যে এক নির্জন দ্বীপে এক নিরাসক্ত নিরঞ্জন সন্ন্যাসী তপস্যায় বসেছে এই বারে বারে মনে হয়েছে পরমার। আর এও মনে হয়েছে এ কি নিরর্থকের তপস্যা নয়? এ কি নয় রিক্ততার ছদ্মবেশে সিক্ততার প্রতীক্ষা? ধ্যানচ্ছলে বিরহ-উদ্‌যাপন?

কেমন না জানি হয় যদি একবার একটু জেগে ওঠে! সে না জানি কি ভয়ালসুন্দর রোমাঞ্চ! প্রচণ্ডতাণ্ডব শিবের যদি একবার উমার কথা মনে পড়ে যায়! কি না জানি সে দারুণ মধুর রোমাঞ্চ যদি নিবিড় নিকষে একটি স্বর্ণরেখার বিকার ফুটে ওঠে! যদি সে কঠিন গম্ভীরের কণ্ঠে লাগে একটু স্নেহদ্রব অন্তরঙ্গতার রঙ!

প্রাচীন গুহাই তাই অন্তরের গভীরে গভীরে আকর্ষণ করে পরমাকে। ধ্বনি নেই, কিন্তু কেমন না-জানি তার প্রতিধ্বনি! কেমন না-জানি সেই প্রচ্ছন্নের নিম্নস্বর!

যখনই আসে নিজেরই অজানতে এটা-ওটা একটু গুছিয়ে দেয় পরমা। অবিশ্যি সেটা সমুদ্রের থেকে এক চামচ জল তোলা, কিন্তু সমুদ্রে যে সে চামচ ডোবায় সেইটেই দুঃসাহসিক স্বপ্ন! অন্তত স্বপ্নেও দুঃসাহস থাকবে না, এ কেমনতরো সংকীর্ণতা! তাই দুঃসাহসের স্বপ্ন-দেখা মন এও একেক-বার চেয়ে বসে—কথা বলার উত্তেজনায় অসতর্ক চুলের সরু একটা গুচ্ছ যে নেমে এসেছে তার চোখের উপর তা সযত্নে সরিয়ে দেয় আঙুলে করে।

'তোমরা সবাই এসেছ, একটু চা করে নাও না উদ্যোগ করে।' বললে নলিনেশ, কিন্তু লক্ষ্য করল পরমাকে।

চাকরটা কোথায় গেছে আড্ডা দিতে। দেখ না কোথায় কি আছে, নিজেরাই সব সরেজমিনে তদন্ত করে নাও। কোথাও আড়াল-আবডাল নেই, হোঁচট খাবার মত নেই কোথাও ইট-পাটকেল।

এগিয়ে এসে পরমাই হাত লাগাল। খুঁজেপেতে সব গোছগাছ যোগাড়-যন্ত্র করে নিল। কোথায় কি ফাঁক আছে তার ফিকির বার করল। কেমন একটা পিকনিক পিকনিক মনে হচ্ছে। কঠিনের ঠাসবুননের মধ্যে কলহাস্যের বুটি টাকল।

নলিনেশ বললে, 'চায়ের সঙ্গে কবিতা বেশ খাপ খায়। কী কি সুন্দর রঙ বের করেছ—কি সুন্দর গন্ধ! বস্তুতে কিছু নেই শুধু শিল্পীর কৌশল। খালি কৌশলই নয়, শিল্পীর মনের মাধুরী।'

এটুকু প্রশংসা পরমার ব্যক্তিগত। আশ্চর্য, নলিনেশ ব্যক্তিগত হতে জানে!

সেদিন কোচিং ক্লাসের পর আর-আর মেয়েরা চলে যাচ্ছে, পরমা যেন একটু পিছিয়ে থাকছিল। একটু বা ঘুরঘুর করছিল অকারণে। হঠাৎ নলিনেশ তার কাছে এসে বললে অস্ফুটস্বরে, 'তুমি একটু আগে আসতে পারো না?'

পরমার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। যেন স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রের মতোই আশ্চর্য এই অস্ফুটস্বর। কণ্ঠস্বর এমনি ছায়াচ্ছন্ন করতে পারে নাকি নলিনেশ এবং তা পরমার সম্পর্কে? গুহায় শুধু গর্জনই নেই, গুঞ্জরণও শোনা যায় তাহলে? বাইরে যতই জয়ঢাক থাক, ভিতরে আছে বুঝি একটি শঙ্খের শব্দ! নিজের দেহের রক্তের রুনু রুনু পরমা যেন শুনতে পেল কান পেতে।

কেন এমন হল? কেন ঈশ্বর সহসা তার স্বরকে ছায়াচ্ছন্ন করে দিলেন? আর কেন সেই স্বর বেছে-বেছে তারই কানে এসে বাজল?

কলেজে প্রথম যখন রোল কল্ করে, নলিনেশ নাম ধরে ধরে ডেকেছিল একেক করে। পরমার নাম আসতেই বলে উঠল, 'বা, বেশ নাম।'

লজ্জায় মৃদু একটু হেসেছিল পরমা—সে হাসি স্বভাবসংলগ্ন হাসি যা একটু মিষ্টি কথা শুনলেই মেয়েরা হাসে। কিন্তু আজ কি বলল নলিনেশ?

'আমাকে একটু আগে আগে যেতে বলেছে, মা।' রাজেশ্বরীর কাছে অনুমতি চাইল পরমা।

'তা যা না।' একবাক্যে সায় দিলেন রাজেশ্বরী 'ভিড়ের মধ্যে কি পড়াশোনা হয়? একটু আগ বাড়িয়ে গেলে ফাঁকা পাবি, কিছু নিতে পারবি সাজেশ্শান।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই—' তাড়াতাড়ি একটু সাজতেগুজতে গেল পরমা।

'অনার্সটা যাতে রাখতে পারিস—'

'শুধু রাখা নয় মা, পাওয়া।'

বিশেষ যদি সাহায্য পাস কেন পাবি না?' রাজেশ্বরী আশ্বস্ত করলেন।

আগে আগে একা একাই সেদিন চলল পরমা। ছাত্রীর চেয়ে একটু বেশি মন নিয়ে সাজলগুজল। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের চোখকেই চোখ ঠারল, না, এ এমন আবার সাজ কি! ব্লাউজের হাত শাড়ির পাড় আর জুতোর স্ট্র্যাপ—এর ম্যাচ কোন ছাত্রীই বা না করে! না, তা নয়। বেরুবার সময় বাড়ির বাগানে যে গন্ধরাজ ফুটেছে তারই একটা হঠাৎ ছিঁড়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজল। পিছনের ফুলটা চোখে দেখতে না পেলেও মনে মনে দেখল। না দেখলেও ফুলের গর্বিত গন্ধটুকু তো দিব্যি টের পাচ্ছে। পরমার সর্বদেহেই তো এখন এই গর্বগদগদ গন্ধ।

এমনিতে হেঁটে যায় দল পাকিয়ে রাস্তা জাঁকিয়ে আজ একা একা রিকশা নিল। তুলে দিল ঢাকনা। পথে অঞ্জলি-দীপালিদের বাড়ি পড়বে ওরা দেখে ফেলবে তার জন্যে নয়, কেননা ওখানে পৌঁছেই তো ওরা বুঝবে ওদের ফেলে আগেই চলে এসেছে পরমা। সে কৈফিয়ত যা দেবার তা না হয় দেবে তৈরি করে। কিন্তু কতক্ষণ আগে থাকতে চলেছে এটুকু ওরা না দেখুক না বুঝুক।

সেই প্রথম তার একা হবার লগ্ন। সেই একা হতে যাওয়ায় না-জানি কিরকম হাওয়া, কি রকম আলো। সেই সব স্তব্ধতার না-জানি কোন দিশি ভাষা, সেই সব অন্যমনস্কতার না-জানি কি সরলার্থ। সেই একাকিত্বের কাছাকাছি হওয়া মানেই যেন সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়া। প্রথমে বোঝা যায় না এখানে সমুদ্র আছে, ক্রন্দনগর্জনের টুঁ-টিও শোনা যাচ্ছে না কোথাও, দেখা যাচ্ছে না সাদা হয়ে যাওয়ার শূন্য হয়ে যাওয়ার ভূমিকা। হঠাৎ, চকিতে, বলা-কওয়া নেই, বিন্দুমাত্র প্রস্তুত হতে না দিয়ে সব গাছপালা বাড়িঘর আড়াল-দেয়াল সরিয়ে সবলে আবির্ভূত হল সমুদ্র—অবিনশ্বরের বিস্তার—আনন্দে নিষ্পলক হয়ে রইল পরমা। প্রথমে বোঝা যায় না অন্তরেই বসে আছে এই সমুদ্র। অবিনশ্বর নির্জনতা।

নিশ্চয়ই প্রথমে লেখাপড়া নিয়ে কথা শুরু হবে, তারপর আস্তে আস্তে কথা উঠবে গন্ধরাজ ফুল নিয়ে এবং আস্তে আস্তে কথায় মিশবে এমনি একটি সুগন্ধ যা গন্ধরাজেরও অধিক। একলা হবার সুগন্ধ। কতটুকু না-জানি আজ হিজিবিজি হবে। জানি হিজিবিজিই হবে, তার থেকে বেরুবে না কোনো ছবির কাঠামো। তবু হিজিবিজিই হোক, একসারসাইজ খাতার বাইরে খুচরো কাগজে পেন্সিলের আঁকিবুঁকি। হিজিবিজিই কি অপার্থিব।

পরমা ভাবল নিশ্চয়ই বাড়িতে পাবে না। আগে আসবে বলে এত আগে আসবে এ কোনো হিসেবেই কেউ ভাবতে পারে? হয়তো বেরিয়ে গিয়েছে, নয়তো কে জানে অসময়েই ঘুমিয়ে পড়েছে কি না! কি বিচ্ছিরি, যদি ঘুম ভাঙাতে হয় আচমকা! সে না হয় কলেজ থেকে ফিরে প্রায় হন্যে হয়েই ছুটে এসেছে, কিন্তু এ-পক্ষকে একটু ক্লান্তি অপনয়ন করবার সুযোগ না দিলে চলবে কি করে। তোমাদের আর কি, তোমরা তো শুধু শোনো, আর না শুনলেই বা তোমাদের মারে কে! কিন্তু আমি কেবল বকি, অনর্গল খই ফোটাই, আমার উনুনে একটু কামাই না দিলে চলবে কেন? তা হোক, বিকেল বেলা কি ঘুমোবার সময়? মন্দ নয়, থাকুন ঘুমিয়ে। যে ঘুমোয় তাকে জাগানো কি এতই অসাধ্য? কুম্ভকর্ণ যে কুম্ভকর্ণ, সেও জেগেছিল শেষ পর্যন্ত।

দোরগোড়ায় চেয়ার পেতে বসে নলিনেশ খবরেব কাগজ পড়ছে।

'সে কি স্যার,' পরমা চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক দিল: 'আপনি খবরের কাগজ পড়েন?'

'কি বলো? এত হাঁকডাকওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হরফ, চোখ না পড়ে করে কি—' আবার খবরের কাগজেই চোখ রাখল নলিনেশ।

'কি লেখে এত কাগজে?' ঘরের মধ্যে পা বাড়াল পরমা।

'কি-হয় কি-হয় সব খবর। একটার পর একটা দিনেরাতে ঘটেই চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। হয় ইংলণ্ড নয় জাপান নয় জার্মানি নয় রাশিয়া। যে কুঁজো সে কি আর চিত হয়ে শুতে পারে কোনোদিন?'

আর যে কানা সে কি সামনের বস্তু দেখতে পারে কোনোদিন? কানা কালা আঁধা শুনেছি, কিন্তু নাকেও যে ঘ্রাণ নিতে জানে না তাকে লোকে কি বলে?

আজ কি খবর বলবার পাঠ নিয়েছে নাকি নলিনেশ?

'তোমার আর-সব বন্ধুরা কোথায়?' কাগজের থেকে মুখ না তুলেই বললে।

'তারা আসছে। কিন্তু,' আরও এক পা এগিয়ে চমকে উঠল পরমা: 'এসব আপনি করেছেন কি!'

'কি করেছি?' যেন কোন অপরাধের প্রতিবাদ করছে এমনি রুক্ষ গলায় বললে নলিনেশ। সহসা চোখে চোখ পড়ল। হীরের কুচির সঙ্গে দেখা হল রোদের কণার। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে গুছিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'ও, তুমি এসেছ। আমি ভেবেছিলুম কে না কে।'

আমি কে-না-কে? পরমার মনে হল অভিমান করে, কিন্তু কার উপর করবে? সে যে ঐ সঙ্গে এও বললে, তুমি এসেছ!

এ তুমিটির মধ্যে আলতো করে এক আঁচড় তুলি কি বেশি পড়েনি? একরেখা রঙ কি বেশি চড়েনি? একটু শোনা যায়নি কি প্রচ্ছন্নের নিস্বন?

'কিন্তু এসব আপনি কি করেছেন?' আবার ঝঙ্কার দিল পরমা।

'কি করেছি?' আবার প্রতিবাদ করল নলিনেশ।

'ঘরদোর এমন গুছিয়েছেন সুন্দর করে?'

লজ্জিতমুখে দুর্বল একটু হাসল নলিনেশ, আর তাকে সহসা আত্মভোলা শিশুর মত দেখাল। বললে, 'তুমি আসবে বলে ঘরের একটু শ্রী বদলাবার চেষ্টা করেছি।'

'আমি তো রোজ আসি—'

'সে তো বহুবচনে আসা, আজ একবচনে এসেছ।' নলিনেশ আর একটা চেয়ার টেনে আনল। বললে, 'শ্রীকে এতদিন ঘরের দাওয়াতে বসিয়েছি, আজ মনে হল সিংহাসনে বসাই। বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইঙ্গিতটা যেন এই, পরমাই মূর্তিমতী শ্রী। সেই যেন জলকে নির্মল ও বাতাসকে নিরাময় করে দেবে। চতুর্দিক থেকে আনবে স্বাস্থ্য ও শক্তির উদ্দীপনা।

'আপনি বললেন না কেন, আমি আরও আগে আসতাম। সব নিজে থেকে দিতাম গোছগাছ করে। এতদিন কই বলেননি তো হাত লাগাতে।' উঁচু হয়ে নিচু হয়ে এদিক-সেদিক উঁকি মেরে বলতে লাগল পরমা: 'ঐ দেখুন ছবির, ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা এখনো দু মাস পিছিয়ে আছে। তাকের উপর খবরের কাগজটার নিচে পুরু এক ধুলোর কম্বল, বইগুলো বেশির ভাগই হেঁটমুণ্ডু। আর ম্যাগাজিনগুলো পর পর সাজিয়েই যখন রেখেছেন, মাসওয়ারি রাখতে পারেননি?'

'তবু ত থাকথাক রাখতে পেরেছি গুছিয়ে—' নিজের প্রশংসা নিজেই করল।

'তাই দেখছি বটে। খবরের কাগজখানাও কেমন ভাঁজ করে রাখলেন।' হাসল পরমা: 'অন্য দিন দেখেছি হাওয়ায় হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘরে-মেঝেয় ছুটোছুটি করছে।'

'সব তুমি আসবে বলে।'

দুই চোখে মধু নিয়ে তাকাল নলিনেশ। দোহারা চেহারার দীর্ঘকায় মেয়ে, স্থিরে-অস্থিরে একটি নিষ্কলঙ্ক দীপশিখা। চলছে বলছে যেন জ্বলছে সব সময়। মাথার চুল ঘন হয়ে গুচ্ছীকৃত হয়ে কপালের আধখানা

ঢেকে রেখেছে। তার অল্প নিচেই পরিচ্ছন্ন করে টানা ঘন ভুরুর ডানা-মেলা। তার নিচে নীড়েবসা অচঞ্চল দুটি পাখির মত চক্ষু। ঠোঁট দুটি মনে হয় সব সময়ই সিক্ত হয়ে আছে। হাসিটি সব সময়েই প্রস্ফুটিত। শুধু মুখের হাসি নয়, সমস্ত দেহই আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল।

ত্রুটি কি নেই? আছে হয়তো। নাকটা কেমন নিরীহ, চিবুকের ডৌলটি কেমন ভোঁতা—কে অত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে? সব মিলিয়ে একটি পূজার প্রতিমা, মর্তের ঘরের একটি আনন্দস্তব। তারপর চোখে যখন স্নেহ জাগে তখন আর কোথায় ত্রুটি?

মনে মনে কবিতার দুটো লাইন আওড়ায় নলিনেশ

তোমার স্নেহের দুটি লোচন
করুক সকল ত্রুটি মোচন।

নতুন একটা সমালোচনার বই এসেছে তাই নিয়ে কথা শুরু হল। আর পরমার ভয় শুরু হল, কথা যখন একবার শুরু করেছে সব বুঝি মাটি হয়ে যায়। আর বুঝি সেই গম্ভীর মুখে শোনা যাবে না চপল-মদির অস্পষ্টতা। লঘুতার মাঝে নিগূঢ়ের সংকেত। তা হলে কি হল আগে এসে? ছি-ছি, এইসব ব্যাখ্যাব্যাকরণে কি হবে—যেনাহংনামৃতাস্যাম—গোটাকয় নয় প্রেমের কবিতা পড়ো, সংস্কৃত কি ফরাসী, অন্তত পদাবলী নয় জয়দেব! নয়তো বিস্তৃত কলেজটাকেই কেন টেনে আনো নিভৃত ঘরের মধ্যে?

ছি ছি, এখনও বকবে। নলিনেশের কথায় পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া। কত বিদ্যে ফলাবে, কত কোটেশান ঝাড়বে, ফুটনোটের নজির দেবে, পিন-ফুটোনো থেকে শুরু করে হাতে মাথা কাটবে তার ঠিক নেই। থামতেই জানে না। থামতে জানাটা যে কত বড় জানা তা কবে বুঝবে নলিনেশ! কবিতা গল্প উপন্যাস শেষ হয়, জীবন শেষ হয়, তবু সমালোচকের কথার শেষ হয় না। আর, কথা তো কত বিষয়েই আছে। যা কথা সব নিজের দোকানদারি? দোকানের বাইরে নেই কি খোলা মাঠ, পরমবিরাম সমুদ্র?

কি বলছে কিছুই শুনছে না পরমা। কি বলবে তারই জন্যে কান পেতে আছে।

দুটি সরু বালাই ডান হাতে, নড়াচড়ায় মাঝে মাঝে ঠুং ঠুং শব্দ হচ্ছে—বাঁ হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল পরমা। এখুনি যে এসে পড়বে অঞ্জলি-দীপালিরা। পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে যাবে। ঘণ্টাই যদি বাজিয়ে দেবে তবে কেন এই উৎসবের সুর? কেন তবে স্নানযাত্রা?

না, কথা বলতে চাচ্ছে বলুক—এমনি মনে হল পরমার। বলবার কথাটি ঠিকমত খুঁজে পাচ্ছে না বলেই মামুলি চালাচ্ছে। ছিট করবার আগে মাঠ

দেখে নিচ্ছে, বুক করে যাচ্ছে। ভক্তি খুঁজে পাবার আগে আওড়াচ্ছে মুখস্থ মন্ত্র। এসব কথা নয়, ধ্বনি, বোঝাবার জন্যে নয় বাজাবার জন্যে।

হঠাৎ বইয়ের থেকে মুখ তুলে নলিনেশ বললে, 'তোমার নামটি কি সুন্দর!'

'সে কথা আপনি প্রথম দিনই বলেছিলেন কলেজে।'

'হ্যাঁ, সেদিন নামটিকেই বলেছিলাম, আজ তোমাকে বলছি। কে রেখেছে তোমার নাম?'

'কে রেখেছে?' কৌতুকে পরমার চোখ জ্বলতে লাগল: 'কই, কোনোদিন জিগগেস করিনি তো!'

'মনে হয় আমিই রেখেছি।' বেশ বলতে পারল নলিনেশ।

'আপনি রেখেছেন' কথাটার পাশ কাটিয়ে দ্রুত সরে যাওয়া নয়, কথার গোলোকধাঁধার মধ্যে সাধ করে পথ হারানো।

তা ছাড়া আবার কে!' নির্জনতা ক্রমেই সাহস দিচ্ছে নলিনেশকে। বললে, 'তুমিও জান না এ নাম আমার রচনা।'

'এ নামে আবার বাহাদুরি কি!'

'প্রথমা নয়, মধ্যমা নয়, চরমা নয়—পরমা। তুমি এমন একটি বাতি যা নেভে না, দগ্ধ করে না, যাতে ধূমলেশেরও স্পর্শ নেই।' কথার পর কথা সাজাচ্ছে নলিনেশ, 'যা শুধু আনন্দের নিত্য আভাটি জাগিয়ে রাখে। তুমি অমৃতবর্তি—'

আমি মুণ্ডু—এমনি একটা কিছু বলে হেসে উড়িয়ে দিলেই হয়, তা নয়, বরং বলতে ভালো লাগল পরমার, 'এ তো আমার নামের অর্থ আমার নিজের কি!'

'ও, তুমি জানো না বুঝি ভক্তের কাছে নাম আর নামী একই বস্তু।'

'তবে ভক্তের আর ভাবনা কি। নাম নিয়ে থাকলেই তার চলে যায়—'

'চলে যায়। যা তত্ত্ব তাই ব্যক্ত। যা ব্যক্ত তাই তত্ত্ব। সূর্য তো প্রকাশ হয়েই আছে, আমারই শুধু চোখ খোলবার অপেক্ষা।'

শুধু চোখ খুললেই হবে? ঘরের জানলা-দরজা খুলতে হবে না? বাইরের আলোকে আনতে হবে না ঘরের মধ্যে?'

খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না নলিনেশ। সামান্য ছাত্রী সমুচ্চ পণ্ডিতকে পরাস্ত করল বোধ হয়।

এ যেন আর কিছু নয়—শুধু কথা-কথা খেলা। যাত্রারম্ভে তো মেঘের গর্জন শোনা যায় না দেখা যায় না বিদ্যুৎজিহ্বার কশা, তাই সব খেলা-খেলা মনে হয়। যে পথ কণ্টকসংকুল তাকেই মনে হয় কথার কুসুম দিয়ে

সুকোমল। কোথায় যে দুর্যোগের রক্তচক্ষু জেগে আছে তার আভাসটিও চোখে পড়ে না।

'কিন্তু যার ঘরদোর নেই?' আত্মস্থের মত প্রশ্ন করল নলিনেশ।

'সে ফাঁকা মাঠে গাছের খোঁজ করবে। রোদ মানেই ছায়া। শক্তি মানেই শান্তি।'

তার অর্থ, বলতে চাও, প্রেম মানেই বিয়ে? এমনি একটা কথা এসেছিল জিভে, সংযত করল নলিনেশ। তার মানেই চলে এস মাটি থেকে পাত্রে, জল থেকে বরফে, প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে—কিংবা সেই হৃদয়-ভরা কবিতার লাইনটা—অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ—সবই কেমন পুরোনো-পুরোনো ঠেকছে। নলিনেশ বললে, 'তার মানেই বীজগণিত খুঁজে বেড়াবে পাটীগণিতকে।'

এমন সময় অঞ্জলি-দীপালির দল এসে পড়ল। যূথিকা আর লিপিকা আর অর্চনা।

'ওমা, তুই এখানে?' তেরছা করে গালে সকলের হাত উঠল।

'কখন এলি শুনি?' বললে, একজন—শেষের জন, লিপিকা।

'এই তো খানিকক্ষণ।' এতটুকু ঢোঁক গিলল না পরমা।

'আমরা সব কত ব্যস্ত।' বললে অঞ্জলি, প্রথম জন।

'একটু দোকানে যেতে হয়েছিল।' একটা-কি ছবির ম্যাগাজিনের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে পরমা, 'তাই ঘুরে এসেছি।'

'আমাদের ভাবনা হল অসুখ করল নাকি?' এ দীপালির ভর্ৎসনা।

'অসুখ না সুখ?' লিপিকা একটু হেলে পড়ে বললে যূথিকার কানে কানে, 'দেখেছিস চেহারাটা কেমন আণ্ডারলাইন করেছে!'

যূথিকার আরেক কানে অঞ্জলি বললে, 'আর ঘরদোরের এ কি ভোলবদল!'

'কি করে এলি?' দীপালির প্রশ্ন সরাসরি।

'কি করে আবার!' ঘুরেফিরে একজনকে একদিকেই লক্ষ্য করছে দেখে বিরক্ত হল পরমা: 'কেন আমার দুটো পা নেই?'

মিথ্যেকথাগুলো দিব্যি বলে যেতে পারছে পরমা, কেননা একমাত্র যিনি খণ্ডন করতে সক্ষম, তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন, পরমা তাঁরই পক্ষে। আর ছোট ছোট এই মিথ্যেকথাগুলোকে নলিনেশ অনুভব করছে ছোট ছোট স্পর্শের মত। আর এও ভাবছে, মিথ্যেকথাই বা কি অপূর্ব করে বলতে পারে সত্যকথা! সন্দেহ কি, পরমার পক্ষেই নলিনেশ। পক্ষ দিয়েই সে ঢেকে রাখবে পরমাকে।

বক্তৃতার আশ্রয় নিল নলিনেশ যাতে এই সব ছোটখাটো প্রশ্ন ও তাদের ভিতরকার ভয়াবহ বিস্তীর্ণ ফাঁক সব ডুবে যায় একসঙ্গে। আর কথায় একবার পেয়ে বসলে নলিনেশ. কে না জানে, অতিমাত্রিক।

এক সঙ্গেই ফিরল মেয়েরা। এবং সারাপথ কচাল করতে করতে। যদি দোকানেরই দরকার ছিল, কই কলেজে তো বলে নি। কেন, কাউকে স্লিপ দিয়ে পাঠিয়ে জানানো যেত না, কেন ওদেরকে বসিয়ে রাখল এতক্ষণ? নিত্যিকার যা ব্যবস্থা তার ব্যতিক্রমে কেন ওর উদ্বেগ হবে না? বা, দুর্ঘটনা হতে নেই? যদি হঠাৎ দরকার পড়ে, জানাবার সময় না থাকে লোক না থাকে, যেতে পারব না দোকানে? কিন্তু কিনবে কে, কিনবে কি, জিনিস কই? বা, কিনতে হবে এমন কি মাথার কিরে আছে, জিনিস যদি পছন্দ না হয়, যদি দরে না বনে। তার মানেই তাই। যা নৈবেদ্য তাই চালকলা। তবুও ছাড়ান নেই। সময়ের হিসেব, দোকানের দূরত্ব, জিনিসের প্রয়োজন অথচ তা না-কেনা এই সব চুলচেরা বিশ্লেষণের পরে একটি স্থিরসিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত। সেটি হচ্ছে বন্ধুদের প্রতি তাচ্ছিল্য। বন্ধুদের টেক্কা মারার চেষ্টা।

'বুঝলি না, আমরা বাজে তাস দুরি-তিরি আর ইনি একেবারে রঙের টেক্কা।' টিপ্পনী কাটল যূথিকা।

'এ দিয়ে কি হবে? বেশি নম্বর পাবে?' অর্চনা চোখ টিপল।

'আর ওঁরই বা এই বিবেচনা কেন? কোচিং ক্লাসের ঘণ্টা একলা পরমার অনুকূলে বাড়বে কেন?' টাকাপয়সার হিসেবের কথা তুলল দীপালি।

'বা, একস্ট্রা পেমেণ্ট আছে যে পরমার—' লিপিকা তুলি বুলোল।

'তাই পেয়েই ভুলেছেন ভোলানাথ। সেটা বুঝি গাঁজার কলকে। তাই আঁখি ঢুলু-ঢুলু—'

'ছি ছি, তোদের একটু লজ্জা করল না?' পরমা খাপ্পা হয়ে উঠল: 'একজন গণ্যমান্য গুণী লোক, গুরুজন, তাঁকে টানছিস?'

'যা টানবার তুইই টানবি?' অর্চনা বললে, তার আগের কথার খেই ধরে।

'তাই এত সাজগোজ—'

'এই মেঘডম্বর—'

'রণবেশ—'

'বা, আমি সাজতে পারব না?' মুখিয়ে উঠল পরমা।

'এ তো ছাত্রী হয়ে যাওয়া নয় পাত্রী হয়ে দাঁড়ানো,' অঞ্জলি বললে।

'বেশ তো একশোবার দাঁড়াব।' আগুনে ঘিয়ের মত জ্বলে উঠল পরমা: 'তোদের কে বারণ করছে? তোরাও যা না, দাঁড়া না গিয়ে!'

'আমরা কি ময়না না টিয়ে! না কি ময়ূর!' বললে অর্চনা।

লিপিকাকে চিমটি কেটে যূথিকা বললে, 'আমরা হচ্ছি কাক। আমাদের কি শিস আছে না পেখম আছে!'

'ছিরি আছে না ছাঁদ আছে! ঢঙ আছে না ঠাট আছে!' এ যোজনা লিপিকার।

'তা ছাড়া আমাদের বাগানে কি গন্ধরাজ ফোটে!' দীপালি ঠোঁট বেঁকাল।

গন্ধরাজ! বুকের মধ্যে টুং করে বেজে উঠল পরমার।

'দেখলাম যে তাঁর টেবিলে।' দীপালি বললে, 'তুই না দিলে ও এল কোত্থেকে? তোর বাড়িই তো গন্ধরাজের জন্যে প্রসিদ্ধ।'

চট করে খোঁপায় হাত দিল পরমা। আশ্চর্য, খোঁপায় ফুল নেই।

খুট খুট খুট খুট—হৃৎপিণ্ড কাটাকাটা শব্দ করতে লাগল। যেন আর পিয়ানোর আওয়াজ নয়, ঘোড়ার খুরের শব্দ। যেন নির্জন পথের উপর দিয়ে কে আসছে ঘোড়ার উপর চড়ে। শোনা যাচ্ছে তারই এগিয়ে আসার আওয়াজ।

কখন হাত বাড়িয়ে খোঁপার থেকে তুলে নিয়েছেন অলক্ষ্যে। তারপর টেবিলের উপর রেখে দিয়েছেন। কি আশ্চর্য, একটুও টের পায়নি তো, আঙুলের কি নিপুণ কারুকলা! কই দেখেওনি তো টেবিলে। চোখ কি পরমার সব সময়ে বইয়ের দিকেই ছিল না কি তাঁর মুখের দিকে। আর, দেখতে পেলে কি করত শুনি? রুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করত কেন চুলে হাত দিয়েছেন? না কি নিজের জিনিস নিজেই ফেরত নিয়ে আসত চুরি করে? যদি ধরা পড়ে যেত সকলের সামনে, যদি তিনি হাত চেপে ধরে বাধা দিতেন? না কি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত বাইরে? টাটকা গন্ধভুরভুর ফুল কি বাইরে ফেলে দেবার! না কি যেমন ছিল তেমনি থাকতে দিত টেবিলে? লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত সে মুগ্ধ চোখে।

যে ছোঁয়া তখন টের পায়নি তারই শিহর যেন লাগল তার চেতনায়। দূরশ্রুত কোন গান যেন শূন্যে মিলিয়েও শূন্য হয় না।

কিন্তু মেয়েদের জিভে যখন একবার শান পড়েছে তখন তারা লকলক লকলক করবেই। ছোট ছোট কথার ছোট ছোট কাদার দাগ ছিটতে লাগল চারদিকে। পরমা ভাবল, আর যাব না, কোচিং ক্লাস থেকে নাম কাটিয়ে দেব, খুব মান হয়েছে, দরকার নেই আর অনার্সে।

কিন্তু পরদিন যথাসময়েই আবার হাজির হল পরমা। যথাসময়ে মানে আগে আগে।

আজকে তার পোশাক সাদামাটা, চুল আবাঁধা। আব গন্ধরাজের গুচ্ছ সে হাতে করে ধরে এনেছে সারাপথ।

কিন্তু ঘরদোরে আজ আবার এ কি ভোজবাজি!

'কি হল, ঘরদোর এমন অগোছাল যে?' ঘরে ঢুকলে যে কেউই এ প্রশ্নই প্রথমে করবে। ভয়মাখা চোখে পরমা তাকাতে লাগল এখানে-ওখানে কোন জিনিস খুঁজে পাচ্ছিলেন না বুঝি? না কি ইঁদুর না সাপ?'

নলিনেশের চোখে ভয় নেই, কৌতুক। দেখাদেখি পরমাও চোখের তাকানোটা তরল করল।

বললে নলিনেশ, 'তুমি কাল বলেছিলে না তোমাকে জানালে তুমিই নিজে এসে গোছগাছ করে দিতে তাই জিনিসগুলি শখ করে বিশৃঙ্খল হয়ে রয়েছে। তোমার হাতের স্পর্শের ধ্যান করছে বোধ হয়।'

'দাঁড়ান, দিচ্ছি গুছিয়ে। ত্বরান্বিত হবার ভাব করল পরমা। বললে, 'নিন ফুলগুলি ধরুন।

'ফুল!' যেন প্রথম দেখছে এমনি গোবেচারা মুখ করল। বললে, 'এ ফুল আমার? আমাকে দিচ্ছ?'

'তবে আর কাকে! নিন ধরুন। ছাই একটা ফুলদানিও নেই আপনার ঘরে!'

যেমন প্রসাদ নেয় তেমনি দুটি হাত জোড় করে নিল নলিনেশ। বললে, 'পাওয়াতেই সুখ জমানোতে নয়। যে পেয়ে সুখী তার মন কাব্যের আর যে জমিয়ে সুখী তার মন বাণিজ্যের। আমরা বাণিজ্যের ঘরে নই, আমরা কাব্যের ঘরে।'

'কাল বুঝি চুরি করেছিলেন খোঁপার থেকে?' চোখে কালো কটাক্ষ পুরে জিগগেস করল পরমা।

তার দুঃখে বিমর্ষ হয়ে আছি।' কিন্তু আজ তোমার অকৃপণ অমৃতবর্ষণে আমার সে লজ্জা মুছে গেল ধুয়ে গেল-'

তার মানে, চুরির জন্যে পুরস্কার পেলেন।' কালো চোখের সূক্ষ্ম কটাক্ষ আরো একটু ঘন হল। পরমুহূর্তেই হালকা হবার চেষ্টা করে বললে 'যাই, আপনার ঘরের রুগ্নতাকে সুস্থ করি।' আঁচলটা কোমরে রাশীভূত করে স্তূপীকৃত বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাত দিল পরমা।

'কিন্তু আমি তোমাকে কি পুরস্কার দেব? নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন গ্রাম্য ও স্পষ্ট শোনাল নলিনেশকে।

'বলব?' চোখের পাতা কাঁপতে লাগল পরমার, 'কিন্তু অপরাধ হয়ে যাবে। কনটেম্পট হয়ে যাবে।'

'বলো।' ভাবখানা তোমার সাতখুনের একটাও আমলে আনব না।

'পরীক্ষার খাতায় নম্বর একটু বেশি দেবেন।'

গম্ভীর হয়ে গেল নলিনেশ। বললে, 'আমার হাতে নম্বর নিয়ে কি হবে? শেষ পরীক্ষায় ভাগ্যের হাতে নম্বর নিতে পারো তবেই তো পাস।'

কথার পিঠে কথা, বলে ফেলল পরমা, 'কে জানে আপনিই আমার ভাগ্য।'

কাজ সেরে স্থির হয়ে বসল পরমা। এবার একটা কিছু পড়া আরম্ভ হোক।

প্রদোষের প্রচ্ছায় থেকে চলে আসুক দিনের আলোর সারল্যে। আলো-ছায়াফেলা বনের সংকীর্ণ পথ থেকে প্রকাশ্য প্রশস্ত রাজপথে।

বই অবিশ্যি একটা হাতে নিয়েছে নলিনেশ কিন্তু তার কথাটা একেবারেই বই ঘেঁষে এল না। এল ব্যক্তি ঘেঁষে। তাও শাখায় পল্লবে নয়, একেবারে শেকড় ধরে।

নলিনেশ জিগগেস করল, তোমার কে কে আছে?

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল পরমা। পরে চোখ নামিয়ে একটি বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে বললে, 'কেউ নেই।'

এইখানেই শেষ করে দিতে পারত কথাটা কিন্তু সাহসের অন্ত নেই পরমার। এই সাহসেই সে উজ্জ্বল এই সাহসেই সে ধারালো। চোখ তুলে বললে, 'আপনার কে কে আছে?

এক পলক দ্বিধা করল না নলিনেশ বললে 'আমারও কেউ নেই। সেই দিক দিয়ে আমার তোমার ষোল আনা মিল। পরে একটু দার্শনিক হবার চেষ্টা করল, 'আসলে কারুরই কেউ নেই—প্রত্যেকেই আমরা বিশুদ্ধ রূপে নিঃসঙ্গ, নিঃশেষরূপে নিঃসঙ্গ। কিন্তু আমরা যখন সামাজিক জীব বাস্তবে আমাদের কিছু কাছাকাছি লোকজন থেকে যাবেই। সেই দিক থেকে জানতে চাই তোমার নিকট-আত্মীয় কে কে আছে, কে তোমার অভিভাবক—

গড়গড় করে বলতে লাগল পরমা, এতটুকু ঠেকল না। ঘরের কথা না পরের কথা কিছু ভাবল না দিশপাশ। যেন সব বলা যায়, বলা শেষ হয়ে গেলেও যা না-বলা থাকে তাও যেন না-বলবার নয়। বিরলে বসে যে অন্তর্যামীর শোনবার কথা, প্রতিকার করুন আর নাই করুন, সে যেন এইখানে।

যেমন প্রত্যেক মধ্যবিত্ত সংসারীর লক্ষ্য দাদামশাইও বেশ ভালো

ঘর-বর দেখেই মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন ফরেস্ট-অফিসার, বিয়ের ছ বছর পর কি একটা বুনো জ্বর হল, আটচল্লিশ ঘণ্টা অজ্ঞান থেকে মারা গেলেন। আমার বয়স তখন প্রায় পাঁচ আর আমার ছোট ভাইয়ের দুই। মায়ের কি মতি হল ভাসুরের সংসারে না গিয়ে এলেন তাঁর বাপের বাড়ি। আর এমন বিধিলিপি, পরের বছরই দাদু চোখ বুজলেন। দিদিমা থেকেই বা কি না-থেকেই বা কি, অনুগমন করলেন স্বামীকে। আমরা পুরোপুরি মামার বুড়ো আঙুলের তলায় এসে পড়লাম। শাসনে-শোষণে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে লাগলাম। শাসনের সঙ্গে আওয়াজ মিলিয়ে শোষণ বলছি না, সত্যিসত্যি রাহাজানি। শাসন করবেন পীড়ন করবেন যুক্তিহীন কড়াক্কড় করবেন, এ না হয় বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু তাই বলে লুট, হরির লুট?

'কে তোমার মামা?' কাহিনীটা শেষ না হতেই কৌতূহলের খোঁচা মারল নলিনেশ।

'আমার মামাকে চেনেন না? মণিলাল হাজরা—'

'বা, উকিল মণিলালবাবু? আমাদের কলেজ কমিটির মেম্বর?'

'তিনি কিসের মেম্বর নন? খেলার মাঠ থেকে কংগ্রেস, ব্যাঙ্ক থেকে পৌরশালা, এ আর পি থেকে শ্মশান, সর্বসভার শোভাধর তিনি। এবং সবখানেই তাঁর ছাড়পত্র—তদবির। ওকালতিতেও তাই। উকিল শুনি হয় আইনে, ইনি উকিল তদবিরে। পৃথিবীতে এতদিন বীরেরই মূল্য জানতাম, এখন দেখছি তদবিরের। সাফল্যের হাতি বাঁধা সদরে নয়, খিড়কির দরজায়।'

তারপর বলো কি বলছিলে লুটতরাজের কথা।

বাবা বিবেচক ছিলেন, বিয়ের পরেই মোটা অঙ্কের করেছিলেন ইনসিওর, পৈত্রিক এজমালি ভূসম্পত্তিও মন্দ ছিল না। সব চলে এল মামার জিম্মাদারিতে। মামা আদালতে দরখাস্ত করে আমাদের অভিভাবক হলেন, আমাদের দুই অপোগণ্ড নাবালকের, আমার আর আমার ছোটভাই মলয়ের। মা মেয়েছেলে, অভিভাবকের অ বা আইন-আদালতের আ বোঝেন না, মামাই তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। আজ নাবালকের এটা দরকার, কাল ওটা দরকার—খোরপোশ, লেখাপড়া, প্রাইভেট টিউটরের মাইনে, বইয়ের দাম, চিকিৎসা, হেন-তেন, নানান বায়নাক্কায় টাকা তুলতে লাগলেন, মুঠ-মুঠ টাকা। প্রায় ঢাকের দায়ে মনসা বিকোনো। এও না হয় হল যেমন-তেমন, পরে রব তুললেন নাবালকদের মাথা গোঁজবার জন্যে একখানা বাড়ি করে দেবেন। রব তুললেন নীরবে, মানে শুধু আদালতের

কাজে কাজে। ভাঁওতা মেরে এজমালি জমি-জমার অংশও মেরে দিলেন। এ নিয়ে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ কায়েম হয়ে গেল। এমনি করে আস্তে আস্তে সমস্ত নগদ টাকা জমি-জিরাত আত্মসাৎ করলেন। আমাদেরই টাকায় তাঁর নিজের পসার, স্ত্রীর গয়না, মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গেল। একখানা বাড়ি পর্যন্ত তুললেন, এখন শুনতে পাচ্ছি এ-বাড়ি মামীর বেনামীতে। যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয় চেয়াগদারের ঘোড়া। আমরা দুই ভাইবোন অবোলা দুই পশুর মত মূর্খ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

'আর তোমার মা?' জিগগেস না করে পারল না নলিনেশ।

'তিনি কি করবেন, রোদে-বাদলে সব সময়ে ঝুঁকে রইলেন দাদার দিকে। বললেন, এ দুঃসময়ে দাদা না দেখলে কোথায় ভেসে যেতাম নাবালকদের নিয়ে। মা যদি তেমন লেখাপড়া শিখতেন, যদি থাকত তাঁর বিষয়বুদ্ধি, যদি থাকত টাকা-পয়সা নিয়ে কাজকারবার করবার যোগ্যতা, তাহলে আমরা এমনিভাবে বয়ে যেতাম না। থাকার ঘর থেকে চলে আসতাম না না-থাকার ঘরে, আঢাকা মাঠের মধ্যে, রাস্তার কিনারে। আজ আমাদের বাড়ি নেই, ঘর নেই, টাকা নেই, কড়ি নেই—কিছু নেই। যার কিছু নেই, সে কি করবে? কিন্তু যার সব ছিল, অথচ যে লুণ্ঠিত, পর্যুদস্ত, সে কি চুপ করে থাকবে? কিন্তু বলুন, কোথায় জানাবে সে ফরিয়াদ, কোন আদালতে?'

'এখন তাহলে তোমাদের কি করে চলে?'

'এখনও আছে নিশ্চয়ই কিছু তলানি, তার থেকে। এ পর্যন্ত অপব্যয় করা দূরের কথা, স্বাধীনমত, যত সামান্য হোক, হাতখরচের টাকা কাকে বলে বুঝলাম না। তুচ্ছ খাতা পেনসিল কেনার খরচও মামা-মামীর মুখাপেক্ষা। অথচ সব আমার টাকা, কৌটো ভরা ঝাঁপি ভরা বাক্স ভরা। কে তার হিসেব দেখে, কে বা নেবে তার পাওনা বুঝিয়ে? সে-পাওনার ডিক্রিজারিই বা কোন কোর্টে, কোন জন্মে? গরুকে যেমন রাখাল মারে, কসাইয়ে মারে, তেমনি ড্যাবডেবে চোখ মেলে পড়ে পড়ে মার খেলাম। নাবালক, বাক্যহীন নির্বুদ্ধিতা, অসহায়ের জড়পিণ্ড, পরের কথায় বাহিত-চালিত হবার খেলনা। শুধু ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-প্রজার কথাই শুনেছেন, শুনেছেন অভিভাবক আর নাবালকের কথা?'

'এখন তবে উপায়?' নলিনেশের সুরে দুশ্চিন্তার টান।

'উপায়?' হাসল পরমা: 'উপায় আপনি।'

'আমি?' আদালতের লোকজন উঁকিঝুঁকি মারছে কিনা, সন্ত্রস্ত হল নলিনেশ।

'হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আর লোক কই?' হাসিতে আরো একটু প্রাঞ্জল হল পরমা · 'আপনি যদি ভালো নম্বর দিয়ে পাস-টাস করিয়ে দেন, তবে একটা চাকরি পেয়ে সুস্থ হই।'

'চাকরি?' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই আবার সাধ করে কথা ঘোরাল নলিনেশ 'মেয়েদের যে সনাতন চাকরি আছে, তাই নিয়ে ফেললেই বা মন্দ কি।'

'তাতেও টাকা লাগে।'

'টাকা লাগে?' যেন নতুন শুনছে নলিনেশ এমনি অবাক হবার ভাব দেখাল।

'লাগে না? সেই বি-এ, এম-এ পাশ মেয়েকেও দাঁড়াতে হচ্ছে পছন্দের বাজারে, দেখায় বটে দেখানো হচ্ছে না কিন্তু বিশেষ করেই দেখানো হচ্ছে। তারপর যদি-বা আগলটা কাটল, নগদ দাও, সোনাদানা দাও, তৈজস-আসবাবে ঘর ভরো। মেয়েরা শাঁখের করাত, পড়ানোতেও খরচ সরানোতেও খরচ। জুড়তে খরচ পুড়তে খরচ। মেয়েরা আগাগোড়াই একটা বকেয়া বাকি, একটা নিলাম-ইস্তাহার। তাছাড়া ' বলতে বলতে থেমে গেল পরমা।

যেন কি একটি গভীর কথা গোপন করছে এমনি শোনাল সহসা। এখনো গোপন করবার কিছু আছে নাকি। প্রদীপের পলতেটা উস্কে দিল নলিনেশ 'তাছাড়া- '

তাছাড়া আমি দেখতে কুচ্ছিত।'

'তাই নাকি?' নিশ্বাস ফেলল নলিনেশ।

'ঘরে-বাইরে সবাই তাই বলে।' স্বর গম্ভীর করল পরমা 'আমার কোনো ভাবঘাৎ নেই।

'অতীত আছে?'

আচমকা চোখের উপর চোখ পড়ল। লজ্জার ছোঁয়াচ লাগল কণ্ঠে। বললে, 'তাও নেই।'

'ঘরে না হয় মামা মামী আছে বাইরে শত্রু কে?'

'দেখুন না ক্লাসের মেয়েগুলো কাল আমার সঙ্গে কি ঝগড়া করল।'

'কি নিয়ে? তুমি কুচ্ছিত বলে?'

'প্রায় তাই। আমি অপদার্থ তবু আপনি আমাকে একটু স্নেহ করেন, তাই ওদের মর্মশূল।'

'করি না কি?' খেইভোলা বক্তার মত আমতা-আমতা করতে লাগল নলিনেশ 'কে বললে? কই আমি জানি না তো।'

লজ্জা পেল পরমা। কানের কাছের চূর্ণ চুলের ক্ষীণ গুচ্ছ দুটিও

যেন কুঁকড়ে গেল। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার নিজের প্রশ্নে: 'আমার কথাই এক ধামা শোনাচ্ছি আপনাকে। আপনার কথা বলুন—'

'আমার আবার কোন কথা!'

'বা. আপনার বাড়িঘরের কথা। কাছাকাছি লোকজনের কথা। বলুন না। শুনতে ইচ্ছে করছে খুব।'

কি অদ্ভুত সাহস! যেন জবানবন্দি নিচ্ছে। তারো চেয়ে বেশি। জবাবদিহি নিচ্ছে। সম্ভ্রান্ত বলে সমীহ করছে না। গণ্ডির বাইরে রাখছে না।

হাতের বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে নলিনেশ, 'আরেকদিন বলব।'

এখানেও ইতি টানে না পরমা। ঘাড় কাত করে বললে 'ঠিক বলবেন তো? হুবহু?'

'তুমি যদি শোনো—'

'শুনি মানে? গরু-ঘোড়া নই, কিন্তু কান দুটো আমার নড়ছে আগ্রহে।' হাসল পরমা।

নলিনেশেরই সাহস নেই। পাশ কাটাতে চাইল 'বলব আরেকদিন। এখন একটু পড়ি।'

কোন কবিতাটি পড়বে পৃষ্ঠা খুঁজে বের করছে নলিনেশ, কিন্তু চোখ কবিতার উপর না পড়ে পড়ল পরমার একখানি হাতের উপর। টেবিলের প্রান্ত পেরিয়ে ডান হাতখানি. হাতের অনেকখানি, পড়ে আছে শিথিল হয়ে। অনেক রিক্ত আর শ্রান্ত, উৎসুক অথচ উদাসীন। এ যেন আর এক রকম কবিতা। শুধু আত্মিক অনুভবের নয়, যেন তার চেয়েও বেশি, শারীর স্পর্শের। নলিনেশের ইচ্ছে হল ছোঁয়, ধরে, একটু বা ধরে থাকে। কোনো প্রকাশ্য ছুতো করে নয়. অসাবধানে ঘটে গিয়েছে সযত্নে এমনি একটা কৌশল তৈরি করে নয়, বেশ প্রশস্ত করে, প্রগাঢ় করে। নদীর উপর যেমন বৃষ্টি পড়ে, জলের উপর জল, তেমনি এক স্নিগ্ধতার সঙ্গে আর এক আর্দ্রতা মিশিয়ে দেয়. ঢেলে দেয় উপুড় করে।

না, থাক, কি হবে ওকে অকারণে ব্যস্ত করে? নীড়ের মধ্যে পাখা মুড়ে ঘুমিয়ে আছে পাখি, সংকীর্ণ অস্তিত্বের উষ্ণতায়, কি হবে ওর ঘুম ভাঙিয়ে? মুদ্রিত পাখায় চাঞ্চল্য এনে? এ প্রত্যক্ষ স্পর্শের কি ব্যাখ্যা, অনর্থক দুর্ঘটনা, না আশ্রয়-আশ্বাস, না কি শুধুই স্থূল ইঙ্গিত—এ বিচারের মধ্যে ফেলে ওকে ক্লান্ত করে কি লাভ? নির্জন হলেই পুরুষ

আত্মবিস্মৃত হয় এ পঙ্কিল প্রশ্নেরও বা অবকাশ রাখে কেন? না না না, নিজেকে সবলে সংযত করল নলিনেশ। যেমনটি আছে থাক তেমনটি। যেন দৈবপ্রেরিত সঙ্গীতের একটা সুর দেখছে। আগুনের সুর। আঙুল-গুলি কি নড়ে উঠল? কথা কয়ে উঠল? ডেকে ডেকে উঠল?

না, যেমনটি আছে তেমনটি থাক। শুধু থাক এই ক্ষণিক সখ্য, এই নিরলঙ্কৃত নিভৃতি। বেশি হলেই কি বেশি? বেশি ভাবতে পারলেই বেশি।

পড়া শুরু করল নলিনেশ।

হাত সরিয়ে নিল পরমা। জিগগেস করল, 'আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেছেন?'

যেন নড়া দাঁতে সজোরে কামড় পড়ল এমনি ভাব করল নলিনেশ। কিন্তু কি বলে উত্তরে। আর একদিন বলব বলা যায় না। পাশ কাটাতে গেলেই সটান ফেল। যখন বুঝেই নেবে তখন মুখোমুখি হওয়াই ভালো। 'করেছিলাম।' স্পষ্ট করেই বললে নলিনেশ।

'করেছিলাম মানে? মারা গেছেন স্ত্রী?' উকিলি জেরাকেও হার মানাল পরমা।

'প্রায়।'

'প্রায় মানে মরেও বেঁচে আছেন?'

'ঠিক উলটো। বেঁচেও মরে আছেন।'

'আরেকদিন বলবেন, বুঝলেন? ঐ কুঁদুলীরা এসে পড়েছে।' শাড়িতে সতর্ক কটা রেখা ফুটিয়ে অসম্পৃক্ত হয়ে বসল পরমা।

হুড়মুড় করে এসে পড়ল মেয়েরা।

'তোমাদের সকলের জন্যে পরমা একটা করে ফুল এনেছে।' সবাইকে একটা করে বিতরণ করল নলিনেশ। সবাই খুশির টাটকা রঙে ঝলমল করে উঠল। এত অল্পেই খুশি করা যায় মানুষকে।

সবাই যখন পেল, তখন সকলেই এক দলে, এক দখলে।

তবু তারই মধ্যে টিপ্পনী কাটে অঞ্জলি 'আমরা হচ্ছি ভাঁট ঘেঁটু আশশ্যাওড়া, আর ও হচ্ছে গন্ধরাজ—'

'গন্ধরানী বল।' এ চিমটিটা দীপালির।

'শ্রেষ্ঠ বোঝাতে হলে রাজাই উপযুক্ত।' বললে নলিনেশ, 'রানী শ্রেষ্ঠ নয়, রাজাই শ্রেষ্ঠ। রামপ্রসাদ বললে, রাজা আমার মা মহেশ্বরী—'

'তা হোক।' বললে যূথিকা, 'কিন্তু ও একাই শ্রেষ্ঠ হতে যাবে কেন? ও যদি গন্ধরাজ, আমরা কেউ রূপরাজ কেউ ছন্দরাজ কেউ বা কবিরাজ।'

'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—' লেজুড় জুড়ল লিপিকা।

'তার মানে,' অর্চনা লক্ষ্য করল নলিনেশকে, 'তার মানে এইখানে রাজা আপনি।'

সবাই হেসে উঠল। বয়ে গেল এক ঝাপটা সুগন্ধের হাওয়া।

'তার মানে,' আরো জের টানল অর্চনা: 'এই রাজত্বে সকলের অধিকার। কোথাও এতটুকু পাখাপাতা নেই, অর্থাৎ পক্ষপাত নেই—সমদর্শন।'

আবার হাসল মেয়েরা। পরমাও হাসল।

ফেরবার পথেও হাসির জলস্রোত।

'ওরে, ওকেই ধর। ওই আমাদের মুরুব্বি—'

'মোটেও না। ও আমাদের সই।' যূথিকা ঢলে পড়ল।

'শুধু সই না, ও আমাদের মই।' বললে অঞ্জলি 'ওকে ধরেই আমাদের ওঠা, আমাদের পার হওয়া।'

এতটা যেন সহ্য হল না লিপিকার: 'কেন, এত কেন? আমরাও সব মা-ষষ্ঠীর সন্তান। সবাই এক পদার্থ দিয়ে তৈরি।'

'অন্তত সবাই আমবা এক নৌকোব সোয়ারি।' লেজুড় জুড়ল দীপালি: 'এক ঝাড়ের বাঁশ।'

'কিন্তু,' খিলখিল করে হেসে উঠল অঞ্জলি, 'কিন্তু ঐ এক ঝাড়ের বাঁশে কাউকে দিয়ে মা-দুর্গার কাঠামো কাউকে দিয়ে হাড়িমুচির ঝুড়িডালা।'

'ফল পৃথক হোক,' গম্ভীর মুখ করে বললে অর্চনা, 'কিন্তু আমাদের এক যাত্রা।'

চোখে মুখে সায় দেয়া হাসি থাকলেও পরমা কি মনে মনে আরো বেশি গম্ভীর? সে কি জলের কাছে এসে একটা সাঁকো খুঁজে বেড়াচ্ছে?

'সুন্দর বলেছিস,' বললে পরমা, 'আমাদের এক যাত্রা। এক দুর্লভ আবিষ্কারের জন্যেই আমাদের মহৎ অভিসার।'

পরদিন নির্ধারিত সময়ের যেমন আগে আসে তেমনি এসেছে পরমা, কিন্তু একি, দোরগোড়ায় ঘুরঘুর করছে অর্চনা।

'তুই!'

'ফল পৃথক হোক কিন্তু যাত্রা এক।' হাসি লুকোবার জন্যে আঁচলের ডগাটা মুখের কাছে তুলল অর্চনা।

'বেশ তো, আয় না। এক বুদ্ধি ভালো দুই বুদ্ধি আরো ভালো।' পরমা বললে।

একটা সঙ্গত কারণ দেখানো উচিত। তাই বললে অর্চনা, 'একটু এ পাড়ায় এসেছিলাম। জানিস তো এই দিকেই আমার মাসিমার বাড়ি। পেলাম না মাসিমাকে, তাই ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে তোর জন্যে অপেক্ষা করি।'

'কারণ ছাড়া কে আর আগে আসে?' পরমা গলা নামাল: 'এখন ভাবছি ভদ্রলোক না বেশি চার্জ করে বসেন। এক ঘণ্টার কথা, এখন প্রায় দেড় ঘণ্টার দাখিল—'

'তুই যদি একস্ট্রা দিস আমিও দেব না হয় ধারধুর করে।'

'বা, দুজন এক সঙ্গে!' উদ্বেল কণ্ঠে অভ্যর্থনা করল নলিনেশ। অর্চনার মনে হল এ আসলে হতাশার সুর, দুজনকে এক সঙ্গে দেখে ম্লান হয়ে গিয়েছে মনে মনে। আর পরমার মনে হল আসলে এ সুর উল্লাসের, অর্চনাই বা কি কম বাঞ্ছনীয়! অর্চনাই তো ক্লাসের সেরা মেয়ে। তাছাড়া দেবতারও অগোচরে কখন কোন চক্ষের স্পর্শে হৃদয়ের কনকদ্বার খুলে যায় কে বলতে পারে।

এক দেশের বুলি আরেক দেশের গালাগাল। একজনের উল্লাস আরেকজনের হতাশা।

সেদিন আর সেই পরিবেশ কই? শুধু পড়া আর ব্যাখ্যা, শুধু বাক্যের ঝিকিমিকি। যেন রুদ্ধদ্বার পাষাণের ঘরেব মধ্যে মুক্তির অপেক্ষা করছে পরমা। শুধু একটা শুকনো প্রান্তর ধু ধু করছে বাইরে, যতদূর চোখ যায় এক কণা ঘাস নেই, আশা নেই। শুধু শূন্যতার ঢালা অন্ধকার।

'এই পর্যন্ত থাক।' উঠে পড়ল নলিনেশ।

ফিবে যাবার আগে একটু বোধ হয় পিছিয়ে থাকছিল পরমা। একটু উসখুস, একটু বা গড়িমসি। সমস্ত দিনটা বৃথা গেল সেই দীর্ঘশ্বাসটি জানাবার জন্যেই এই চাঞ্চল্য।

টুক করে নলিনেশ কখন কাছে চলে এল বললে অস্ফুটে, 'আগে আসাব চেয়ে শেষে যাওয়াটাই বেশি দামি।'

'শেষে যাওয়া?'

'হ্যাঁ থেকে যাওয়া '

কষ্টে একটু হাসল পরমা। তাকাল অগ্রবর্তিনীদের দিকে। বললে, 'তার আর সুবিধে কই?' বলে খাতা-বই গুছিয়ে নিয়ে সঙ্গ ধরল বন্ধুদের।

ছি ছি ছি, নলিনেশের মন অশান্তিতে ভরে উঠল। কেন অমন করে আদরভরা ধূসর সুরে কথা বলতে গিয়েছিল সে? কেন আবার নিরীহ মৃগশাবককে ব্যস্ত করল অকারণে? কেন আবার দিল তাকে নিজের

পরিমিত আয়তন তোলবার যন্ত্রণা? আবার একটু গম্ভীর হতে হল পরমাকে, অন্তরের গভীর থেকে টেনে বের করতে হল নিম্নস্বরের গাঢ়তা। চোখে মুখে আনতে হল ক্লেশের কাঠিন্য! কেন, কেন সে কষ্ট দিল পরমাকে? ভয়ের কষ্ট অস্পষ্টতার কষ্ট। কেন সে থাকতে দিল না জাগ্রত ঘুমের মধ্যে? দুপুরবেলা ঘন বৃষ্টির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে বিকেলে ঘুম ভাঙার পর যেমন একটা দ্বিধার ভাব হয় এটা সত্যি বিকেল না সকাল, সেই বৃষ্টিনেশাভরা অবুঝ ঘুমের মধ্যেই থাকতে দিল না কেন অনেকক্ষণ? কেন রূঢ় হাতে চকমকির পাথর ঠুকল?

নিজের কাছেই নিজেকে ছোট লাগল নলিনেশের। সেও কি ছোট ছোট হিসেবের ছোট ছোট সুবিধের দোকান খুলেছে? ছি ছি, এবার থেকে পরমাকেও কি সে নিযুক্ত করবে সুবিধের সন্ধানে? শিকারী হয়ে হরিণকে সে বলবে তুমি গহনবনে যতই পালিয়ে বেড়াও না কেন তুমিই তৈরি করে দাও আমার সন্ধানের সদুপায়? ছি ছি, সে কি শিকারী?

পরদিনও আগে আগে না এলে পারত। আজ ধরা পড়ল দীপালির কাছে।

'তোরও এ-পাড়ায় মাসির বাড়ি নাকি?' ঘরে ঢোকবার মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়েই পরমা বললে।

গলার স্বরে যে কাঁটা আছে সেটা নির্ভুল বিঁধল দীপালিকে। বললে, 'বাড়ি মাসির না থাক কিন্তু রাস্তা তো মামার। বাড়িতে না হয় খিল পড়ে, কিন্তু রাস্তা তো চিরন্তন খোলা।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেই এসেছিস নাকি? আয় ভিতরে।' পরমা এগুলে ঘরের দিকে।

বুঝতে পারল, মেয়েদের সার্থক যে ভূমিকা, সেই চরবৃত্তিতেই নেমেছে বন্ধুরা। তাকে একলা থাকতে দেবে না কিছুতেই। পাছে নতুন কোনো ইঙ্গিত সে কুড়িয়ে নেয় নতুন কোনো আলোর সবলতা। পাছে এক যাত্রায় পৃথক ফল চেয়ে বসে।

শুধু কি প্রশ্নপত্রের বেলায়, শুধু কি পরীক্ষার ক্ষেত্রে? কে না জানে মেয়েদের প্রশ্ন আরো গহন তাদের পরীক্ষার ক্ষেত্র আরো দূর-স্থূল।

ঘরে ঢুকে বইখাতা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে পরমা বললে, 'এক রতি সোনা তায় ত্রিশজন স্যাকরা।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল নলিনেশ, কি ব্যাপার বুঝতে পারল না। পরে ঘরের বাইরে চোখ পাঠিয়ে দেখতে পেল আর এক অঞ্চলের আভাস। মুহূর্তে খোলসা হয়ে গেল।

কিছু বলবে না ভেবেছিল তবু সমস্ত ভাবনা ছাপিয়ে এসে পড়ল কথা।। কথাই কথাকে টেনে আনে। ইশারাই সাড়া আনে ইশারার। সামান্য কথা, কিন্তু কি তার অসহ্য শক্তি! সাধ্য কি তুমি স্তব্ধ থাকো। কথাই তোমাকে কথা কইয়ে ছাড়বে।

'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হলেও অনেক স্যাকরাতে সোনা নষ্ট হয় না।' পরমার হাসি-হাসি মুখের পর হাসি-হাসি চোখ ফেলল নলিনেশ : 'শেষ পর্যন্ত একজনের গায়ে গিয়ে ওঠে।'

কিন্তু রাগের ঝলস যায় না পরমার। হাসি-হাসি মুখেই সেই তপ্ত ঔজ্জ্বল্যটুকু বাঁচিয়ে রেখে বললে, 'আপনি তো কানকাটা সোনা। কানকাটা সোনা কি কেউ গায়ে পরে?'

কথাটা কি অপমানের মত লাগল না? প্রায় গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার মত?

তাই তো লাগা উচিত। কিন্তু নলিনেশের মনে হল এ প্রায় আত্মীয়-স্পর্শ, সুহৃৎ-সম্ভাষণ। সংঘর্ষ যে করে সেও তো নিকটেই আসে। অপমান তো সেই করতে পারে যে জানে অন্তরঙ্গ কথা, যে জানে গোপন ঘরের পরিচয়। বাইরে আপনার যে সুলভ চাকচিক্য আছে তা খাঁটি নয়, তা আবরণ মাত্র, আমি সেই আবরণের নিচে জেনেছি আপনার আসল তত্ত্ব— আপনার ত্রুটি আপনার দৈন্য আপনার গূঢ়াহিত হাহাকার। যে এভাবে বলে সে কি আঘাতের চেয়েও বেশি করে ছোঁয় না?

'কিন্তু সোনা সোনাই।' তৃপ্তির সুরে বললে নলিনেশ, 'শ্মশানে পাঠাবার আগে মৃতের দেহ থেকেও সোনাদানা খুলে রাখে। স্থানের বিচার কে করে যদি তার হৃদয়ের জিনিস সোনা হয়! এ কি, তুমি বাইরে কেন?' চঞ্চল অঞ্চল-ছায়াকে উচ্ছলকণ্ঠে ডাক দিল : 'এস ভিতরে এস।'

জ্বালা এখনো লেগে আছে পরমার গলায়। বললে, 'দেখবেন সোনা বাইরে ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দেবেন না যেন।'

'যে দুঃসাহসী গ্রন্থি দিতে জানে তার গ্রন্থির মধ্যেই সোনা।' বাইরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নলিনেশ বললে 'আসলে আমরা সোনাও চিনি না, পূর্ণ বিশ্বাসে পারিও না গ্রন্থি দিতে।'

কি দরকার ছিল এ কথাগুলি বলার! কথায় সাহস দেখানো খুব সহজ, তাই না? মনে মনে নিজেকে আবার সতর্ক করল নলিনেশ।

'আমরা আপনার সময়ের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করছি।' কুণ্ঠিত হয়ে বললে দীপালি।

'হস্তক্ষেপ নয়, পদক্ষেপ।' পরমা সংশোধন করতে চাইল।

'ও একই কথা।' দীপালি বললে।

'মোটেও না। হাত দিয়ে হাত চেপে ধরা আর পা দিয়ে পা মাড়ানো এক কথা নয়। পরমা হাসতে চাইল কিন্তু পারল না ফোটাতে।

তাই বলে দীপালিকে একা দোষ দিয়ে লাভ কি? পরমাও তো এক তুলিতেই বন্ড করা।

'তাই, চল, আমরা চলে যাই, সর্পিল দৃষ্টিতে পরমাকে আকর্ষণ করল দীপালি· 'ঠিক টাইম ধরে আসা যাবে আবার। তারপর হাত ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোচিং ক্লাসের পিরিয়ড শুরু হতে এখনো আধ ঘণ্টা বাকি।'

'যেতে হলে তুই যা। একেবারে ছেলেমানুষি ঝগড়াটে সুর বের করল পরমা।

'আপনিই বা কেন সিডিউলের আগে এভেইলেবল হন? এবার দীপালি লক্ষ্য করল নলিনেশকে কেন আগে থাকতে দরজা খোলা রাখেন? কেন বিশ্রামের ব্যাঘাত করতে দেন আমাদেরকে?

কথা বলার দরকার নেই তবু বলতে হয় কথা। অবশ্যই কথা বলায়। কঠিন বরফের মধ্যে কত বন্যা বাঁধা আছে তা বরফেরও জানা থাকে না।

না, না সে কি কথা।' আতিথেয়তায় উদ্বেল হয়ে উঠল নলিনেশ 'মাঝে মাঝে বিশ্রামের ব্যাঘাতটাই সত্যিকার বিশ্রাম। আর দরজা বন্ধ করে রাখি এমন বড় স্পর্ধা যেন না হয়। অবাঞ্ছনীয়কে যদি ঠেকাতে যাই তা হলে যে অভাবনীয়কেও হারাব। অন্তরের জিনিস বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। তাই যে আসে আসতে দাও যখন ইচ্ছে তখন। কে সত্যি অমৃতময় অবকাশ হয়ে উঠবে কে জানে।'

গ্যাঁট হয়ে বসল দীপালি। সামনে একটা টুল ছিল তার উপর। রাগে সেও যথেষ্ট স্ফীত হয়েছে টুলটাকে মুছে ফেলেছে এক পোঁচে। বললে, 'একজনের যদি অধিকার আছে আর একজনেরও আছে। পরিচ্ছন্ন মাঠ আর অপক্ষপাত। সমান যখন মাইনে তখন সমান সুযোগ। আপনার দিক থেকে বলছি না আমাদের দিক থেকে। বিশেষত আমরা যখন এক মামলার আসামী।

মেয়েটা কি বোকা। পরমার সারা শরীর রি-রি করে উঠল। এক টিকিট যখন কেটেছে তখন উঠবে না হয় সবাই এক ক্লাসে কিন্তু সবাই যেন জানলা পাবে। এমন কামরা ভাবো তো যেখানে সকলের জন্যে জানলা। এমন থিয়েটার ভাবো তো যেখানে রঙ্গমঞ্চ থেকে সমান দূরত্ব রেখে বসতে পারে দর্শক। খেতে সবাইকে সমান দিলে কিন্তু খিদে সবাইকে কে সমান

দেয়, কে বা দেয় হজম করবার সমান শক্তি। যেন প্রবেশে সমান অধিকার থাকলেই আবেশে থাকবে সমান নৈপুণ্য। যেহেতু সবাই এক পড়া পড়ছে এক মাইনে দিয়ে, সবাই এক সঙ্গে এক ব্র্যাকেটে প্রথম হবে। যেহেতু সবাই সেজেগুজে বসেছে সার বেঁধে সবাইকেই ভালো লাগবে। যেন সকলের মধ্যে থেকেও এমন বিশেষ একজন হতে নেই যে অনুপম যে অদ্বিতীয়। যে একমুঠো বালির মধ্যে থেকেও এক কুচি হীরে।

এমন ছেঁদো কথাও কেউ বলে। এমনি আভাভরা অর্থভরা চোখে তাকাল পরমা।

এখন কি কথা বলে নলিনেশ, কি কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে, পরমা ও দীপালির মধ্যে, একটি সমান রেখা বজায় রাখে? কাল অর্চনার বেলায় যা করেছিল তাই করবে? যুদ্ধের কথা দুর্ভিক্ষের কথা, গণ-আলোড়নের কথা—এই সব কাগুজে ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চালাবে, না কি খুলে ধরবে কবিতার বই, না কি চুপ করে থাকবে?

চুপ করেই থাকি। বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটাই। নয়তো পাশের ঘরে গিয়ে গা ঢাকা দিই।

ছি ছি, যে স্তব্ধতা কত মহৎ অর্থ বহন করতে পারে যে একটি অশ্রুতগম্য সঙ্গীত তাকে এমন করে অপব্যয় করা উচিত হবে না। তার চেয়ে কথা কই। বরং পরমার মুখে এখন যে একটি অহেতুক বেদনার ছায়া পড়েছে কথার ফাঁকে-ফাঁকে সেই নম্র ছায়াটি দেখি। এমনি দেখাটা দেখা নয়, দেখা যাবেও না, ফাঁকে-ফাঁকে দেখাটাই দেখা। যেন পাতার ফাঁকে-ফাঁকে দেখছি দূরের চন্দ্রোদয়।

সেদিন ক্লাস যখন ভাঙো-ভাঙো, অর্চনা ও-ঘর থেকে একটা মোটা বই নিয়ে এসে বললে, 'স্যার, আপনি হাত দেখতে জানেন?'

'হাত দেখতে?' আকাশপড়া আওয়াজ করল নলিনেশ।

'একগাদা বই যে আপনার এ বিষয়ে।' বললে অর্চনা 'কাল দেখেছি ঘেঁটে-ঘেঁটে। সব দাগানো, নোট করা। ভাসা ভাসা নয়, তলিয়ে দেখা। দেখুন না, একবার দেখে দিন না হাতটা'

'দেখুন না, দেখুন না' চারদিক থেকে হাত বাড়াল মেয়েরা।

'ও না! আমি কিছু জানি না দেখতে।' নলিনেশ সরাসরি কেটে পড়তে চাইল।

'জানেন না? তবে অত পড়াশুনো করেছেন কেন?' অর্চনা নাছোড়-বান্দা।

'ও শুধু সময় কাটাবার জন্যে। আর মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবার জন্যে

আমার হাতেও কিছু আসবে কি না কোনোদিন।' নলিনেশ প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'আছে কি না বিন্দুতম আশার ধূসরতম ইশারা।'

'দেখুন না আমাদেরও আছে কি না।'

'আমাদেরও আসবে কি না।' হাতগুলি লকলক করতে লাগল।

'তোমাদের তো দুটি মাত্র প্রশ্ন।' একটি হাতও স্পর্শ করল না নলিনেশ।

'দুটি মাত্র?'

'হ্যাঁ, এক প্রশ্ন, পাস করতে পারবে কি না। আর প্রশ্ন, বিয়ে, আই মিন, চাকুরি জুটবে কি না। চাকরি, আই মিন, বিনি পয়সার রাজভোজ।'

'বেশ তো, তাই বলে দিন না দয়া করে।'

'সে তো কপাল দেখেই বলা যায়।'

'কপাল দেখে?'

'হ্যাঁ, সকলের কপালই অন্ধকার।' নিজের মুখও অন্ধকার করতে চাইল নলিনেশ : 'কারু কপালেই নেই সূর্যবিন্দু—'

'সে তো সবাই দেখতে পাচ্ছে। এ বলায় বাহাদুরি কি' অঞ্জলি এগিয়ে এল 'হাত দেখে বলুন।'

'হাতের ধন হাতে রাখো। যার-তার সামনে বের করে ধোরো না। কখন কে গোপন কথা ফাঁস করে দেবে বিপদে পড়বে।' তা ছাড়া নির্লিপ্তভাব করল নলিনেশ : 'হাতি নিজের গা দেখে না। যে মহৎ তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। সে শুধু বর্তমানের কারবারী। বর্তমানেই তার ভবিষ্যতের ভিত। আর, না জানার মধ্যেই তো সুখ। কে প্রাণ ধারণ করত যদি সব জানা হয়ে থাকত। কবে মরব এ যদি নিটুট জানতাম আগে থেকে, তবে আর কিছু কাজকর্ম হত না, জীবন শুধু দিন গোনার ভয়ার্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ঈশ্বরে যে এত মজা তার কারণ তাকে কোনোদিন জানা যাবে না বলে। যদি সবাই জেনে ফেলতে পারত ঈশ্বরকে, তাহলে বেচারার হেনস্তার আর অবধি থাকত না। অতি পরিচয়ে সে নিতান্ত খেলো তুচ্ছ যৎসামান্য হয়ে যেত। না জানার মধ্যে সুখ-জীবনের নমস্কার—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু জানাতে হবে না আপনাকে' সবল। করবার সুরে বললে অর্চনা 'আপনি শুধু আমাদের মোটামুটি রেখাগুলো বুঝিয়ে দিন কোনটার কি সঙ্কেত—'

'হ্যাঁ, দিন, দিন—' গোপন কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবে হাতগুলি সংবৃত হয়েছিল, আবার সেগুলি দুলে দুলে উঠল। 'মোটে দুটি জানতে

পারলেও বেশ চাল মারা যাবে। বেআন্দাজী ঢিলও দু-একটা লেগে যাবে তাক বুঝে।'

'অন্তত কোনটা হেড-লাইন লাইফ-লাইন লাভ-লাইন—'

এটুকু আবদার না হয় মেটানো যায়। ভাসা ভাসা দুটো আপাত-সুন্দর কথা।

আচমকা একটা হাত টেনে নিল নলিনেশ, নমুনাটা স্পষ্ট করবার জন্যে প্রসারিত করে ধরল। বললে, 'এই দেখ, এইটে হচ্ছে হেড-লাইন, আর এটা লাইফ-লাইন—'

'স্যার, লাভ-লাইনটা কোথায়?' সব মাথা যেন একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ল।

সহসা নলিনেশের হাতের মধ্যে নমুনার হাতটা থরথর করে উঠল। তখনই বলেছি হাত কখনো দেখাতে নেই, কখন কোন রেখায় কোন প্রচ্ছন্নের ঘুম ভাঙে বলা যায় না। তাই বলে অত ভয় পাবারই বা কি হয়েছে? বিস্তৃত হাত সঙ্কুচিত হয়ে যাবার মতন এমন কি অঘটন! যতই হাতটা মেলে-মেলে দিচ্ছে নলিনেশ ততই তা বুজে-বুজে যাচ্ছে। ডগালো লতার কচি আগার মত কাঁপছে আঙুলের মাথা। যেন কি লুকোতে চাচ্ছে প্রাণপণে! কঠিন শিলালিপি হয়ে আর নেই, শিশিরমাথা পদ্মপাতা হয়ে গিয়েছে। যেন নলিনেশের হাতের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজছে।

অজান্তে এ কার হাত তুলে নিয়েছে নলিনেশ।

হাত ছেড়ে দিল তক্ষুনি। বললে, 'লাভের কি কখনো লাইন হয়? ও কি কখনো রেখা ধরে চলে? ওর হয় হুইর্ল, ঘূর্ণি।'

'আছে, আছে ও হাতে?' সকলে আবার উত্তেজিত হল।

'সেটা এত সূক্ষ্ম যে সাদা চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ লাগে।' কথার পিঠে আবার বলতে হল নলিনেশকে।

মেয়েগুলো তবুও চঞ্চল হয়ে রয়েছে, পরমাকে পারে যদি আরো একটু কোণে ফেলতে। তাই তাদের নিরস্ত করবার জন্যে নলিনেশ বললে, 'কখনো কখনো কারু কারু হাতে এত মোটা করে বোঝানো থাকে যে ম্যাগনিফাইং গ্লাসও লাগে না। দেখি তোমার হাত। দেখি—'

যার দিকেই হাত বাড়ায় সেই ভয় পেয়ে গুটিয়ে যায়। ওরে বাবা, পালাই। ইনি বলেন, শুধু রেখা নয় একেবারে ঘূর্ণাবর্ত। শেষকালে দু'কে পড়ে প্রাণ যাক আর কি।

সবাই বেরিয়ে গেল, কিন্তু পরমার ওঠবার নাম নেই।

'কি রে যাবি নে পরী?' রাস্তা থেকে ডাক দিল অর্চনা।

পরমা স্পষ্ট পাথরের গলায় বলতে পারল, 'না, আমার একটু দেরি হবে।'

হঠাৎ খেয়ালে সবাই বোধহয় দেখেনি পরমাকে। অঞ্জলি অর্চনাকে ঠেলা মেরে বললে, 'কি রে, চল—'

'দাঁড়া, পরমা আসুক।' অর্চনা বললে।

এবার অঞ্জলি হাঁক পাড়ল।

দিব্যি নিটোল গলায় বললে পরমা, 'আমার কাজ আছে। তোরা যা, আমি পরে যাব।'

'বুঝলি না, ও এখন অণুবীক্ষণ লাগাবে।' বললে যূথিকা।

ঘরের মধ্যে নলিনেশ হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে উঠল। হাতঘড়িটা পরতে পরতে ও টেবিলের তলায় পা দিয়ে জুতো দুটোকে টানতে টানতে নিজের মনে বলে উঠল, 'আমাকে এখুনি একবার ইস্টিশনে যেতে হবে। বিকেলের ট্রেনটার আসবার সময় হয়ে গিয়েছে? এই, এই রিকশা। এখন বেরুলে ধরতে পারব? ওরে ও চয়ন সিং—' চাকরকে ডাকতে লাগল · 'দরজাটা বন্ধ কর—'

'পালাচ্ছেন?' জিগগেস করল পরমা।

'না, হঠাৎ এক বন্ধুর আসবার কথা। যদি ইস্টিশানে দেখতে না পায় মহাকেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।' ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল নলিনেশ। রিকশায় চাপল। পিছনের পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে দেখল পরমা ঠিক তার বন্ধুদের সঙ্গ ধরেছে।

শুধু মুখে সাহস নেই বুকেও সাহস আছে। কি সুন্দর মার্জিত মসৃণ গলায় বললে, তোরা যা, আমি পরে যাব। তার মানে আমি একলা থাকব একলা হব কিছুক্ষণ। কি দুর্দান্ত বিদ্রোহ! ঠিক ঠিক কি জানি কথাটা! আমার কথা আছে নয়, আমার কাজ আছে। সন্দেহ কি, কথাই একটা প্রকাণ্ড কাজ। কখনো কখনো কাজের শক্তির চেয়ে কথার শক্তি বেশি জাগ্রত।

ধরো না কেন গান্ধীর ছোট্ট এই একটা কথা : কুইট ইণ্ডিয়া। এর মধ্যে কত তেজ, কত দীপ্তি। ন্যায়ের তেজ সত্যের দীপ্তি। সাধ্য কি প্রতিপক্ষ এর কোনো জবাব দিতে পারে। সাধারণ ভাড়াটের মত এও বলতে পারে না, দাঁড়াও, বাড়ি আরেকটা নিই খুঁজে পেতে। সেই মন্ত্র ততটুকু সময় দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত নয়। উচ্চারিত হয়েছে কি তুমি উৎখাত হয়ে গিয়েছ।

কি কথা না জানি বলত আজ পরমা! তার উপস্থিতির বাঁশিতে উঠত না জানি আজ কোন সুর! হয়তো কোনো কথাই বলত না, পারত না বলতে। তবু সেই স্তব্ধতাটিই শোনাত মন্ত্রের মত।

আজও অনেক ব্যস্ত করা হয়েছে অকারণে। প্রথমে দীপালির সঙ্গে ঐ সংঘাত, তারপর নিয়তির কি প্রবঞ্চনা, এত হাত থাকতে পরমার হাতখানিই তুলে নিল তার হাতে। এত বড হুকুমজারি করল কি না এই হাত থেকেই বের করো প্রেমের মুদ্রা। আর মুদ্রাকরের এমন প্রমাদ সেই হাত হাতের মধ্যে গলে গেল, মিশে গেল, ভরে গেল কানায় কানায়। হাতের মধ্যে শোনা গেল বুকের ধুকধুক। কোথায় বিজ্ঞানের হাত হবে, তা নয়, কাব্যের হাত হয়ে উঠল। সামান্য রেখায় যা আঁকা থাকার কথা তা ফুটে উঠল সমস্ত অস্তিত্বে।

কে জানে সমস্তই এক বাণ্ডিল স্নায়ু কি না! এক ঠোঙা রঙমশাল!

পরদিন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এল পরমা। এক সুতো এদিক-ওদিক নয়। কথায়-বার্তায় একেবারে মাপাজোকা, আঁটসাঁট। একটু কোথাও ঢিল নেই, সারা শরীরে যেন গুমোট করে রয়েছে। বুকের কিনারে শাড়ির পাড় বা কানের কিনারে চুলের গুচ্ছ যে নিপুণ অভ্যাসবশেই শাসন করা উচিত তাতে পর্যন্ত প্রযত্ন নেই। একেবারে নিভাঁজ গাম্ভীর্যে রেখারন্ধ্রহীন হয়ে বসে আছে।

এই তপ্ত গাম্ভীর্যটুকুই বা কি সুন্দর, কি সুন্দর বা ঠাণ্ডা কাঠিন্য। একবিন্দু শিশির নেই, দুপুরের উঠোনের মত খটখটে। যেন ভাবের লতা-পাতা নেই. পরিষ্কাব প্রস্ফুট ব্যাখ্যা। কাব্যের কুয়াশা নেই. যেন পদ্যের শব্দার্থ।

কেন তুমি গম্ভীর? কাল কেন আমার বিদ্রোহকে মান দেন নি, সকলকে প্রত্যাখ্যান করে একলা হতে চান নি কেন আমাকে নিয়ে? কেন তুমি স্তব্ধ? কাল কেন ভীরুর মত বাড়ি ছেড়ে নিজের এলেকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন? এমন কেউ যায়? আপনার ঘরে কি আগুন লেগেছিল? ঢুকেছিল কালনাগ? তাই দেখুন না, হাত টেবিলের উপর পর্যন্ত রাখি নি, কোলের শীতলে ডুবিয়ে রেখেছি। মন আর এখানে নেই, চলে গেছে মৌনের মহাদেশে।

সেই মহাদেশেই তো বেরিয়েছি ভ্রমণে।

যথাযুক্ত বই নিয়ে বসল নলিনেশ। পড়া শুরু করল।

তবু পরমার চাঞ্চল্য নেই। তার অমনোযোগই যেন আর-একটি কবিতা। মধুরের অঞ্জন যদি একবার চোখে লাগে তখন অনাকাঙ্ক্ষাও মধুময়। অসম্পৃক্ত হয়ে বসে থাকাটিও সংযোগ। তখন রাগও সুন্দর বিরাগও সুন্দর। প্রশ্নের চোখও সুন্দব প্রত্যাখ্যানের চোখও সুন্দর।

কতক্ষণ পরে পড়া বন্ধ করে নলিনেশ হঠাৎ হাঁক দিল: 'চয়ন সিং!'

চন্দন সিং থালায় করে এক স্তূপ রসগোল্লা নিয়ে হাজির।

'আজকে আর শুধু বাক্যের মিষ্টি নয় ভোজ্যের মিষ্টি।' বললে নলিনেশ।

'এর মানে? আজ কি ব্যাপার?' মেয়ের দল ঝটপট করে উঠল।

'কোনো উৎসব?' জিগগেস করল অর্চনা।

'উৎসব তো নিশ্চয়ই। ভাবলেই উৎসব। উৎসব ততক্ষণ যতক্ষণ উৎসব মনে।'

'আজ বোধ হয় আপনার জন্মদিন?'

'আমি হেন লোক তার আবার জন্ম?' নলিনেশ হাসবার চেষ্টা করল 'যখন বাড়ি করব এয়ার কন্‌ডিশান্‌ড বাথরুম হবে তখন করব জন্মদিন।'

'তবে উদ্দেশ্য নেই উপকরণ আছে?' অঞ্জলি বললে।

'বলতে পারো এ আমার সমদর্শন—সমানতন্ত্র।' ঘোষণার মত করে বললে নলিনেশ।

হৈ হৈ করে উঠল মেয়েরা। গুনে দেখল প্লেটে ছজনের জন্যে চব্বিশটে রসগোল্লা। ওরে বাবা, চাবটে করে প্রত্যেকে? তাও বসগোল্লা!

'হ্যাঁ, মিষ্টিমুখ বলতে রসগোল্লাই অব্যর্থ। কেননা বসগোল্লাই মুখভরা। কই, হাত লাগাও।' তাড়া দিল নলিনেশ।

বেরালের গলায় কে ঘণ্টা দেয়, সবাই হাত গুটিয়ে রইল। সব একেকটি লজ্জার লাটবহর। লাট যদি বস্ত্র হয বহব তাহলে বিস্তার।

'নে, হাত পাত।' বলা-কওযা নেই হঠাৎ পবমা এগিযে এল, যেন সেই খাওয়াচ্ছে এমনি সম্রাজ্ঞীর মত ভাব করে পবিবেশন করতে লাগল। তারপর নলিনেশের দিকে এগিয়ে এসে বললে, 'কই পাতুন হাত। ধরুন।'

অকিঞ্চনের মত হাত পাতল নলিনেশ।

চোখের কোণে কালো বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের বঙ্কিমা। পবমা বললে, 'খুব তো সমদর্শন। নিজেও তো নিলেন বড হাত পেতে। সুতরাং চব্বিশটে রসগোল্লা সাতজনের মধ্যে দিন সমান ভাগ করে।'

আমি কই নিলুম। তুমি দিলে। আমার জিনিসকে তোমার জিনিস করে ফেললে। এর কি আর ভাগ হয? তুমি একক, তুমি অখণ্ড।

দেখলি? আর-আর মেয়েরা চোখটেপাটেপি করল। দেখলি? কেমন আমাদের মাথার উপর দিয়ে ট্যানজেন্ট মেরে দিলে? আর দেখলি ভাগের

কারুকার্য? আমাদের পাঁচজনের প্রত্যেককে চারটে করে গিলিয়ে স্যারকে দিলে দুটো, নিজেও নিলে দুটো। স্যারে-ম্যাডামে সমতুল।

এখন এ. নিয়ে আপসোস করার মানে হয় না। তখন ঝাঁপিয়ে পড়লেই পারতে। নিলেই পারতে বিতরণের ভার। তোমার-আমার গরজ শুধু নেবার, দেবার নয়। যারা শুধু নেয় তারাই সমানাধিকার খোঁজে, আর যে দেয়, এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেয়, যে অগ্রণী, তার অধিকারই সর্বাগ্রে।

এখন জল! জল দাও।

গ্লাস মাত্র দুটো। একটা নলিনেশের জন্যে, আরেকটা মেয়েদের।

যেন পরমা ছাড়া আর কেউ দিতে পারত না, যেন কেউ আর নেই ধারে কাছে। ভাবখানা এমন যেন যত দায় আর গরজ পরমার নিজের। যেন সবাই তারা পরমার নিমন্ত্রিত।

দাঁড়া, আগে ওঁকে দিই।' যেন সমস্ত অন্নজলের বিধায়কই পরমা।

ঘরের কোণে ফুটো নর্দমার কাছে টুলের উপর জলের কুঁজো। কুঁজোটা সামান্য কাত করে একটু জল ঢেলে ডান হাতের আঙুলের ডগা কটি ধুলো পরমা। গ্লাসটা টেনে এনে জল ভরলেই হয়, তা নয়, কুঁজোটা নলিনেশের কাছে এগিয়ে নিয়ে তার হাতে-ধরা শূন্য গ্লাসে উপুড় করে ঢেলে দেবার ভীষণ শখ হল। খানিকটা জল গ্লাস ছাপিয়ে উপচে পড়ুক এই বুঝি অভিলাষ! যখন দিই কলসী কাত করে করে, গ্লাস মেপে মেপে দিই না, একবার উপুড় করে দিই, উজাড় করে দিই। এত প্রতীকের ব্যাখ্যা করেন, দৈবাৎ বোঝেন যদি এই নিদর্শন।

ডান হাতে কুঁজোর গলা ধরে নলিনেশের দিকে এগিয়ে গেল পরমা। হাত-বাড়ানো গ্লাসে জল ঢেলে দেবে, এমন সময় কি হল হাতের কুঁজোটা ভেঙে পড়ল মাটিতে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে করুণ আর্তনাদ।

কি হল? কি হল? সবাই ঘিরে এল পরমাকে।

পরমা পা চেপে বসে পড়েছে মাটিতে। কাঁপছে থরথর করে। শুধু কাটাছেঁড়া নয়, ডান পায়ের ছোট দুটি আঙুল, তৃতীয় ও চতুর্থ, থেঁতলে গিয়েছে। এত ডাকাবুকো মেয়ে, প্রাণে স্বাস্থ্যে রক্তিম, সে কি না যন্ত্রণায় এলিয়ে পড়ছে।

পায়ে জুতো ছিল না?

না, জল দেবার আগে খুলে নিয়েছে পা থেকে। আর জুতো তো ঐ স্যাণ্ডেল, থাকলেই বা কি হত? খুরতোলা কুঁজো, হোক না কেন পুরোনো বা তলা-ক্ষয়া, জলের ভার নিয়ে পড়েছে, লাগতই, বিশেষ যখন আঙুলসই

হয়ে পড়েছে। কিন্তু হাতে করে গলা ধরে তুলতে যাবার কি হয়েছিল? মেয়ে তো নয় ডাকাতের সর্দার। চয়ন সিংকে ডাকলেই তো হত। খাবারের থালা ও এনেছে, জলও তো ওরই দেবার কথা।

এ-সব কথা বলতে হয় বলছে যারা অক্ষম দর্শক। যারা বিব্রত দর্শক।

কিন্তু পরমা যে বসে থাকতে পারছে না। ঢলা পাতার মত এলিয়ে পড়ছে।

জল, জল নিয়ে এস। জলপটি দাও। পাখা কবো মাথায়। বরফ, ববফ পাওয়া যায় না? বরফ কোথায় মফস্বলে?

এখন বালতি বালতি জল আনছে চয়ন সিং। জলপটি দিচ্ছে নলিনেশ। মেয়েদের কেউ কেউ ধরে বসে আছে, কেউ নলিনেশের হাতে-ধরা পটির উপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঢালছে, কেউ বা পাখা করছে সজোরে। আর পরমা কাঁদছে, কাঁপছে, এঁকছে-বেঁকছে।

আঙুলের হাড় ভেঙে গিয়েছে বোধহয়। কিংবা তাবো চেয়ে বেশি কি না কে জানে। সন্দেহ কি, নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। ওবে ও চয়ন সিং, একটা রিকশা ডাক।

কানা ব্যথা পরিবেশটাকে ঠিক ঠিক বুঝতে দিচ্ছে না। শাড়ি শাযাব নিচের দিকের অনেকটা যে ভিজে গিয়েছে, চুলে-আঁচলে নেই যে সেই শিক্ষিত শৃঙ্খলা, এ এখন কে লক্ষ্য কবে! এখন শুধু যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নেই। নলিনেশ যে তাব বাঁ হাতেব পাযেব পাতাটা ধবে বসে আছে এ আবেক যন্ত্রণা।

যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে আর্তনাদও আনন্দ। ব্যথাব জায়গায রূঢ় স্পর্শটিও সুধান্বিত।

পরমাকে মেয়েরা ধবাধবি করে তুলে দিল বিকশায। অঞ্জলি ধবে বসল পাশ ঘেঁসে। এবই মধ্যে যেতে যেতে মুখ বাড়িযে দেখল পবমা, নলিনেশ পালাল কোথায? ঝুঁকি নিতে যার ভয়, হৈ-হ্যাঙ্গাম যে সইতে পারে না সে তো উলটো দিকেই মুখ কববে। না, কেটে পড়ে নি নলিনেশ, আরেকটা রিকশা নিযে চলেছে পিছু পিছু।

কি রকম পাগলের মত হযে গিয়েছে ভদ্রলোক। নলিনেশেব জন্যে মায়া করছে পরমাব। কি অকারণ ব্যস্ত করলাম! এ-সবে একেবারে অভ্যস্ত নয, ঘরকুনো ভালো মানুষ, তার উপরে কি অকরুণ উৎপাত! কি কববে কোথায় যাবে কাকে ডাকবে কেন ডাকবে কি রকম নোঙরছেঁড়া চেহাবা। কোঁচাটা অগোছাল, পাঞ্জাবির বোতামগুলো খোলা, চুলগুলোতে উপর-উপর একবার হাত বুলোনো পর্যন্ত নেই। কটা নোট আর খুচরো পয়সা

বুক-পকেটে তুলে নিয়ে এসেছে খাবলা মেরে, মনিব্যাগে গুছিয়ে আনবারও যেন সময় ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, দেখ, এই দুঃসময়ে ফাউণ্টেন পেনটা নিয়েছে কি করতে? হায় হায়, কলমই যেন তার বাহন যেমন গণেশের ইঁদুর, নারদের ঢেঁকি। শত্রু আক্রমণ করেছে, পাশাপাশি রিভলবার আর কলম রয়েছে টেবলের উপর, নলিনেশ বুঝি কলমই তুলে নেয়। কলমই যেন তার পন্থ, তার সাঁজোয়া। একবার এও লক্ষ্য করল পরমা, পায়ের জুতো একজোড়ার কিনা না এক পাটি লপেটা, আর এক পাটি অ্যালবার্ট।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্ধার তো করে দিল। হৈ চৈ পছন্দ করে না। কিন্তু দরকারের সময় করতেও বা ছাড়ল কই? পায়রার খোপে বকবকম করতেই যে ভালোবাসে, দরকাব বুঝে সেও বেরিয়ে আসে বাইরে। হাসপাতালের ডাক্তারদের কেমন তাড়া দিল খরখরে গলায়, এখানে যদি ব্যবস্থা না হয় বোঝেন কলকাতায় নিযে যেতে হবে, এবং এক্ষুনি, ট্রেনের দেরি থাকলে মোটরে। বাড়িতে খবর পাঠাল, কোর্টে মণিলালকে, প্রিন্সিপ্যালকে—এলাহি ব্যাপার। সকলে জানলে সকলে বণ্টন করে নিলে পরমার ব্যথাটা যদি কমে, যদি সে তাড়াতাড়ি ভালো হয়।

তারপর ভিড় বাড়লে এক ফাঁকে সটকান দিল। আমার আর এখানে থেকে কাজ কি ' আমি ভিড়ে নই, আমি নিবিড়ে।

পরদিন বইখাতা নিয়ে এসেছে আবার মেয়েবা। যে একটু আগে আসত ও একটু পরে যাবার চেষ্টা করত সেই শুধু আসে নি। যে তীর তূণের থেকে বেরিয়ে এসে আবার তূণে ফিবে যেত না, বিঁধে থাকত। এখন আগে-পিছে শান্তি। অবাধ অনুদ্বেগ।

জিগগেস করল নলিনেশ, 'কেমন আছে তোমাদের বন্ধু?'

'হাসপাতাল থেকে বাড়ি গেছে। বেঁধেছেঁদে দিয়েছে।'

'কি বলছে ডাক্তার?'

'হপ্তাতিনেক শুয়ে থাকতে হবে।'

নির্বিঘ্ন হয়ে পড়াতে বসল নলিনেশ। এবং খুব ভাল পড়াল। তার নিজের ধাতে নিজের আয়ত্তে। মন ও চোখেব সম্পূর্ণ বিশ্রামে। কেউ নেই আর নিরন্ত দুশ্চিন্তা হয়ে। হৃৎপিণ্ডের উপর থাবা উঁচিয়ে। এক বৈঠার ডিঙি নৌকোর উপর মেঘ-থমথমে আকাশে ঝড়ের ভ্রূকুটি হয়ে। বর্ষাসবুজ মাঠে শরতের নীলরোদ পড়েছে, চারদিকে আজ কাঁচা সোনার প্রসন্নতা।

পড়ানো শেষ করে এক পেয়ালা চা খেয়ে কি না-খেয়ে বেরিয়ে পড়ল নলিনেশ।

এ-অলি যাই ও-গলি না-যাই এমনি অলিগলি ঘুরতে লাগল। কি হবে গিয়ে? ভালো আছে পাকা খবর তো পেয়েই গেছি, তবে কি দরকার তাকে ব্যস্ত করে, তার শাকের আঁটির উপর কাঠের বোঝা হয়ে! কিন্তু না যাওয়াই কি ভদ্রতা? শিষ্টজনের প্রতিধ্বনি? তার বাড়িতে তাকেই জল দিতে গিয়ে জখম হল, একটু সজল সমবেদনা জানিয়ে আসবে না, একটু নিভৃত অনুতাপ? এমন এক কুঁজো রেখেছে যা পুরোনোর চেয়েও পুরোনো, তলা-ক্ষয়া, জলের ভারেই দুর্বহ—সেই জন্যে একটু লজ্জাও প্রকাশ করে আসবে না? প্রথম ধাক্কা তো অভিভূত হতেই কেটে গেল, কিছু বলতে-কইতে সময় দিল কই? কিন্তু, না, থাক, কি দরকার—আবার গলির মোড় ঘুরল নলিনেশ—অন্ধ শাসনের কয়েদখানার মত বাড়ি, হয়ত কোথাও আলোর ফোকর নেই, কড়িকাঠের ফাঁকে কোনো ঘুপচিতে হয়তো একটা চড়ুইও এসে বাসা বাঁধে নি, সেই বাড়ির ডোবার জলে ঢিল মেরে লাভ কি? হয়তো তাতে পরমাকেই ঘোলা করা হবে, সেই বাড়ির পরিবেশে কিছুতেই সে নলিনেশকে খাপ খাওয়াতে পারবে না, আর পারবে না বলেই তার খোঁড়া পা আরো বেশি হোঁচট খাবে। আহা যেমন শুয়ে আছে, জলের উপরে একটি স্থির মেঘের ছায়ার মত, তেমনি শুয়ে থাক। কিন্তু বলো, যাই বলো, সে কি একটু প্রতীক্ষা করে নেই? তার যন্ত্রণার মধ্যে আরেক যন্ত্রণার? ভিড়ের মধ্যে সেই যে পায়ে হাত রেখেছিল নলিনেশ, ব্যথার মধ্যে আরেক ব্যথা—তার কি ইচ্ছে নেই এবার সে হাত একটু কপালে এনে রাখুক! কেন, কপালে কেন, পায়েই, যেখানে ব্যথা সেখানেই কিংবা ব্যথা পেরিয়ে ব্যাণ্ডেজ যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার উপরটুকুতে। আবার মোড় ঘুরল নলিনেশ।

সন্ধ্যা হয় হয়, মণিলাল হাজরার বাড়িতে এসে ঢুকল। নিচে বাইরের ঘরে কতগুলো লোক নিয়ে বসেছে মণিলাল। ঠিক মক্কেল-মক্কেল গোবেচারা চেহারা নয়, কারো সঙ্গে কোনো নথির পুঁটলি নেই, সব কেমন আলগা লোকের ভিড়, সাপচোখো কানখাড়ারাখা ফিসফিসে গলার শেয়ালপণ্ডিত। এদেরই বলে তদবিরকার। এরাই জুরি ধরে, দারোগা ধরে, আমলা ধরে। সাক্ষী ভাঙায় পক্ষ ভাঁড়ায় এক দলিল পাচার করে অন্য দলিল সামিল করে। এই সব ধরাধরির এপার-ওপারের সাঁকো যাঁরা, মণিলাল হাজরা তাঁদেরই একজন।

ঘরে এসে ঢুকতেই সন্ত্রস্ত হল দলবল। চেনা নিশ্বাসের মধ্যে অচেনা নিশ্বাসের গন্ধ লাগল বোধহয়। সামলেসুমলে বসল সবাই মক্কেলের মত মুখ করে।

না, ভদ্রলোক। সন্ন্যেসীসাজা কালনেমি নয়, নয় প্রেনড্রেসের টিকটিকি। আরে নলিনেশবাবু না? চিনতে পারলেন মণিলাল। আসুন আসুন বসুন। কাঠের বেঞ্চির এক পাশে বসল নলিনেশ। ছাত্রী কেমন আছে খোঁজ করতে এসেছেন? ভালো আছে শুয়ে থাকতে হচ্ছে এই যা। সামনে পরীক্ষা, এই যা কণ্টক।

'হ্যাঁ, বেশ পড়ছিল—' আড়ষ্টের মত বললে নলিনেশ।

'দেখুন তো কি কপালের গেরো। কত কষ্টে মানুষ করছি বলুন।' পুরোনো কথা এক গাদা চিবুতে লাগলেন মণিলাল: 'এখন যদি একটা বছর নষ্ট হয় কতগুলো আমার লোকসান।'

'না, নষ্ট হবে কেন?' অন্তঃসারশূন্যের মত শোনাল।

এক বছর নষ্ট হওয়া মানেই গছানোর বাজারে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া। পিছিয়ে যাওয়া মানেই লাবণ্যের কারবারে দেউলে হওয়া। অভিভাবক হওয়া কি কম ঝকমারি?

এ সব শুনে কি পুণ্যার্জন হবে! নলিনেশের মনে হল, আর কি, বিবরে ফিরে যাই, ফিরতি-ইঁদুর হই।

তবু আরেকবার চেষ্টা করল যোগান দিতে। বললে, 'বাড়িতে, আমার বাড়িতে, কোচিং ক্লাসে, সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গায় দুর্ঘটনা। আর দুর্ঘটনার হেতু কি? না, সামান্য একটা জলের কুঁজো। ভালো করে দেখতে পেলুম না কোথায় ঠিক লাগল। কি তুচ্ছ কারণ থেকেই যে প্রকাণ্ড ঘটে যেতে পারে--'

কথার থেকে সারটুকু শুধু সংগ্রহ করলেন মণিলাল: 'হ্যাঁ, কোচিং ক্লাস। দেখুন ওতে আবার বাড়তি খরচ। দেউলের উপর আবার সোনার চুড়ো। আর এই হাসপাতালেই কম গেল নাকি বেরিয়ে? জজ সাহেবের কাছে টাকা চাইতে গেলেই বলবে বিল কই, ভাউচার কই এস্টিমেট কই?'

কিসের টাকা, কিসের বিল, হতভম্বের মুখ করল নলিনেশ।

পরমার বাবা কিছু টাকা, যৎসামান্যই হবে, রেখে গিয়েছিল। যেহেতু পরমা নাবালক, মামা মণিলালই আদালতে অভিভাবক হয়ে সে-টাকার খবরদারি করছে। মানুষ করতে সবই প্রায় বেরিয়ে গিয়েছে, যৎকিঞ্চিৎ গুঁড়ানি-তলানি থাকলেও থাকতে পারে বা কিন্তু আসল খরচ যে শেষ পারানির খরচ, বিয়ের খরচ, তার ব্যবস্থা এই আমাকেই দেখতে হবে। এই পর্যন্ত কম দেখিনি মশাই। কার আঙিনায় কে বা নাচে। নিজের জ্যাঠা-খুড়ো ছিল সেখানে ঠাঁই হল না, চড়লেন এসে আমার কাঁধে।

আমার ভোজনের চাল চর্বণে যাচ্ছে। তবু যদি মানুষ করতে পারি, পার করতে পারি, সমুদ্রে ভেলা বাঁধছি। তার কি খরচের কামাই আছে? এই দেখুন না, কিছুর মধ্যে কিছু না, পা ভেঙে বসল। এখন ডাক্তারে-হাসপাতালে ওষুধে-ব্যান্ডেজে এক জাহাজ অর্থব্যয়। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে ছাড়ল।

যে কথাটা বিঁধছিল নলিনেশকে তার উপরে আঙুল রেখে বললে, 'নাবালক কি বলছিলেন, পরমার কি আঠারো এখনো হয়নি?'

মণিলাল হাসলেন, 'এমনিতে আঠারোতেই সাবালক কিন্তু সম্পত্তি চালাবার ব্যাপারে নাবালকত্ব একুশ পর্যন্ত। একুশ হতে এখনও কয়েকমাস দেরি। তার আগে বিয়েটা চুকিয়ে দিতে পারলেই মুক্তিপত্রের সম্পাদন হয় আমার।'

'একটি ভাই আছে না?' কথার পিঠে বলতে হল নলিনেশকে।

'আর বলেন কেন? নিষ্কর্মা চাষার বিশখানা কাস্তে।' মণিলাল বললেন, 'তবে সেটা বেটাছেলে, একটা কিছু হিল্লে-উপায় হবে। মেয়েই ভুষ্টিনাশ। হবিভক্তি উড়িয়ে দেয় মশাই—'

বসে বসে এ-সব বিষয়-আশয়েরই আলোচনা করবে নাকি? যাই তবে উঠি। ফিরি নিজের শ্রীপাটে।

'বাবা, পিসিমা আপনাকে ডাকছেন।' খালি গায়ে হাফপ্যান্টপরা ছেলে এসে বললে।

ভিতরে চলে গেলেন মণিলাল।

তবু কি একটা আশা, মাতৃগত শিশুর মত বসে রইল নলিনেশ। কাতরোক্তির শক্তি নেই কিন্তু অকাতর স্তব্ধতার শক্তি আছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। বাকি পড়াটা শেষ করে নিতে হয়।' ফিরে এলেন মণিলাল: 'হ্যাঁ, এই যে আছেন। পরমার মা বলছিল পরমার বাকি পড়াটার যদি একটা বন্দোবস্ত করে দেন। তা আমি বললুম, কেন হবে না? তিনি যখন আছেন আর মাইনে যখন তাঁকে দেওয়া হচ্ছে—' বলতে বলতে নলিনেশকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির কাছে রাজেশ্বরীর সঙ্গে সামিল করে দিলেন।

তাঁর তক্তপোশে ফিরে এসে বসলেন মণিলাল।

ডাকলেন ভোলানাথকে. তদবিরকারদের মধ্যে যে সব চেয়ে বিচক্ষণ। হেন কাজ নেই যা তার অসাধ্য। ভাঙা ঘটে যে জল আনতে পারে, আগুন আনতে পারে কাপড়ে বেঁধে। তেল নেই জল আছে তো, দেখবে তাতেই প্রদীপ জ্বালাব।

'ওহে ভোলানাথ, দুখানা এবার ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করো আর ডিসপেনসারি থেকে একটা ওষুধ-বিক্রির ক্যাশমেমো। ঠিকমত সিল-টিল দিয়ে অথেন্‌টিকেট করে নিও। এই তক্কে ফের কিছু টাকা তুলি।'

চোখ পিটপিট করে ভোলানাথ সায় দিল। শনির যেমন আনন্দ রন্ধ্রে প্রবেশ করে, ভোলানাথের আনন্দ তদবিরে প্রবেশ করে।

রাজেশ্বরীর সঙ্গে নলিনেশ উপরে, দোতলায়, ছোট একটা ঘরে এসে ঢুকল। এইটিই বুঝি পরমার ঘর। দেয়ালে-বেঁধা তাকে বই থেকে শুরু করে টুকিটাকি প্রসাধনের জিনিস, টেবিলেও বইখাতার স্তূপ আর ওদিকে আলনাতে কাপড়চোপড়। ঘরে ঢুকে প্রথমটা মনে হল পরমা নেই এখানে, শুধু তার ছোঁয়াভরা মনের গন্ধটিই ভুরভুর করছে হাওয়ায়। কিন্তু এক পলক পরে দৃষ্টি স্থির হতে পরমা স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিচু তক্তপোশে বসে আছে পরমা—পিঠে এক ঢাল চুল। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ডান পা-টি ছড়ানো, বাঁ পাটি উঁচু করে রাখা, হাত দুখানি বাঁ পাকেই জড়িয়ে আছে আর বাঁ হাঁটুর উপরে চিবুক। চোখে চোখ পড়তেই হেসে উঠল পরমা। হাঁটুর উপর থেকে চিবুকটি তুলল না বলেই হাসিটি কেমন গভীর ও অন্তরঙ্গ মনে হল। নির্বাক মুখখানি যেন শান্তির সুরে কানে কানে কথা বলা।

যে টুলটাতে বসে পরমা পড়ে, রাজেশ্বরী দেখলেন সেটা কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আলগা একটা আসন না দিলে ভদ্রলোক বসবেন কোথায়? তাড়াতাড়ি তিনি টুল আনতে ছুটলেন।

গুলি ছোঁড়বার আগেকার মুহূর্ত। এখন কেমন আছে শুধু এইটুকুই তো প্রশ্ন, কিন্তু কি অদম্য আকর্ষণে নলিনেশ একেবারে তক্তপোশের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। আর সেই প্রশ্নটির সঙ্গে একটি ছোট স্নেহস্পর্শের মিশেল না হলে অর্থ মুক্তি পায় না, তাই মনে হল তাকে একটু ছুঁই। ম্লানচ্ছায়া নির্জন অরণ্যের মত ঐ যে তার চুল, তার উপর হাত রাখি, কিংবা তার ব্যাণ্ডেজের শেষ ও শাড়ির শুরুর মাঝখানে যে একটু ফাঁকা পা আছে সেই নিঃস্ব নগ্ন পায়ের উপর।

'এখন কেমন আছ?' বলে নলিনেশ ঠিক ব্যাণ্ডেজের উপর হাত রাখল।

সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পালটা জিগগেস করল পরমা, 'কি, পারলেন না পালাতে?'

'আমি বুঝি পালাই?' যে ফুল ফুটল না তারই মধুকণার জন্যে মৌমাছি বুঝি গুনগুন করে উঠল।

'জানলা দিয়ে দূর থেকে দেখলাম আপনি আসছেন।' বসবার ভঙ্গির রদবদল করল না পরমা, শুধু হাঁটুর উপর ডান গালখানি কাত করে রাখল। বললে, 'মনে হল আমাদের বাড়িতে আমার কাছেই আসছেন বোধ হয়। কিন্তু অনেকক্ষণ যায়, সাড়াশব্দ আর পাই না। বুঝলাম মামার চৌকাঠেই ঠেকে গেছেন। ব্যূহপ্রবেশের মন্ত্রটি তখন পাঠালাম মায়েব হাতে। বললাম মা, মাস্টারমশাই এসেছেন, তাঁকে ডাকো তাঁর মাস্টারিতে—'

'আমি বুঝি শুধু মাস্টার?'

'তবে কি? শুধু পুরুষ?'

'না, তা কেন?' আমতা-আমতা করতে লাগল নলিনেশ· 'শুকনো পুঁথি হতে যাব কেন, কেনই বা শুধু একটা রক্তমাংসেব সমাহার? মোট কথা আমি কিছুই নই, আমি অপূর্ণ আমি অযোগ্য।'

মা টুল নিযে এলেও থামল না পবমা। বললে, 'আপনিই তো বলেছেন বাক্যের সমস্ত অপূর্ণতা সঙ্গীত তাব রসে ভরে তোলে। বেখাব সমস্ত রিক্ততাই চিত্রের আনন্দে প্রাণ পায়। তেমনি জীবনে এমন কি কিছু নেই যা সমস্ত অযোগ্যতাকেও ঢেকে দেয় ভবে দেয ডুবিয়ে ভাসিযে তলিয়ে দেয় অতলে?'

রাজেশ্বরী ভাবলেন কোনো পাঠ্য কাব্যের তত্ত্বকথা হচ্ছে হয়তো। টুলেব উপর বসলে নলিনেশকে বললেন 'আপনাব ক্লাসটা এ ঘবে তুলে আনলে ক্ষতি কি?'

নলিনেশ দ্বিরুক্তি করল না। বেশ তো তাই আনব।

কিন্তু পরমা ঝঙ্কার দিযে উঠল 'না, না, এঘবে জাযগা কোথায়? মেয়েরা বসবে কোথায় বইখাতা নিযে? আমাব ঘবে ক্লাস হলে সমদর্শনই বা থাকে কি করে?'

'তা হলে কি হবে?' বাজেশ্ববী চিন্তিত মুখে বললেন।

'কি আর হবে! ওঁর ক্লাস থেকে নাম কাটা যাবে।' পবমা তাব বাঁ হাঁটুটা ছেড়ে দিল। যেন শিথিল কবে দিল সর্বাঙ্গ।

'পবীক্ষার এত কাছে এসে এমনভাবে কাটা পড়লে সাংঘাতিক ক্ষতি হবে।' রাজেশ্বরী ছাড়লেন না কথাটা।

'পা-ই কাটা পড়ল তায নাম!' আরও ঢলে পড়ল পবমা। বালিশে মাথা রাখল।

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' নলিনেশ তাব নির্লিপ্ততাব সীমানা পেবোল।

মা আর মেয়ে তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'আমার বাড়িতে সরকারি ক্লাসটা সেরে সন্ধের দিকে এখানে আসব না হয়।' পরমার মুখের দিকে তাকাল নলিনেশ: 'আবার পড়াব নতুন করে।'

খুশিতে টলটলে চোখে হাসল পরমা। ক্ষণিকের খেলার আকাশে জাগল যেন রামধনু। দুটো খামখেয়ালী মেজাজ, রোদ আর বৃষ্টি, তারই জাদু দিয়ে তৈরি এই হাসি। পরমা নড়ে-চড়ে উঠল। বললে, 'আপনার খুব পরিশ্রম হবে।'

নলিনেশ বললে 'কখনো কখনো পরিশ্রমই বিশ্রাম।'

কিন্তু রাজেশ্বরীর বিশ্রাম অন্যত্র। যদি এই বাড়তি পড়ানোর জন্যে নলিনেশ আরেকটা পুরো ঘণ্টার টাকা দাবি করে বসে তা হলেই তো কেলেঙ্কার।

বললেন, 'মাইনেটা কি হবে?'

গম্ভীর মুখে নলিনেশ বললে, 'যা দিচ্ছিল তাই।'

মহা-উৎসাহে রাজেশ্বরী জলখাবার আনতে গেলেন।

নিভৃত হবার ছায়াটি আবার পরমার চোখে পড়ল। বললে, 'সবাই টুকরো টুকরো পাবে আর আমি পুরো, আস্ত? এই আপনার সমদর্শন?'

নলিনেশ বলে ফেলল, 'এ আমার পরম দর্শন।'

সাহসে বুক বাঁধল পরমা। ভেঙে ভেঙে উঠে বসল। বললে, 'কিন্তু যা দিচ্ছিলাম তাই শুধু নেবেন কেন? অতিরিক্তের জন্যে অতিরিক্ত নেবেন না?'

'না। নাল্পে সুখমস্তি এ আমার কথা নয়। আমার অল্পেই সুখ। অল্পই আমার অপরিসীম।'

'আপনি নেবার কথা ভাবছেন কি না তাই অল্পের কথা ভাবছেন।' পরমা তাকাল কি রকম করে: 'কিন্তু যে দেয় সে অল্পের ধার ধারে না, সে শ্রাবণের প্লাবনের মতো নিরর্গল হয়ে ওঠে।'

মমতার চোখও এমন মদির হয় কে জানত। কথাও এমন আলো-জ্বালানো। কি রকম একটা রঙিন ভয় আচ্ছন্ন করল নলিনেশকে। ভাগ্যিস টুলটায় বসে ছিল, তাই পারল বসে থাকতে। ঢোক গিলে বললে, 'কিন্তু পাত্র যদি ফুটো হয় ধরি কি করে? যদি মণ্ডপই না থাকে দেবী এসে বসবেন কোথায়?'

'অন্তরে যদি বস্তু থাকে তবে দেবীর মণ্ডপ লাগে না।'

'দেবীরা এ কথা বলেন বটে, কিন্তু তাদের আসল নজর উপকরণে।'

'কোনটা উপকরণ আর কোনটা অপকরণ সে নির্বাচন দেবীর।' সমানে সমানে বলল পরমা।

'পুজুরীর কোনো নির্বাচন নেই?'

'কি করে থাকবে? সে শুধু তার পুজো, অন্তরের ভালোবাসা নিয়ে বসেছে। সে বসল কেন? কে তাকে বলেছিল বসতে?'

'কে তাকে বলেছিল বসতে।' কথাটা ভারি ভালো লাগল। নলিনেশ সরবে আওড়াল কথাটা।

'এখন দেবী জানেন তিনি আসবেন কিনা। এলেই বা কোথায় দাঁড়াবেন, কোথায় বসবেন, কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবেন।'

ম্লান চোখে হাসল নলিনেশ। বললে, 'সে-পুজুরীর অপরাধ তো সে শুধু বসেছিল—'

'অপরাধ ঘোরতর। বসেছিল উত্তবাস৷ হয়ে। উত্তবেব প্রতীক্ষায়।' পরমা নড়ে-চড়ে উঠল যেন অনেকগুলি সোনাব বাটিতে রুপোর কাঠিব আঘাতে বেজে উঠল জলতবং। বললে 'দেবী এসে উত্তব দিলেন। বললেন, তুমি তো শুধু বহস্যেব পুজুরী নও, তুমি বহস্যের ডুবুরীও। তুমি দুর্গমকে পার হবে অতলকে অধিগত কববে, তোমাব কীর্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে আমার শক্তিকে।

'দেবী ফিরে যাবেন।' নলিনেশ শব্দ করে হেসে উঠল 'দেখবেন এ পক্ষীরাজ ঘোডা নয এ পক্ষাঘাতেব ঘোড়া। ঘটে শূন্য চোটে ভটচাজ্জ। দেবী ফিরে যাবেন। মডাকাঠ তুলবেন না চড়কে।'

'আপনি জানেন না দেবীকে।' পবমা আবাব শুয়ে পডল 'দেবী সফলকে খোঁজেন না সুন্দরকে খোঁজেন।'

'হায় হায়, দেবীব চোখে সফলই যে একমাত্র সুন্দর।' শ্বাস ফেলল নলিনেশ।

রাজেশ্বরী জলখাবার নিয়ে এলেন। সন্ধ্যাব ঘোব লেগেছে, সুইচ টেনে আলো জ্বালালেন। হঠাৎ সব যেন ঝলমল করে উঠল। পরমাকে মনে হল সোনার ধারায় অভিষিক্ত স্থিব একটি মেঘের টুকবো। না, ওদিকে তাকিযে কাজ নেই স্নেহ কবে খেতে দিয়েছেন তাই খেয়ে যাই সাধ্যমত। স্তবেব চোখ বন্ধ করে তাকাই এখন বাস্তবের চোখে।

'মা, ওঁকে চা দিলে না?' পবমা ব্যস্ততাব আভাস আনল স্ববে 'উনি যে খুব চা খেতে ভালোবাসেন।'

তুমি আমাব সব জানো, এমনি একটু পরিহাসের ইচ্ছা হয়েছিল নলিনেশের, কিন্তু কে জানে, উত্তবে আবার কি বলে বসে। হ্যাঁ, আনছি

বই কি চা, তৈরি হচ্ছে। রাজেশ্বরী আবার ছুটলেন। না, না, দরকার নেই, খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এই গ্লাসের জলে হাত ধুচ্ছি আমি। রাজেশ্বরী ফিরলেন না, ভালোই করলেন। যাবার আগের মুহূর্তে নলিনেশ আবার একটু একা হল।

কিন্তু কি নলিনেশ করতে পারে? রুমালে হাত মুছতে মুছতে দু পা এগুতে পারে তক্তপোশের দিকে। বলতে পারে বড়জোর, 'আমি এবার যাই।'

যাই বলে দ্বিধা করবার দরকার কি ছিল. এতে আবার অনুমতি নেওয়ার কথা কোথায়? আমি এখন চললুম এ বলে সোজা প্রস্থান করাই তো যথাযোগ্য।

পরমা হাত বাড়াল নলিনেশের দিকে। আর তখন তাকে সোনায় ধোয়া রাশীভূত মেঘ মনে হল না, মনে হল কূলে-কূলে ভরা স্বচ্ছ নদী ছলছল ঢলঢল করে উঠেছে। পরমা বললে, 'পায়ের পাতা পেতে উঠে দাঁড়াতে পারি এমন আমার সাধ্য নেই। আপনি আমাকে একটু তুলে নিয়ে যাবেন ঐ জানলাব কাছে? টুলটার উপর বসিয়ে দেবেন? আমি আপনার যাওয়া দেখব।'

যেন সামনে কাঁটাতারেব বেড়া এমনি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নলিনেশ।

জিগগেস করল 'ডাক্তার কি বলেছে?'

'বলেছে অবিমিশ্র শুয়ে থাকতে।'

'মাস্টার না মানো ডাক্তারকে মানো।'

তবু কি চলে যাবার সিঁড়ি পাওয়া যায়? রাজেশ্বরী চা নিয়ে এসেছেন। তাড়াতাড়ি প্লেটে করে ঢেলে ফেলে-ছাঁড়িয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল নলিনেশ।

রাত্রে অঘুমে-অন্ধকারে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করল আর যাবে না ওখানে। এমন সস্তায় বিকিয়ে যাবার কোনো মানে হয়? পাঁচজনে পঁচিশ টাকা করে দিত ঘণ্টাখানেকের মত পড়ানো, মফস্বলের বাজারে চলে যেত একরকম। কিন্তু এ কেমনতর ছলনা? একশো টাকায় একঘণ্টা পড়িয়ে আর এক ঘণ্টা মাত্র পঁচিশ টাকায়? হিসেবেরও একটা ভদ্রতা আছে সীমা-সরহদ্দ আছে—এ যে একেবারে নষ্টসর্বস্ব দেউলিয়ার কাণ্ড। পাগল কি গাছে ফলে আক্কেলেতে পাগল বলে! অন্যান্য প্রফেসররাও বা কি বলবে? নেপথ্যনাট্যে প্রতিবাদ না করুক তাদের বাজার-দর মাটি করবার জন্যে অন্তত বিরুদ্ধতা করবে। দলে থেকে মূলে আঘাত করা সাজে না। নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কাটা।

'পরমার কি হবে?' পড়তে এসে মেয়েরা জিগগেস করলে।

'কি আর হবে? অসুস্থ হলে পড়বে কি করে?' মুখে কঠোর রেখা ফোটাল নলিনেশ।

অসুস্থ! যেন স্বভাবের নিয়মেই অসুখ হয়েছে! যেন বা নিজের হঠকারিতায়ই দুর্ঘটনা। মশাই, আপনাকেই জল দিতে গিয়েছিলাম এবং তা সর্বাগ্রে, নগ্ন পায়ে। আপনার তৃষ্ণায় জল তাপে ছায়া ও ক্লান্তিতে শুশ্রূষা হতে গিয়েই আমার এ দুর্দশা। আর বলিহারি কার্পণ্য, একটা কুঁজো রেখেছেন, মান্ধাতার থেকে দানসূত্রে পাওয়া, ঘরে না রেখে মিউজিয়মে পাঠালে নাম থাকত। আর এ তো আসলে পায়ে মারা নয় মাথায় মারা। শিরে সর্পাঘাত।

তা ছাড়া কথা দিয়ে এসেছে। শুধু তাকে নয়, তার মাকে। শিক্ষায় দীক্ষায় মানী লোক, কথার খেলাপ করে কি করে? করা উচিত? সত্যের কাছে অর্থ তুচ্ছ। আর সব হিসেব অকর্মণ্য। হয়তো প্রতীক্ষা করে আছে। আজ নিশ্চয়ই চুল ঘনছায়াচ্ছন্ন অরণ্য হয়ে নেই, আজ বোধহয় তা বেণীতে সংযত; শাড়িতে শৈথিল্য-বিস্তার নেই, আজ বোধ হয় তা শাসনে দৃঢ়ীভূত। আজ সে সজ্ঞান ছাত্রী, প্রতীক্ষায় প্রস্তুত, আজ সে নিশ্চয়ই রূপবর্ণহীন শুষ্ক মরু। তার আজকের রূপটিই খাঁটি। আজ নিশ্চয়ই আরাম পাবে নলিনেশ। কাল একেবারে অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনা হয়েছিল। অরূপ সমুদ্রে রূপের ঢেউ হয়ে। আজ সংসারতটে স্বচ্ছ একটি সরোবর।

মামুলী ক্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করেই রিকশা নিল নলিনেশ। চয়ন সিং খাবার দিতে চেয়েছিল, কি দরকার, ও-বাড়িতেই তো মিলে যাবে বরাদ্দ।

যা ভেবেছিল, পরমা আজ অনেক সতর্ক, অনেক সচেতন। তার ভঙ্গিতে আর সেই লাস্যের আলস্য নেই। সব রেখাগুলি আজ সজাগ, খরস্পষ্ট। আজ প্রথম দর্শনে হাসল না পর্যন্ত। তার দুই পাশে বইখাতার স্তূপ। সবচেয়ে কঠিন তক্তপোশের থেকে বেশ খানিক দূরে রাজেশ্বরী চেয়ার-টেবিল পেতেছেন নলিনেশের বসবার জন্যে। টেবিলটা যেন কড়া পাহারার বেড়া। পরিবেশটাই বিমুখবিস্বাদ। ফুল নেই ফসল নেই শূন্য একটা সাজি এমনি মনে হল নলিনেশের, ইচ্ছে হল সব বন্ধনবেষ্টন ডিঙিয়ে ঐ ওর পাশটিতে গিয়ে বসি। মানুষের সেই আদিম প্রার্থনাটি ওর কানে কানে বলি গাঢ়ভাষে: হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণটুকু দূর করে দাও। তোমাকে

দেখি। দেখি তুমি যা আমিও তাই, একই রহস্যে আমরা উচ্চারিত, আমরা উজ্জ্বল।

না, টেবিল-চেয়ার ভালো। মাস্টারের পক্ষে টেবিল-চেয়ারই স্থির আশ্রয়।

পড়াতে শুরু করল নলিনেশ, আর তা বেশ উচ্চকণ্ঠে। মনে কোথাও ভাবান্তর নেই, যেন শুধু বিষয়েই সে নিবিষ্ট, ব্যক্তিতে নয়, এই কথাটাই যেন চাইল ঘোষণা করতে।

জানলার বাইরে সোনার হরিণ এসে দাঁড়িয়েছে বইয়ের ফাঁকে তাকিয়ে এমনি আবার মনে হল। থাক থাক দাঁড়িয়ে থাক, দূরে থেকেই তাকে দেখি, সমস্ত চোখের দৃষ্টিটিকে সোনা করে তুলি। সেই তো ধ্যানের চোখে অসীমের দূতীকে দেখা। কি হবে তাকে ধরতে গেলে? হরিণ পাব, সোনা পাব না। মাংসের বাজারে পাব না সেই দৈবত নৈবেদ্য।

গলা নামিয়ে হঠাৎ পরমা বললে, 'আপনার স্ত্রীর কথা বলুন।'

নলিনেশের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। পাশ কাটাতে চাইল। বললে, 'বলেছি তো আরেকদিন বলব।'

'আবার কবে বলবেন। শুধু দিন চলে যাচ্ছে। জানেন, কাল রাতে আপনার স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখেছি।'

'বলো কি?' নলিনেশ অবাক হবার চেষ্টা করল . 'কেমন দেখতে?'

'অপরূপ। আর কি সুন্দর যে সেজেছেন! মাথায় আরমানী খোঁপা, ভুরুতে খয়েরের টিপ, সিঁথেয় ঢালা সিঁদুর। পরনে কস্তাপাড় গরদ, গা বোঝাই গয়না, উপর কানে পিপুল পাতা থেকে শুরু করে পায়ের দশ আঙুলে চুটকি। কেন এমন দেখলুম! বলুন না তাঁর গল্প। সেদিন বলেছিলেন—'

'কি বলেছিলাম?'

'বলেছিলেন বেঁচেও মরে আছেন। যদি বেঁচেই আছেন, যেমনি থাকুন না কেন, দুজনে থাকবেন না কেন একসঙ্গে?'

হ্যাঁ একটু বলা ভালো, হাতের তাশ মুঠোয় চেপে লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। পরমার জানা উচিত ভাগ্যের দাবার ছকে কোন ঘরে রয়েছে কোন উপসর্গ। চাপায় পড়ে বড়ে হয়তো এখন নিশ্চল, কিন্তু ভাগ্য আবার কখন কোন চাল এঁচে তাকে টিপে বসে কে জানে! হ্যাঁ, জানিয়ে রাখা ভালো যাতে পরমা চিনতে পারে তার চৌহদ্দি, বুঝতে পারে তার হাতের আর্টিকেল, খতাতে পারে তার আয়ব্যয় লাভলোকসান। যাতে আকাশ-আয়তনের সে হদিস পায়, শুনতে পায় বা একটু অব্যক্তের দীর্ঘশ্বাস।

হ্যাঁ, ছোট্ট করে বলি।

ছেলেবেলায়, কলেজে সবে পড়ি, বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিলেন—

'ছি ছি, করলেন কেন বিয়ে? কেউ করে?' পরমা যেন অভিভাবিকার মত সেই অপরিণত বয়সের ছেলেকে তিরস্কার করে উঠল।

'বাবা-মার খেয়ালী শাসনের ঊর্ধে মাথা তুলতে পারলাম না। ও-পক্ষ বিলেত যাবার খরচটরচ কি দেবে বলেছিল, হিসেবে ভুল হয়ে গেল। তাই নিয়ে দু পরিবারে বনতি হল না। শুধু তাই নয়, দেখা দিল বিকট শত্রুতা। ফলে মেয়েটা নারকোলের ছিবড়ের মত ছিটকে পড়ল তার বাপের বাড়িতে—'

'তাকে ত্যাগ করলেন বলুন—' পরমার এটা নির্ব্যক্তিক জেরা না ব্যক্তিগত প্রতিবাদ বোঝা গেল না।

নলিনেশ হঠাৎ পড়াতে লাগল উচ্চরোলে। পরমাও অভিনিবেশে তন্ময় হল। এখানে-ওখানে আশেপাশে রাজেশ্বরীর পায়ের শব্দ প্রখর হয়ে উঠেছে।

সে শব্দ আবার স্তিমিত হয়ে এলে সঙ্কির স্বাক্ষরের মত পরমা উৎসুক চোখ রাখল নলিনেশের মুখের উপর। আগের কথার জের টেনে নলিনেশ বললে, 'নারকোলের ছিবড়েকে ত্যাগ করাই চলে। তার বাবা দুর্ধর্ষ বাবা, গেলেন তা দিয়ে দড়ি বানাতে। মেয়েকে লেখাপড়ায় গুণে গানে চৌকস করতে কিন্তু কিছু হল না—মেয়েটা বোকা।

বোকা!' মুখের সরসতা মিইয়ে গেল পরমার। এ যেন বিদ্যাবুদ্ধির তুঙ্গশৃঙ্গের মাথায় উঠে সমস্ত মেয়েজাতটাকেই তুচ্ছ করছে নলিনেশ। আর সে জাতের মধ্যে পরমাও অন্তর্ভুক্ত। কে জানে এ হয়তো বা পরমাকে উদ্দেশ করে পরোক্ষ তিরস্কার। যেন পরমাও বোকা।

'বোকা নয় তো কি। তিন বার ম্যাট্রিক দিল তিনবারই ফেল করল। একেই বলে ম্যাট্রিকে হ্যাটট্রিক করা। আর বার কতক চালালেই গঙ্গারামের সহধর্মিণী হতে পারত। একবার কি হল শোনো। রাষ্ট্র হয়ে গেল পাস হয়েছে, পাসের লিস্টিতে নাম উঠছে নাকি। পরে দেখা গেল ফট্, পাস করে নি গাড্ডু। কি ব্যাপার? জানা গেল যাকে লিস্টি দেখে খবর আনতে বলেছিল তাকে ভুল রোল নম্বর দিয়েছে। বোঝ! যে নিজের রোল নম্বর ভুল করে সে কি নিরেট!'

কি নিষ্ঠুরের মতন বলছে এক তিল দয়ামায়া নেই। একটা অক্ষম মেয়ের ব্যর্থতায় কেউ এত খুশি হতে পারে পরমা ভাবতে পারত না। মনে মনে যদিও বা হয় বলবার সময় অন্তত ঢাকাঢুকি দিয়ে বলে। তা হলে

পরমাও যদি ফেল করে এমনি নখে-দাঁতে খুশি হবে নলিনেশ, কালো নিশ্বাস ফেলে বিষ ওগরাবে চার দিকে। কিন্তু পরমা কে? পরমা তো শুধু ছাত্রী। কত ছাত্রী ফেল করছে আকছার!

ম্লান মুখে পরমা জিগগেস করলে, 'ত্যাগ করলেও খবরটবর রাখতেন ঠিক?'

'ঠিক রাখতাম না, তবে কানে আসত। তুমি কান পেতে না থাকলেও কানে লোকে খবর তুলে দেয়।'

'তারপর কি হল?'

'ওর বাবা ওকে নার্সিং শিখতে দিল। যে ছেলের লেখাপড়া হয় না, তাকে যেমন কবরেজি পড়তে দেয়।'

'নার্সিংএ কি হল?' পরমার জিজ্ঞাসা বহুদূর।

'ঘষামাজার অবস্থাতেই টোল খেয়ে গেল। কানে এল বেজায় নাকি ঘুমোয়। যে ঘুমোয় সে তো রুগীকেও ঘুম পাড়িয়ে ছাড়বে। সুতরাং সেখানেও হল না।'

কি রকমভাবে বলছে দেখ। পরমাও একটু না হেসে পারল না। বললে, 'তারপর?'

'তারপর, তারপর চাদর ধরল।'

'চাদর ধরল?' পরমা তো অবাক: 'তার মানে?'

তার আগেই রাজেশ্বরীর শুরু হয়েছে আনাগোনা। বউদির সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে। সুতরাং নলিনেশ আবার বক্তৃতায় বিস্ফারিত হল। এবং বক্তৃতা যে কত খাঁটি তার প্রমাণে ইংরিজির তুবড়ি ফোটাল।

আবার শব্দজাল অপসৃত হতেই পরমা প্রশ্ন করল: 'চাদর কি বলছিলেন? বিছানার চাদর?'

'না। গায়ের চাদর।' নলিনেশ অবিচলিত মুখে বললে, 'উনি, এখন ওঁকে সম্ভ্রম করে বলতে হয়, উনি চাদর ধরলেন। তার মানে উনি ব্রহ্মচারিণী হলেন।'

'ব্রহ্মচারিণী?' পরমা ভুরু কুঁচকোল: 'বিয়ের পর আবার ব্রহ্মচারিণী!'

'স্বামী-পরিত্যক্তা যখন তখন ব্রহ্মচারিণী বই কি।' নলিনেশ বইয়ের উপর চোখ রেখে বললে, 'স্বামী যদি স্ত্রী ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে পারে স্ত্রীই বা স্বামী ত্যাগ করে ব্রহ্মচারিণী হতে পারবে না কেন? আর ব্রহ্মচারিণী হওয়া মানেই গায়ে চাদর জড়ানো। যে মেয়ে ধর্মের পথে পা বাড়ায়, ঢপকীর্তন গায় বা আশ্রমমঠে ঢোকে সেই চাদর গায়ে দিয়ে মানী সাজে। চাদরে দর বাড়ায়।'

'কি করবে? আদরিনী যখন হতে পারল না তখন চাদরিনী না সেজে উপায় কি?' পরমা ছোট-ছোট ঢেউ তুলে ভঙ্গিটা বদলাবার চেষ্টা করল। বললে, 'কিন্তু কেমন দেখতে আপনার স্ত্রী?'

এক কথায় প্রকাণ্ড এক কালির পোঁচড়া দিল নলিনেশ : 'স্বপ্নে যাই দেখ, আসলে শ্যাওড়াগাছের পেত্নি।'

একটু কি হালকা হল পরমা? না কি ভূত দেখল?

'তবে জানো তো, মেয়েদের রূপ তাদের নিজেদের দাবিতে নয় পুরুষের অনুমতিতে। মেয়েদের রূপ পুরুষের উপহার, পুরুষের আরোপ। তাদের দেহে নয়, পুরুষের স্নেহে। তাই ভালোবাসা হলে ছুছুন্দরীও সুন্দরী। কথায় বলে পিরীতের পেত্নিও ভালো।'

'তবে তাকে নিয়ে এলেই হয়।' কেমন রাগ-রাগ শোনাল পরমাকে। তার বুকের ভিতরটা কি আবার হাঁসফাঁস করে উঠেছে?

'সে-পথ বন্ধ।'

'বন্ধ? কেন? কি হয়েছে?'

'আত্মীয়বন্ধুদের তাগিদে আমি একবার তাকে আনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। ব্রহ্মতেজ দেখাল বলতে পারো। বললে, মাতাজীর আশ্রয় পেয়েছি, আর আমি সংসারে ফিরব না। আমি তবু তখনো সম্পূর্ণ ফিরিনি আমার কর্তব্য থেকে। যা আশ্রমের চেহারা দেখলাম, ভিখিরীর আস্তানার চেয়েও অধম। তখন চাকরিতে এসেছি, মাস মাস তাকে টাকা পাঠাতে লাগলাম। দিব্যি সে-টাকা সে নিল, মনে হল এই সেতু ধরেই হয়তো, লক্ষ্মী আর কোথায়, লক্ষ্মীপেঁচা চলে আসবে। কিন্তু কয়েক মাস পরে মনি-অর্ডার রিফিউজড হয়ে এল—বলে পাঠাল, মরে যাব তাও স্বীকার তবু তোমার টাকা ছোঁব না—'

'তবে কয়েক মাস নিয়েছিলই বা কেন?' সব জিনিসটা পরমার তন্ন-তন্ন করে দেখা চাই।

'বোধহয় প্রথম ক'মাস মাতাজীই হাতিয়েছিলেন। পরে কি ভাবে জানাজানি হতেই চাদরিনী এক কলমে এক খোঁট কালিতে, ক্রুদ্ধ লাল কালিতে, নাকচ করে দিলেন। সেই থেকে চরম ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।'

এবার গৃহাগত ছেলেদের গোলমাল শুরু হয়েছে বাড়িতে। এ কোলাহলে বিবাদ নেই। তাই ভ্রূক্ষেপ না করে পরমা জিগগেস করলে, 'হিন্দু বিয়ের কি বিচ্ছেদ হয়?'

'হয় না শুনেছি। কিন্তু আইন করলেই হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে হয়।' নলিনেশ আবার বইয়ের মধ্যে চোখ ডোবাল : 'কিন্তু বিচ্ছেদ তো শুধু

বাইরে নয়, বিচ্ছেদ একেবারে মূলে, গভীরে। তাকে আমার পছন্দই হয় নি—স্থূলে-অস্থূলে কোনো দিক থেকেই নয়—'

'কিন্তু আপনার প্রতিই বা কেন তার এই বিতৃষ্ণা? কি স্পর্ধায় টাকাটা পেরেছিল সেদিন প্রত্যাখ্যান করতে?'

'বললাম না, মূঢ়তা। গোড়ায় অবিশ্যি মায়ের পীড়ন, সংসারের লাঞ্ছনা, আমার অবজ্ঞা ও অসহযোগও ছিল। কিন্তু যাই বলো, সব মিলে অমোঘ আশীর্বাদ।'

'আশীর্বাদ!'

'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যের বোঝা নেমে গেছে ঘাড়ের থেকে।'

'কিন্তু যদি আবার একদিন আসে?' চোখে কালো আতঙ্ক, ঘুরে তাকাল পরমা।

পরমার জন্যে মন করুণায় ভরে গেল কানায় কানায়। নলিনেশ সরল মুখে বললে, 'আর আসবে না।'

'যদি আসে? ধরুন যদি দৈবাৎ আসে?' পরমার বুকের মধ্যে এক অদৃশ্য সাপ বারে বারে ছোবল মারছে।

'যদি আসে দেখবে দরজা বন্ধ। হেরে যাবে, ফিরে যাবে. নেমে যাবে।'

'কিন্তু সত্যি করে বলুন আপনি কি তাকে একটুও ভালোবাসেন নি? বাসেন না?' প্রথম অন্ধকারে যেমন সন্ধ্যাতারা আশায় উজ্জ্বল হয়ে তাকায় তেমনি করে তাকাল পরমা।

আবার তার জন্যে নলিনেশের মায়া হল। বললে, 'না কোনো দিন না।'

নলিনেশ চলে গেলে পরমা রাজেশ্বরীকে বললে, 'বড্ড গোলমাল হয় মা, পড়া জমতে চায় না।'

'বেশ তো, দরজা ভেজিয়ে দিলেই পারিস।' রাজেশ্বরী বললেন উদারস্বরে। পরে আবার কি ভেবে একটু সংশোধন করলেন: 'অন্তত এক পাল্লা—'

সেদিন নলিনেশ এলে রাজেশ্বরী নিজেই দরজা ভেজিয়ে দিলেন বাইরে থেকে। বেশ সাহস করে দুটো পাল্লাই জুড়ে দিলেন মুখে মুখে। মুখের কাছে ফাঁক থাকল একটুখানি। সেইটিই যেন রাজেশ্বরীর সদা-সতর্ক ধূর্ত চোখ। আমি চোখ রাখলে সাধ্য কি কিছু ঘটতে পারে অমাত্রিক?

পড়ার মাঝখানে হঠাৎ পরমা জিগগেস করে বসল 'আপনার স্ত্রী আপনাকে চিঠি লেখে? লিখেছে কোনো দিন?'

পীড়িত মুখে নলিনেশ বললে 'আজ আর স্ত্রীর কথা নয়, আজ বন্ধুর কথা।'

'বন্ধু?'

'হ্যাঁ বন্ধু, একত্র সংযুক্ত হয়ে দুটি পাখি এক বৃক্ষশাখায় বসে আছে। তারা সুপর্ণ, তাদের সুন্দর ডানা, একটির ডানা সংসারে আর একটির নীলাম্বরে। কিন্তু আশ্চর্য, বসে আছে ঘেঁসাঘেঁসি করে, সযুজ হয়ে, গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে—'

'কি করছে তারা?'

'একটি পাখি স্বাদু পিপ্পল খাচ্ছে—আরেকটি রয়েছে অনশনে। একটি ভোক্তা আরেকটি সাক্ষী। একটি উন্মুখ আরেকটি উদাসীন। এরা একাকী হয়েও পরস্পরে সংযুক্ত বিচ্ছিন্ন হয়েও পরস্পরে নিযুক্ত—আর, পরমা, এরাই সার্থক বন্ধু।'

'বন্ধু? শুধু বন্ধু?'

'হ্যাঁ, শুধু বন্ধুতাই আনন্দের। বন্ধুতার জাগরণেই সমস্ত ভালোবাসার পরিণাম, বলতে পারো, পরিপাক। ভালোবাসা নিছক স্বার্থসুখের ভালো লাগাই হয়ে থাকে যদি বন্ধুকে না পায়। বন্ধুকে পাওয়া মানেই সুন্দরকে পাওয়া। আর যা সুন্দর তাইতেই অনন্তের স্পর্শ।'

'আপনার কথাগুলিই শুধু সুন্দর।' হাসির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি ব্যঙ্গ লুকিয়ে রেখে বললে পরমা।

বললে, 'বন্ধুতা মানে নিদাঘেব দিনে আধ গ্লাস জল। আধ গ্লাস জলে আমি বিশ্বাস করি না।' বইয়ে মুখ ঢাকল পবমা।

ঘরের স্তব্ধতা নিটোল একটি মুক্তোর মত ঘন হয়ে উঠল। মনে হল, এই স্তব্ধতা দুটি হৃৎপিণ্ডেব শব্দ দিয়ে তৈবি।

রাজেশ্বরী নলিনেশেব বিষয় জানলেন সব পরমার জবানিতে। বিনা দোষে যাবজ্জীবন নির্বাসিত, এমনি করুণায় দেখলেন নলিনেশকে। নিজে উপযাচক হয়ে আনতে গেল, তবু স্ত্রী এল না। টাকা পাঠালেও প্রত্যাখ্যান করল, একেই বলে. দুবাচাব। দর্প যখন ভেঙে যাবে, তখন যেন একবাব দেখতে পাই চেহারা। ধর্ম স্বামীব সংসাবে নয়, স্বামীজীদেব সংস্রবে এব চেয়ে বড় অ-নীতি আব কি হতে পাবে? যে ধর্ম লোকালয়কে দেবালয় করতে জানে না, তার আবার কিসের দাম, কিসের দাবি? সাবা জীবন কেমন নিস্পৃহ তপস্বীর মতন কাটাবে—সমস্ত পথে যে পাথেয়, আর সমস্ত ক্লেশে যে ওষুধ সেই স্ত্রীই ওব নেই, থেকেও নেই। রাজেশ্বরীর মায়া পড়ল। নিজের হাতে খাবাব তৈরি করে খাওয়াতে লাগলেন।

সেদিন নীলাম্বরী শাড়ি পবেছিল পরমা। হঠাৎ দেখে নলিনেশের

মনে হয়েছিল, এ যেন শরীর নয়, অন্ধকারের ঝরনা। স্নিগ্ধ বাহুর উপরে কালো ব্লাউজের লাল পাড়টি যেন বিদ্যুতের সঙ্কেত।

পড়ার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল, হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, দরজা ভেজানো আছে কিনা। আছে। শুয়ে শুয়েই একটু এগিয়ে আসবার চেষ্টা করল পরমা। বললে, 'আজ আপনাকে একটি কথা বলব।'

ভয়ের কথা এমনি মনে হল নলিনেশের। দৃষ্টিকে নিরাসক্ত করে তাকাল মুখের দিকে। বললে, 'কি কথা?'

বলতে কি পারে? বসনে-বেষ্টনে, আড়ালে-আবডালে জড়িয়ে রয়েছে সে না-বলা কথার সুগন্ধ। ছড়িয়ে পড়েছে খণ্ডে-পূর্ণে বিরলে-বাহুল্যে ঝিলিকে-ঝিকিমিকিতে।

'বলো না কি কথা?' শুনবে বলে ভয়, অথচ শোনার জন্যে ছুঁচের মত আগ্রহ।

'বলতে লজ্জা করছে।' শুধু চোখ দুটি বাইরে রেখে বইয়ে মুখ ঢাকল পরমা।

'যদি লজ্জা পাও তাহলে বোলো না।' নির্লোভ মুখে বললে নলিনেশ।

'অন্যায়ের লজ্জা নয়, আনন্দের লজ্জা।' বইটা আস্তে আস্তে মুখ থেকে সরাতে লাগল পরমা।

কেন কান ফিরিয়ে নিই, শুনি না কি এমন কথা আছে পৃথিবীতে। সাধারণ আটপৌরে চলতি মানুষের কথার মধ্যে কি আছে এমন কল্পলোকের অমৃত! কি এমন ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা!

'বলো।' শুধু শ্রোতার কান নয় রসিকের হৃদয়টাও উন্মুক্ত করে রাখল নলিনেশ।

'আপনাকে আমার খুব—' পরমা বইয়ে আবার আনেত্র মুখ ঢাকল।

'ভালো লাগে?'

'দূর! এ কি একটা বলবার মত কথা?' আকুল চোখে হেসে উঠল পরমা।

'তবে?'

'আপনাকে আমার খুব তুমি বলতে ইচ্ছে করে।' কালো নিঝুম চোখে তাকিয়ে রইল পরমা।

একবিন্দু কথা, কিন্তু উচ্ছল ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ল বুকের উপর। হৃদয়ের চোরকোঠায় কে যেন হাতুড়ির ঘা মারল।

নির্জীব কণ্ঠে নলিনেশ বললে 'পারবে না বলতে।'

'পারব না?'

'না, মুখে আটকে যাবে। চিঠিতে হলে বরং পারতে। কথায় অসম্ভব!'

'কেন অসম্ভব?'

'আমি তোমার চেয়ে কত বড় বয়সে।'

'কি আপনার বুদ্ধি!' পরমা পরিহাসের লঘিমা আনল ভঙ্গিতে: 'ভালোবাসা, থুড়ি, বন্ধুতায় বুঝি বয়স আছে? চার পাপড়ির ছোট্টো একটা জুঁই ফুলের সঙ্গে সপ্তাশ্ববাহন সূর্যের বন্ধুতা। এমন প্রচণ্ডপ্রতাপ যে ভগবান, তাকেও অধমাধম ভক্ত 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। আর আপনি এমন কি বড়, এমন কি মোগল-পাঠান এসেছেন যে, সব সময়ে কুর্নিশ করতে হবে?'

'কই, এতক্ষণেও তো পারলে না একটা—'

'একবারেই কি পারা যায়?' অসহায়ের মত হাসল পরমা: 'আস্তে আস্তে কষ্ট করে অভ্যাসটা অর্জন করতে হয়।'

'তোমার এই কষ্টার্জিত অভ্যাসে প্রয়োজন নেই।' উঠে পড়ল নলিনেশ।

'আপনিও তো আমাকে কষ্টার্জিত অভ্যাসে শুধু দূর দূর করছেন।' ব্যথাভরা বিশাল চোখে তাকিয়ে রইল পরমা।

'হ্যাঁ, একটা দূরত্ব বজায় বাখাই সমীচীন, সম্ভ্রান্ত। আজ আমার একটু কাজ আছে, আমি চললাম।' নলিনেশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল।

পরদিন বৈকালিক ক্লাসে অর্চনা অনুপস্থিত। দীপালির হাতে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে। চিঠিটা একটা দুঃসহ দংশন।

লিখেছে: জ্বর হয়েছে, যেতে পারছি না, বিছানায় শুয়ে আছি। সুতরাং নিজের স্থাপিত নজির অনুসরণ করে দয়া করে সন্ধ্যায় আমাব বাড়ি আসবেন ও আমাকে পড়িযে যাবেন। এক সূর্যেই আমাদেব ধান শুকোনো।

কি সব শত্রু চারদিকে পুষেছি দেখ! গৃহীর শত্রু চোর আর চোবের শত্রু চৌকিদাব। দয়াব শত্রু ক্রোধ, সুখেব শত্রু ঈর্ষা। মেয়েগুলোব দয়া তো নেই-ই বরং উলটে এক-একটি বিষের পুঁটলি। তাবপরে আবার কুলোপনা চক্র।

নলিনেশ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'তোমাদের অসুখ করুক, আর আমি তোমাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পাঠশালা খুলি।'

অঞ্জলি বললে 'কেন খুলবেন না? আমরা কি বানভাসা?'

কে যে কি তা নলিনেশ কি জানে! সে শুধু এইটুকু জানে এ

দোকানদারি বন্ধ করে দিতে হবে। কোচিং ক্লাস করে বাড়তি আয়ে আর দরকার নেই।

না, নেই। অরণ্য-গভীরেই বাস করি এখন থেকে। বৃক্ষের নিশ্বাসে শুনি শুধু তার পায়ের শব্দ। যে আসে-আসে অথচ আসে না কোনোদিন। দূর হতে পাই শুধু তার বসনের সুবাস। আর তার সে-শাড়ি দ্রৌপদীর শাড়ি।

সন্ধ্যা হতেই পাটভাঙা জামা কাপড় পরল নলিনেশ। আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল। এ কি, সে চলেছে কোথায়! বা, তাকে চূড়ান্ত কথাটা বলে দিয়ে আসি। আর ভাগ্য যদি আজ দয়া করে, শুনে আসি তার গহ্বরগহন আত্মার গভীরতম স্বর, নির্মল নিষ্কল নির্ভয় সম্বোধন।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হচ্ছে। দূরের মর্মর তা হলে এখনো বন্ধ হয়ে যায় নি। মা এত মুক্তহস্ত হতে পেরেছেন অথচ নলিনেশের বসবার টেবিল-চেয়ার তক্তপোশ থেকে রেখেছেন অস্বাভাবিক দূরে। আর নলিনেশও এমন কড়ায় ক্রান্তিতে কঠোর আসবাব দুটোর এক ইঞ্চি স্থানচ্যুতি ঘটায় না। আজ পরমার ইচ্ছা হল ও দুটোকে কাছে টেনে নিয়ে আসে।

ছোট ঘর, দরজার থেকে বেশি দূরে নয় ব্যাপারটা। আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে দু পা গিয়েই দরজা।

পা এখনো সবল সক্ষম হয় নি আর তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পরমা টলে পড়তে চাইল। ছোট দুটো হালকা টেবিল-চেয়ার, তারা যেন দুটো সামান্য কাঠের অনড় বস্তু নয়, তারা যেন দৈত্যকায় শত্রু, সবলে ঠেলে বাধা দিতে চাইল। কোথাও কিছু ধরবার নেই আঁকড়াবার নেই। মাথা ঘুরে মেঝের উপর পড়ে যাচ্ছিল পরমা, নলিনেশ ছুটে এসে দু বাহুর মধ্যে তাকে কুড়িয়ে নিল। এ যেন শুধু বাইরে থেকে সাহায্য করা নয়, ভিতরে নিয়ে এসে আশ্রয় দেওয়া। খঞ্জের কাছে এ শুধু লাঠি নয়, একটা অনাথ লতার কাছে অনেক ডালপালামেলা বলবান গাছ।

যেটুকু ধরবার কথা এ কি তারও চেয়ে বেশি? যতক্ষণ ধরবার কথা এ কি তারও চেয়ে অনেক? একটা রুদ্ধ নিশ্বাসের ভগ্নাংশ সময়ের বেশি হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু পরমা তার মুখের উপর পেল একটা পুরো নিশ্বাসের স্পর্শ। আর ঘনপুঞ্জ স্তব্ধতার মধ্যে শুনল সেই অব্যক্ত সম্বোধন যা সে সেদিন শত চেষ্টা করেও পারে নি মুখে আনতে।

দু হাতে আস্তে আস্তে পরমাকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

তারপর যথাস্থিত দূর চেয়ারে বসে নলিনেশ বললে, 'হঠাৎ একটা জরুরি চিঠি পেয়েছি, আজ রাত্রেই আমাকে কলকাতা যেতে হবে। পড়ানো

বন্ধ থাকবে আপাতত। সেই খবরটাই তোমাকে দিতে এসেছিলাম। বসবার সময় নেই।'

উঠে চলে গেল নলিনেশ। নিচে রাজেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকেও সেই কথা বললে। মণিলালের সঙ্গে দেখা হলে মণিলালকেও।

আর এক ঘরে শুয়ে শুয়ে পরমা কাঁদতে লাগল। কাঁদতে যে এত ভালো লাগে এই প্রথম জানল জীবনে।

চিরকাল শুনে এসেছে কান্না দুঃখের। দুঃখের মধ্যে ঐ কান্নাটাই তো মুক্তি। আর মুক্তি কখনো দুঃখের হয়?

আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে দাহ আর উন্মাদনা এইই মনে মনে জানত পরমা। কিন্তু জীবনে এই প্রথম দেখল আকাঙ্ক্ষার স্পর্শও কত শীতল কত অমল কত সহিষ্ণু হতে পারে। এ আকাঙ্ক্ষা যেন পবমাকে অতিক্রম করে আর কোনো পরমের দিকে আকাঙ্ক্ষা।

পরদিন যথাসময়ে মেয়েরা এসে দেখল কোচিং ক্লাসের দবজা বন্ধ। চয়ন সিং খুলে দিল দবজা। বললে, 'কাল রাত থেকে বাবুর খুব অসুখ—'

সাহস করে ঢুকল মেয়েরা। দেখল চাদব মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে নলিনেশ। দাড়ি কামায়নি, চুল উসকোখুসকো রুক্ষ উপবাসী চেহারা। অর্চনা জিগগেস কবল, 'কি হয়েছে?'

'জ্বর। গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা।' চোখ রীতিমত কবুণ কবল নলিনেশ।

যে রকম সাহস আজকাল মেয়েদেব কপালে হাত দেবে নাকি?

নলিনেশ বললে, 'যেবকম দুর্দান্ত ব্যথা, মনে হয় মাযের দযা হবে।'

যা ভেবেছিল তাই, মেয়েগুলি গুটি গুটি পালাল ঘব ছেড়ে। কিন্তু কে জানে এসব চালাকি কিনা। হযতো দিব্যি সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যাবেন তাঁর প্রধানার বাড়ি, দাড়ি কামিয়ে, মুখে পাউডার ঘসে। রাজকীয় সমারোহে।

পরমান্দর বাড়ির আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মেবে নলিনেশেব টিকিও খুঁজে পেল না কেউ।

সেই থেকে ব্যবধান। সেই থেকে বিচ্ছেদ।

পাখি দুটি কত কাছাকাছি, কিন্তু আসলে তাবা কত দূবে মর্ত আর স্বর্গ, সীমা আর ভূমা। তুমি আমাব তাই হয়ে থাকো। নিকট হয়েও দূর, দূব হয়েও বুকের মধ্যে। তোমাকে আমি দূরে-অদূবে সীমায়-ভূমায় আস্বাদ করতে চাই। তোমাকে কড়ায়-গন্ডায বুঝে নিতে চাই না, তোমার মাঝে থাক আমার অনেক হিসেবের গরমিল। তোমাকে চাই না

তন্ন তন্ন করে দেখতে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তোমাকে দেখতে চাই ধ্যানের চোখে, অধ্যাত্মলোকে। তোমাকে ক্ষণকালের জাল ফেলে ধরতে চাই না। তুমি আমার চিরকালের ইন্দ্রজাল। তোমার সঙ্গে আমার একজন্মের নয়, জন্মান্তরের সৌহৃদ্য।

এমনি গেল পরীক্ষার শেষ হবার আগে পর্যন্ত।

তারপর যেদিন পরীক্ষার শেষ হল সেদিন ঘোরতর বর্ষা। সন্ধ্যায় পিচঢালা অন্ধকার, বন্ধ দরজায় শব্দ হল—ঠুক ঠুক। খুলুন, খুলুন, মনে হল বা মানুষের কণ্ঠ। জানলাটা একটু ফাঁক করে তাকিয়ে দেখল, আর কে হতে পারে, পরমা। সঙ্গে ঐ একটা বা লোক কিসের?

দরজা খুলে দিল নলিনেশ আর একরাশ ঝড়ের মত ঢুকে পড়ল পরমা। ঝড়ের মত বললে, 'লোকটাকে শিগগির বিদায় করুন। হ্যাঁ, রিকশাওয়ালা। বারো আনা ভাড়া। আমার ব্যাগ আনতে মনে নেই। আজ ঝড়। আজ আমার পরীক্ষার শেষ।'

'দিয়ে দিচ্ছি।' থতমত খেয়ে গেল নলিনেশ।

রিকশা বিদায় হতেই পরমা বললে—বলার দরকার ছিল না—'দরজা বন্ধ করে দিন।'

দরজা বন্ধ করে নলিনেশ বললে, 'একেবারে ভিজে গেছ।'

'আদ্যোপান্ত ভিজে গেছি। দেখুন না হাত দিয়ে।'

পরমার মাথার উপরে, চুলে হাত রাখল নলিনেশ। তারপর তার স্নানচিক্কণ স্নিগ্ধশ্রী সিক্ত মুখখানিতে।

'দেখুন না। জলে ভিজে হাত পা আমার কেমন ফর্সা হয়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে আছেন কি? শিগগির, আপনার একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি দিন আর সম্ভব হলে একটা চাদর। ভয় নেই, আমি ব্রহ্মচারিণী হব না।'

কি সাংঘাতিক মেয়ে! কি অপরূপ মেয়ে!

'দাঁড়িয়ে আছেন কি! আপনার কি ইচ্ছে আমার ডবল নিউমোনিয়া হোক।' পরমা তার পায়ে নিচের শাড়ির ঘেরটা হাতে করে টিপে জল বার করতে লাগল 'কাপড়জামা না দিন, পাশের ঘরে বন্ধ হয়ে থাকুন ভদ্রলোকের মত। আমি এঘরে বসে একলা একলা আপন মনে আমার কাপড়চোপড় শুকিয়ে নিই।'

'সর্বনাশ। রাত শেষ হয়ে যাবে যে।'

'হলে হবে। আপনার যেমন ব্যবস্থা।'

'ব্যবস্থা ভালোই।' নলিনেশ আলো-না-জ্বালা পাশের ঘরের দিকে

তাকাল, ঝাপসা গলায় বললে, 'এখুনি হাতে সম্মার্জনী নিয়ে আসবেন বেরিয়ে।'

'আসবেন বেরিয়ে!' পরমার সমস্ত মুখটুকু ভয়ে একেবারে উড়ে গেল : 'এসেছেন?'

'এসেছেন বৈকি। তাঁর ঘরদোর, তিনি আসবেন না?' পাশের ঘরের দিকে শাণিত চোখ ফেলল নলিনেশ।

পরমা কি রকম যেন হয়ে গেল। তার শরীরের নীলাভ মেঘচ্ছায়াটি সরে গেল বিবর্ণ হয়ে। কাঁপা পায়ে ঘুরে গিযে বসল চেয়ারে, হতাশায় গা এলিয়ে দিয়ে। বললে, 'বেশ তো, ভালোই তো, তবে তো শাড়ি-ব্লাউজই বাড়তি পাওয়া যাবে। নিন, বলুন আপনার স্ত্রীকে।' তারপরের কথাগুলি শোনাল স্বগতোক্তির মত · 'বৃষ্টিতে পথে ভিজে গেলে কেউ কোনো আশ্রয়ে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যায় না? আর যদি সেটা কোনো চেনাশোনার বাড়ি হয়, আর সেখানে যদি শুকনো জামাকাপড পাওয়া যায়, নেয় না বদলে? ভিজে কাপড়ে বসে থেকে প্লুরিসি করায়?'

তবু নলিনেশের দিক থেকে কোনো চাঞ্চল্য নেই দেখে পবমা নিজেই আবার উঠে পড়ল। পা টিপে টিপে প্রায় গুড়ি মেবে এগুতে লাগল পাশের ঘরের দিকে। দরজা খোলা, ঘব অন্ধকাব। ইতি-উতি তাকাল তীক্ষ্ম চোখে। পবে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়িযে বললে নলিনেশকে, 'ঘব তো ফাঁকা।'

'কিন্তু ভয় তো ফাঁকা নয়।'

'উঃ, আপনি কি দয়ামায়াশূন্য।' নিজের বুকেব মধ্যিখানে হাত রাখল পরমা · 'দেখুন, কি ভীষণ কাঁপছে এখানটা।'

নলিনেশ বললে, 'কিন্তু কাঁপুনিটা তো একদিন সত্যি হতে পারে।'

'যখন হবার তখন হবে। আর আমি জানি তা হবে না। সে আসবে না। পারবে না আসতে।' এবাব চেয়ারেব দিকে না গিয়ে বিছানা-তোলা শতরঞ্চি-পাতা তক্তপোশের উপর বসে পড়ল পরমা। হাত তুলে গুচ্ছীভূত চুলের বাঁধনটা খুলে দিল ঝুপ কবে। সেই এক ঢাল চুল। এক আকাশ বৃষ্টি।

টুপ টুপ করে জল পড়তে লাগল চুলের থেকে। জল কি তাব চোখের পলকেও?

পরমা বললে, 'আপনি আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছেন। · আমি জানি এ-বাসা এ-দুর্গ আমার। আমি লক্ষ্মণের মত না ঘুমিয়ে আগলাব আপনার দরজা। দেখি কে ঢোকে।'

'তাতে আমার সুবিধে কি!' কথার পিঠে কথা এসে গেল নলিনেশের : 'একে তো ঘুমুবে না, তায় ঘরের মধ্যে না থেকে থাকবে কিনা দোরগোড়ায়। আমার রাতও গেল ভাতও গেল।' দুজনে চোখোচোখি হতেই হেসে উঠল একসঙ্গে : 'শোনো, বৃষ্টিটা এখন একটু ধরেছে—আমি বলি কি—'

'আপনি কি বলবেন আমি জানি। কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে যাবার বায়না করে আসিনি।' নড়েচড়ে উঠল পরমা।

'সে কি? এখানে থাকবে?'

'যদি থাকতে দেন তো নয় কেন? আসলে ভিতু তো আমি নই, ভিতু আপনি।'

'তা ভয় ষোল আনা বাদ দিতে পারছি কই? অন্তত লোকের ভয়, লোকে কি বলবে?'

'লোকে বলতে আর কিছু বাকি রাখছে! লোক না পোক! লোকের কথা শুনব না সত্যের কথা শুনব?' মাথা নোয়াল পরমা। নুয়ে-পড়া মাথার থেকে এলোচুল ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

'কি সত্য সব সময়ে এক নজরে চেনা যায় না। অপেক্ষা করতে হয়।' নলিনেশ কয়েক পা হাঁটল, ধরি ধরি করেও ধরল না চুলের গোছা। বললে, 'কখনো কখনো সত্যের ছদ্মবেশ পরেই ভুল দেখা দেয়, পরমা।'

'দিক।' পরমা উঠে দাঁড়াল 'ভুলই আমার ভালো। ভুলই আমার সুন্দর।'

কৃশরেখা নদীর পারে নীল নিবিড় বনচ্ছায়া দেখছে নলিনেশ। ঐখানেই যেন চিরদিনের অগম্য অলকা। সেই বনের পথে হারিয়ে যাওয়ার জন্যেই যেন জীবনের ডাক। নিশ্বাসে আজও যার ঘ্রাণ নেওয়া হয়নি, সেই বনপথের শেষেই ফুটেছে সেই অনাঘ্রাত ফুল।

'আপনি অপেক্ষা করুন। আমি করতে রাজি নই। ঝড়ের মত তাই ছুটে এসেছি।' অন্ধকারের শিখার মত জ্বলতে লাগল পরমা।

'ঝড়ের মত আবার চলে যাবে বলে।'

'হ্যাঁ, যাব, কিন্তু আপনাকেও নিয়ে যাব সঙ্গে করে। আপনাকে আপনার এই প্রৌঢ় বয়সের নিশ্চিন্ত ঘেরের মধ্যে থাকতে দেব না।' পরমা এগুল দরজার দিকে : 'কই, আপনার চয়ন সিংকে ডাকুন, একটা রিকশা নিয়ে আসুক।'

কত অল্পই পেয়েছি জীবনে এইবার আপসোস হল নলিনেশের। কত অল্পই জেনেছি। কত অল্পই ছুঁয়েছি হাত দিয়ে। অল্পে সুখ নেই,

এইবারই সমস্ত প্রাণ শিশুর মত কেঁদে উঠল। যা পাইনি তাই অমূল্য, যা ধরিনি তাই বৃহৎ, যা আস্বাদ করিনি তাই সুধা।

তবু অভ্যাসবশে নলিনেশ বললে, 'তবু ঝড়ের মত না এসে রোদের মত আসতে হবে। সব দিক দেখে-শুনে আটঘাট বেঁধে বাধা-বেড়া সরিয়ে-ঝরিয়ে। যাতে হিসেবে না ভুল থাকে।'

পরমা বললে, 'কিন্তু ভালোবাসা কি হিসেব টোকা, ওজন করা? না, সবঢালা?'

'সবঢালা।' নলিনেশের মুখ থেকে বেরিয়ে এল অজান্তে।

রিকশা এসেছে, বারান্দায় দু পা এগিয়ে দিতে এল নলিনেশ। বৃষ্টিতে মাঠঘাট বাড়িঘর সব কেমন অচেনা লাগছে, কেমন যেন নতুন রঙের অন্ধকার চারদিকে।

নলিনেশ হাত ধরল পরমার, যেমন যাবার আগে একটু ধরে। কিন্তু অসম্ভব একটা কথা বললে। সাধারণ হিসেবে যা অসম্ভব, বর্ষায় তাই সহজ, সুসাধ্য। বর্ষা না হলে ভাবাও যেত না। বর্ষা না হলে এমন কথা বলা যায় কখনো!

বললে, 'এতক্ষণ কথা বললে, কই, একবারও তো 'তুমি' বললে না।'

হৃদয় যেন গলে গেল। পরমা বললে 'আপনি বলুন।' প্রার্থনার মত মুখখানি উঁচু করল।

'বা, আমি তো বলছিই।'

'নতুন করে বলুন, একান্ত করে। এও তো মুখেরই কথা। এত বৃষ্টিতেও আমি সিক্ত হইনি। আমাকে স্নিগ্ধ করুন।' বারিপূর্ণ অধরপুট মেলে ধরল পরমা।

নলিনেশের কি হল? নত হল দ্রব হল, অজস্র হল। আমি যদি সরস না হই, তবে তোমাকে স্নিগ্ধ করি কি করে?

তারপরে আবার দেখা পরীক্ষার ফল বেরুলে। এবং সেটা প্রাঞ্জল দিনের আলোয়।

'জানেন তো আমি পাস করেছি আর অনার্স নিয়ে। কোন ক্লাস জিগগেস করবেন না জানি। তবু আদায় করতে যে পেরেছি একটা মান এই আমার যথেষ্ট। এখন আরেকটা মান, আমার আসল মান পাই, তা হলেই বাঁচি।'

ছুটির দিনের দুপুরবেলা। যথারীতি শুয়ে শুয়ে পড়ছিল নলিনেশ, ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে, 'জানতুম তুমি আবার আসবে।'

'আসব না মানে? আপনি আমাকে ছুঁয়ে দেননি? আর জানেন না

বাঘে ছ্ঁলে আঠারো ঘা?'

'জানি।'

'আর এটা কি জানেন আমি আর আপনার ছাত্রী নই?'

'তবে তুমি কি?'

'আমি কর্ত্রী।' রোদের স্পষ্টতায় ঝলমল করছে পরমা: 'সুতরাং যা বলছি শোনো। তোমার স্ত্রীর জমানো চিঠিগুলো বার করো।'

আমার স্ত্রীর আবার চিঠি কোথায়? কেনোদিন লিখেছে নাকি যে থাকবে? কেন, টাকার প্রাপ্তি সংবাদও দেয়নি? সে তো মাতাজী নিত। আর যখন শেষ লিখে পাঠাল, চাইনে টাকা? তখনই বা চিঠি কোথায়? তখন তো লালকালিতে পিওনের হাতে 'রিফিউজড' লেখা।

'কি নাম তোমার স্ত্রীর? উঃ, অসম্ভব—'

'কি অসম্ভব?'

'এই 'তুমিটা'।' পরমা লাজুক চোখে হাসল. 'আমার আপনিই ভালো। বলুন আপনার স্ত্রীর নাম কি?'

'উমাশশী।'

'উমাশশী?' তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল পরমা। বললে, 'দেখুন, আমার মনে হচ্ছে আপনার বিয়ে-টিয়ে কিছু হয়নি। শুধু আমাকে একটা ধোঁকা দিচ্ছেন—আপনার স্ত্রী-ফি কিচ্ছু নেই।'

'নেই তো নেই। কিন্তু যদি এসে একদিন উদয় হন তখন যেন বোলো না, আমাকে কেন ঠকালেন, কেন অপমান করলেন, কেন সব কথা বলেননি আগেভাগে? খুঁতে জানলে, কে আপনাকে প্রশ্রয় দিত? আমার হাতের তাশ খুলে দেখানোই ভালো। রং নেই ফেরাই নেই শুধু দুরি-তিরি। তখন না বলো, জানলে এই তাশওয়ালাকে কে খেড়ি করে!'

যে খেলতে জানে, সে কানাকড়িতেও খেলতে পারে।

খেলতেই পারে, কিন্তু জিততে পারে না।

খেলতে পারাই জিততে পারা।

পাশ-তাশ নেই তুরুপের জোর নেই সে জেতে কি করে। তবু জানিয়ে রাখা ভালো। কি অকৃতী তোমার নির্বাচন! যে ঘর তুমি দেখছ, সে আসলে ভয়ের ঘর। তার খিলেনে ফাটল, কড়িবরগায় ঢিল, গাঁথনিতে দৌর্বল্য। গর্তখোঁড়া মেঝে, রংজ্বলা ছাতাধরা দেয়াল। কখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই।

পড়তে দেব কেন? সেই ভয়ের ঘর ভালোবাসার সিমেণ্ট দিয়ে মেরামত করে রাখব।

কিন্তু আমি একটা কি। অধন-অধম। না আছে রেস্ত-রসদ, না বা মান-মরোদ। না বা বয়সে নবীন।

মুখ টিপে হাসল্ল পরমা। সেই যে বলে, বস্ত্র নেই তাই ব্যাঘ্রচর্ম, তেল নেই তাই গায়ে ছাই, স্থান নেই তাই শ্মশানশয়ন। আপনি হচ্ছেন তাই। আপনার বৈরাগ্য আছে বলেই তো আমার অনুরাগের মাধুরী। বৈরাগ্যে-অনুরাগে মিলনই তো হরপার্বতীর মিলন।

'কিন্তু না, না, রাখালকে রাজত্ব দিও না পরমা।'

'কে রাখাল? গোকুলে চরাত গরু সেই শেষে কল্পতরু।' খিলখিল করে হেসে উঠল পরমা।

কিন্তু আমার কাছে কি তোমার প্রত্যাশা?

প্রেমের যা প্রত্যাশা, অসীমের প্রত্যাশা। তোমাকে আমার যে মূল্য দেওয়া সে তোমাব কৃতিত্বকে নয়, তোমাব মহিমাকে মূল্য দেওয়া। ব্যক্তিতে তুমি বিশেষ, প্রেমে তুমি অশেষ। তেমনি বিশেষে-অশেষে আমিও।

'সুতরাং ছুটির দরখাস্ত করো। দিন আব বযে যেতে দিও না। তুমি ছাড়া আর কে আমাকে উদ্ধাব করবে? যে ভালোবাসে সেই একমাত্র দুর্জয়, দুর্ধর্ষ, অপরাভূত—'

তবু সেদিন যাবার সময আবাব বলে দিযেছিল নলিনেশ, 'তবু আবাব ভেবে দেখো। টাকা নেই পয়সা নেই চাল নেই চুলো নেই রূপ নেই বয়স নেই—'

কেঁদে ফেলেছিল পরমা।

তখন আবার তাকে ধবো। আদব কবো, কাছে টানো। বকুল ঝবাও।

তবু যথাসাধ্য সময় দিতে চেয়েছে নলিনেশ। যাতে ইচ্ছে করলে মনোভঙ্গির সংস্কার করতে পারে পরমা। দিনেব পব দিন মাসেব পব মাস দেখা করবার সুযোগ দেয়নি, পালিয়ে-পালিযে বেড়িয়েছে। যখনই দেখা হয়েছে দৈবাৎ, তুইয়েছে স্নেহস্বরে। যত তুইযেছে তত তাতিয়েছে। কিছুতেই শুনব না, কিছুতেই থামাব না কান্না। আমাকে উদ্ধার করো আমাকে মুক্তি দাও।

আমি হনুমানের পিঠে চড়ে উদ্ধাব পেতে চাই না। তুমি বাম, তুমি আমাকে বাহুবলে উদ্ধার করবে।

শেষ পর্যন্ত ছুটির দরখাস্ত করল নলিনেশ। পরমাই করিয়ে ছাড়ল।

কিন্তু কোথায় ছুটি?

৪

ঘরের বাইরে থেকে দরজায় ছিটকিনি দিলেন রাজেশ্বরী।

এখন কি করা! কাঁদতে বসল না পরমা, ভাবতে বসল।

পুলিশে একটা এত্তেলা পাঠানো। ফৌজদারি আইনে আমি নাবালক নই, আমাকে এরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায় করে আটকে রেখেছে। আদালতে আমি এর বিহিত চাই। কিন্তু পুলিশে কে সংবাদ দেয়! যদি একটা খবর পাঠানো যায় নলিনেশকে। সে তো আরো কঠিন। আর তাকে খবর পাঠালেই বা কি? তার কি কোনো উদ্যোগ আছে, না আরম্ভ আছে? হঠকারী হয়ে চাইবে না মাথা গলাতে। বরং বিব্রত বোধ করবে। ভাববে এ কোন জটিল বিপজ্জাল!

তাকে চিনি না? শুধু সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে। তার এক মন্ত্র, অপেক্ষা। যেন অপেক্ষা করে থাকলেই ঘটে যাবে অসামান্য। বসন্তের এক হাওয়াতেই সমস্ত বন উল্লসিত হবে।

তা কি কখনো হয়? সরোবরের কাছে না গেলে কি তৃষ্ণার জল মেলে?

কিন্তু তৃষিত কে? সরোবরই বা কোথায়? কোথায়, কে বা কাকে!

অতএব অপেক্ষা না করে উপায় নেই। পাষাণে বাঁধা কঠোর সড়ক পেরিয়ে শুধু সময়ই আনতে পারে আশ্চর্যকে।

তাই চুপ করে থাকি। সায় দিই। ভালোমানুষ সাজি। ফিকির-ফোকর খুঁজে বেড়াই। যুদ্ধের সম্বল শুধু বল নয়, কৌশল। শুধু অগ্রসরণ নয়, অপসরণ। দেখি নিষ্ক্রিয় হয়ে। নির্বাক থেকে। যা হবার তাই হোক। না হবার তো নাই হোক।

দায় কি আমার একলার?

এক সময় না এক সময় খুলতে হল দরজা। মেয়েকে তো অন্তত স্নানাহারটা দিতে হয়। রাজেশ্বরী অনেক কান্নাকাটি করলেন। দেয়ালে মাথামুড় খুঁড়লেন। এমন কালামুখী মেয়ে পেটে ধরেছেন বলে গলায় দড়ি দেবেন বললেন।

'বল এ বিয়ে তুই করবিনে—' রাজেশ্বরী হন্যে হয়ে উঠেছেন।

'আমি তো জানতাম একটা কিছুতে গাঁথা পড়তে পারলেই তোমরা নিশ্চিন্ত।' সহজ স্বরে বললে পরমা।

'কিন্তু এ লোকটা নয়, কিছুতে নয়। এর আধ পয়সারও যোগ্যতা নেই, না বয়সে না সম্পর্কে না বিত্তে-চরিত্রে। সামান্য ক' টাকা মাইনে কলেজে, শীতকালে ভরসা যার সূর্য আর বর্ষাকালে তালপাতা। তা ছাড়া সবচেয়ে যা কেলেঙ্কারি, লোকটার জলজ্যান্ত বউ আছে। সতীনের দর্প তুই সইবি, পারবি সইতে—কেউ কখনো পারে? বোশেখি রোদে বালির শয়ন বরং সওয়া যায়, সতীনের তেজ অসহরণ। তা ছাড়া সারা শহরে ঢিঢি, আমাদের নাক-কান কাটা—'

'বেশ তো, তোমাদের যখন এত আপত্তি, হবে না এ বিয়ে—' বাধ্য মেয়ের মত পরমা ঘাড় নিচু করে বললে।

মেয়ের পিঠে হাত বুলুতে লাগলেন রাজেশ্বরী। এখন অনার্স নিয়ে পাস করেছিস, দাদা কোন না একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারবেন, আর আজকাল বিয়ের বাজারে চাকুরে মেয়ের দাম কত। কত রাঙা ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্তুর আসবে। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব একসঙ্গে। একটা প্রাচীন বিবাহিত প্রৌঢ় এর তুলনায় কি, হাতির কাছে গঙ্গাফড়িং। সতীনের সংসার তো ভয়ের সংসার, প্রলয়ের সংসার, সেখানে কেউ মাথা পাতে? স্বামীর ভালোবাসার নিশ্চয়তা কি। রুক্মিণী ছেড়ে কখন আবার সত্যভামার দিকে হেলবে তার ঠিক আছে?

'তোমাদের যখন এত অমত তখন যাব না ও-পথে।' পরমা সরল মুখে বললে।

অন্নপথ্যের দিনে জ্বরো রুগীর যেমন আহ্লাদ তেমনি অন্তরে-অন্তরে খুশি হলেন রাজেশ্বরী। এত সহজেই মেয়ে বশ মানবে ধারণা করতে পারেননি। অসম্ভবের চেহারাটা বোধহয় তাঁর কাছে স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। শুধু বিকৃতির নয়, বিপত্তির চেহারা। রাজেশ্বরী মেয়ের রুক্ষ মাথায় তেল ঘষতে বসলেন।

কূজনহীন পাখির মত কটা দিন স্তিমিত হয়ে রইল পরমা। কোথাও গেল না, বেরুল না দাঁড়াল না একবার জানলায়। শুয়ে-বসে কাটাল আর মনে মনে শুধু এই দীপটি জেলে রাখল, ছুটির দরখাস্ত করেছেন আর তা বিয়ে করবেন বলে।

কিছু তবু একটা করেছেন এতদিনে। কিন্তু কার সঙ্গে না জানি বিয়ে।

একটা চিঠি লিখবে লুকিয়ে? কাকে দিয়ে খাম আনাবে, কাকে দিয়ে ফেলবে বাক্সে? যদি ধরা পড়ে যায়! এ-বাড়িতে কেউ তার মিত্র নেই, মলয় পর্যন্ত শাসনের ভয়ে থরহরি। এটা লঙ্কাপুরী। এখানে রাবণের রাজত্ব আর তার বোন শূর্পণখার।

তার প্রথম চিঠির এমনি করে জাত যাবে! দরকার নেই চিঠিতে। তুমি কি করতে আছ? যাকে বিয়ে করবে সে তো বন্দিনী। তার কি করবার! তুমিই তো জারি করবে মুক্তির পরোয়ানা। লালকালির প্রজাপতি ওড়ানো চিঠি।

ছুটি মঞ্জুর হল না, কমিটির শেষ মিটিং থেকে বাড়ি ফিরে এসে ঘোষণা করলেন মণিলাল।

কি ব্যাপার? রাজেশ্বরী এলেন ছুটতে ছুটতে। পরমাও দেয়ালে কান পাতল।

কমিটি বললে, কাকে বিয়ে করবে নাম বাতলাও।

নলিনেশ বললে, আমি তা প্রকাশ করতে বাধ্য নই। আমি বিয়ে করছি, আমার ছুটির দরকার, কমিটির কাছে এইটেই প্রশ্ন, কাকে বিয়ে করছি এটা অবান্তর, অবমাননাকর।

কমিটি বললে, কমিটির সন্দেহ হচ্ছে এ-দরখাস্ত খাঁটি নয়। তাই তা নির্ধারণ করবার জন্যে নাম দরকার, ধাম দরকার, যাতে সহজে যাচাই করতে পারে কমিটি। যদি তদন্তে জানা যায় এমন কোনো প্রস্তাব আদৌ কোথাও নেই, তা হলে ছুটির দরখাস্ত ভুয়ো সাব্যস্ত করতে দেরি হয় না।

আমার বিয়ে করবার ইচ্ছেটা যদি খাঁটি হয়, তা হলেই যথেষ্ট। বিয়েটা সত্যি ঘটে উঠবে কি না, সেটা জিজ্ঞাস্য নয়। বললে নলিনেশ। এমনও হতে পারে আমি পাত্রী দেখে নেব ছুটির মধ্যে।

কিন্তু দরখাস্তে বলা হয়েছে, বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন তা সম্পন্ন করবার জন্যেই ছুটি। আমাদের নাম-ধাম দরকার কোথায় সেই সম্পাদনার সম্ভাবনা।

কমিটির একজন মেম্বর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, আপনি তো বিবাহিত এবং সেই স্ত্রী এখনো বেঁচে। এই অবস্থায় আবার বিবাহ কিসের?

সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং যাকে বিয়ে করছি তার। এ নিয়ে কমিটির কিছু মাথা ঘামাবার নেই। এ যুক্তি নলিনেশের।

সেই জন্যেই তো ঠিকানাটা বেশি দরকার এইটেই তদারক করবার জন্য যে, সেই ভাবী স্ত্রী জানে কি না ব্যাপারটা। নাকি তার চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে?

আর একজন সভ্য চেঁচিয়ে উঠল : সেই সঙ্গে আগের স্ত্রীর ঠিকানাটাও দরকার। এবং তাঁকেও এটা জানানো দরকার, সমাজের দিক থেকে মানবতার

দিক থেকে যে, তাঁর পতিদেবতা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করছেন। হয়তো এতে তাঁর সম্মতি নেই সমর্থন নেই।

এ কি মফস্বলী দুষ্কাণ্ড! আমার ছুটির মধ্যে আমার স্ত্রী, ভাবীই হোক ভূতপূর্বই হোক, আসে কোত্থেকে? এ-তর্ক কিছুতে ছাড়বে না নলিনেশ।

আসে দরখাস্তের সত্যাসত্য বিচারের প্রসঙ্গে। এবং এ-আসাটা সমীচীন তো বটেই, স্বাভাবিকও। এ উত্তর কমিটির। যদি কেউ স্ত্রী অসুস্থ বলে ছুটি চায় এবং যদি কমিটির সন্দেহ হয় তার স্ত্রী নেই, তা হলে কমিটি সেই সন্দেহের নিরাকরণের জন্যে প্রমাণ চাইতে পারে না? একশোবার পারে। সুতরাং নাম-ধাম দিতে হবে।

নাম-ধাম পারব না দিতে। নলিনেশ দৃঢ়স্বরে বললে।

তা হলে ছুটি না-মঞ্জুর। কমিটি এক বক্যে রায় দিল।

তা হলে বেশ, কথার পিঠে কথা এসে গেল, বললে নলিনেশ, আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

পরমার বুকটা ছাঁত করে উঠল।

'দিয়েছে? তাই দিক। তাই দিক।' রাজেশ্বরী মনে মনে করতালি দিয়ে উঠলেন : 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাক।'

'মৌখিক হলে চলবে না, সবকারিভাবে ইস্তফাপত্র দাখিল করতে হবে। তা এখনো করেনি। করলেই গ্রহণ করবে তা কমিটি। এরকম ঔদ্ধত্য, কমিটির নির্দেশকে মুখোমুখি অবমাননা করাব চেষ্টা এ ক্ষমার অযোগ্য। কমিটি এমন প্রফেসর চায় না যে কপট দুর্বিনীত, মিথ্যাবলম্বী।'

'তা হলে চাকরিটা যাবে?' বাজেশ্বরী আবাব লোলিয়ে উঠলেন।

'যার কণামাত্র সম্মানবোধ আছে সেই এর পব দিযে দেবে ইস্তফা।' বললেন মণিলাল।

'উঃ, ঘরপোড়া তা হলে পালাবে এই দেশ ছেড়ে?'

'না পালায় তো তাড়িয়ে ছাড়ব। কোন ভীমরুলেব চাকে খোঁচা দিতে এসেছেন বুঝবেন এবার বাছাধন।'

চাকরি গেলে খাবে কি? ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে। টিউশনিও জুটবে না। না বা নোট লেখা। খুঁটি না থাকলেই ঘর পড়বে। খুঁটি না থাকলেই লড়বে না আর মেড়া। বাঁচা যাবে।

তখন, পরমার ঘরের দিকে ক্রূর চোখে তাকালেন রাজেশ্বরী, তখন সেই চাকরিহারা বাউণ্ডুলে লোকটার বিয়ের বাজারে দাম কি? ফক্কা!

চাকরিশূন্য মানুষ না গঙ্গাশূন্য দেশ। সে-দেশে কে বাস করে? বা ভজনশূন্য মালা। সে-মালা কে ফেরায়?

একে ঝুনো বয়স তার উপরে বেকার। যেন উজান নায়ে উলটো বাতাস। এ নৌকোয় যে চড়বে সাধ করে তার নির্ঘাত ভরাডুবি!

কিন্তু কি আশ্চর্য, আর খবর নেই, নলিনেশ চাকরিতে জবাবপত্র দিল কি না। নাকি কিল খেয়ে কিল চুরি করল? ছুটি মঞ্জুর হল না, বিয়ে ছুটে গেল, সর্বসমক্ষে অপদস্থ হল, তথাচ আবার করতে গিয়েছে চাকরি? মানুষটা একটা পুরুষ না?

কি করবে না করে!

কি করবে না করে? রক্তের নদীতে তুফান উঠল পরমার। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে খালি পায়ে। এক আকাশ তারার চেয়ে দু মুঠো আখার ছাই তার বেশি হল? একটা আশ্চর্য আরম্ভের চেয়ে বেশি দামি হল তার সেই দিনানুদৈনিক অভ্যেস? এত ভয় কিসের? কাকে ভয়? অভাবকে? সংগ্রামকে? দুর্নামকে? একসঙ্গে গড়ব একসঙ্গে লড়ব, না হয় একসঙ্গেই হারব। তাতে কি? তবু তো থাকব আমরা পাশাপাশি। অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা।

সত্যি, কি না জানি হল শেষ পর্যন্ত! মনে-বনে কি রকম যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হয়তো এখানে আর নেই। হয়তো নিজে-নিজেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সরে পড়েছে একা একা। নইলে ঐ অপমান কি কারু সহ্যের এলেকায়? যদি তাদের না-মঞ্জুরি মেনে নাও ও সেই সঙ্গে যদি ইস্তফা না দাও, তা হলে তার মানে দাঁড়ায়, তুমি কৃতদার হয়েও একটি কুমারী মেয়েকে তার অজ্ঞাতে ও অসম্মতিতে আঘ্রাণ করতে চলেছ! এর চেয়ে বড় কদাচার বড় প্রবঞ্চনা আর কি হতে পারে? তাই লোকে পাছে ভাবে সে অপরাধী, তাই সে সসম্মানে চম্পট দিয়েছে হয়তো।

তার মান শুধু ঐটুকু? নিজের ঐ মুষ্টিমেয় বিবেক।

তবু—তবু সে যাক সব ছেড়ে-ছিঁড়ে। দেখাক তার পৌরুষপ্রতাপ। কিছু একটা সে প্রমাণ করুক।

'ওমা, তুমি কি মনে করে?' কাকে দেখে রাজেশ্বরী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

'বা, আমার যে আজ বিয়ে। কই পরমা কই? সে এতক্ষণ কেন যায়নি আমাদের বাড়ি? তাকে ছাড়া কি বিয়ে হয়? আমাকে তবে সাজাবে কে? তাই তাকে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। পরমা! পরমা!' সদ্যজাগা পাখির মত কলধ্বনি করে উঠল সোহিনী।

'কোথায় বিয়ে হচ্ছে?'

'ওমা, সে কি, চিঠি পাননি?'

'চিঠিতে কি সব কথা লেখা থাকে?'

অলিখিত সব কথা বললে সোহিনী। কেমন জাতে-গোত্রে মিল, বয়সের অনুক্রমে, কেমন দাবিদাওয়াশূন্য, তা ছাড়া কেমন কৃতকর্মা, গুণী, কলকাতায় বাড়ি, চাকরি, বয়স আন্দাজে মোটা মাইনে। সব দিক দিয়ে নিখুঁত, মসলিন-মোলায়েম। কিন্তু, পরমা. পরমা কই?

'শরীরটা কদিন থেকে ভালো নেই। উপরে শুয়ে আছে নিজের ঘরে।' বললেন রাজেশ্বরী।

পায়ে যেন রুপোর নূপুর বাজছে এমনি ছুটতে ছুটতে উঠে গেল সোহিনী।

'তোর বিয়ে?' ব্যাকুল হয়ে সোহিনীর প্রসারিত ডান হাত চেপে ধরল পরমা . 'আশ্চর্য, ঠিকই শেষ পর্যন্ত হল? কোথাও এতটুকু আঁচড় কাটল না? গায়ে একটু ছড় লাগল না? একটা কাঁটা ফুটল না পায়ে?'

'একেবারে পুষ্পিত পথ।' সোহিনী মগডালে ফোটা বিরল ফুলটির মত হাসল : 'একেবারে মাখনের মধ্য দিয়ে ছুরি চালানো।' পরমাকে কেমন হালকা, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। বাদলার ছায়ায় ঢাকাপড়া দরিদ্র জ্যোৎস্নার মত। তার আঙুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সোহিনী বললে, 'চলতে চলতে কারু পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, কারু জুতোর মধ্যে একটি কাঁকর পর্যন্ত ঢোকে না। পথ কিছু নয়, পৌঁছনোই হচ্ছে কথা।'

'পৌঁছনো?' অনেক দূর থেকে যেন শোনাল পরমাকে 'পাওয়াই হচ্ছে কথা। কেউ-কেউ না পৌঁছেও পায়, আবার কেউ-কেউ পৌঁছেও দেখে পাইনি।'

'এ প্রশ্ন চিরকালের।' যেন শোকার্তকে মামুলি কথায় সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনি শোনাল সোহিনীকে 'কিন্তু দৈবের দয়ায় এমনো তো হতে পারে পৌঁছনো আর পাওয়া মিলেছে একসঙ্গে, এক সঙ্গমে। যেমন রবীন্দ্রনাথের গান। কথা আর সুর একত্র।'

'নীলুদার খবর কি?'

গভীর রক্তের স্তব থেকে নিগূঢ় আভা সোহিনীর মুখে ছড়িয়ে পড়ল। বললে, 'দুর্দান্ত খাটছে। কলাপাতা থেকে গ্যাস লাইট। কোথায় শামিয়ানা কোথায় শতরঞ্চি! যাকে বলে ঘরঝাঁট থেকে বৈষ্ণববন্দনা। যতই বলি, নীলুদা, তোমার কেন মাথাব্যথা, সে বলে, তুমি বিয়ের কনে, ঘাড় গুঁজে

বসে থাকো, তুমি কিছু বলতে এসো না। আমাকে খাটতে দাও—আমি না করব তো করবে কে? আজ আমার রানীর অভিষেক।'

নীলুদার কথা শুরু হলে থামতে চায় না সোহিনী, আজও না, মৃত্যুর মুখে পড়েও না। বাইরের নকশা-কাটা বিস্তীর্ণ পারিপাট্যের নিচে কোথায় কোন ভাঁজে বুনটে একটু ফাট আছে তা কে দেখে!

'নে, ওঠ্, যাবিনে?' হাত ধরে টানল পরমার।

'মাকে বলো।'

'বা, মাসিমাকে তো বলবই।' এসে পড়েছেন রাজেশ্বরী। 'মাসিমা, আপনিও চলুন।'

রাজেশ্বরী দেখছেন হিংসের চোখে আর পরমা তৃপ্তির। রাজেশ্বরী ভাবছেন, কি নিটোল কপাল করেই এসেছিল মেয়েটা, পাষাণে শস্য ফলিয়ে ছাড়ল। আর তাঁর অদৃষ্টে এই অপেয়ে মেয়ে যেন বৈরাগীর বাড়িতে বলিদান। একটা পছন্দ নেই, হায়া নেই, কাকে-ঠোকরানো দরকচাপড়া ফল, তাই দিতে চলেছে দেবতাব নৈবেদ্য। সমূহ বিপদ এখন কেটে গিয়েছে, কিন্তু মাছরাঙার কলঙ্ক যায় না, কখন আবাব কোন বেঘোরে নজর পড়ে তার ঠিক কি!

গেলেই খবচ, অন্তত একটা রুপোর সিঁদুরেব কৌটো, সহ্য হবে না কিছুতেই। নিজেব অনুপস্থিতিব ক্ষতিপূরণ বাবদ বললেন, 'পরমাই তো যাচ্ছে।'

তা তো যাচ্ছে। কিন্তু বলুন সকালেই ওব যাওয়া উচিত ছিল না? সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ওব দেখা নেই বলে আমি নিজেই চলে এসেছি। নইলে বিয়ের কনে কি এখন তার কোণ ছাড়ে? বিয়ে অথচ পরমা নেই, কি বলব যেন গীত আছে কৃষ্ণ নেই। নে ওঠ, একটু বেঁধেছেঁদে ঘসে-মেজে নে।' সোনাব আলোধরা রুপোব দীপদানেব মত দেখতে হল সোহিনী।

এত ভরা-ভর্বাতও কেউ হয়? সব পেয়েছি-ব দেশও তা হলে আছে জীবনের মধ্যে? সোহিনীব আনন্দকে পবমা ভাবতে চাইল নিজের আনন্দ বলে, তার সাফল্যকে নিজেব সাফল্য। এ পূর্ণতার চেহারার কাছে কে আর নিজেকে শূন্য বলে ভাবে? এমন তো নয় পূর্ণতা কোথাও মেলে না সংসারে। যদি কোথাও তার অস্তিত্ব থাকে, যেমন এখন দেখছে তার চোখের সামনে, তা হলে সেও পূর্ণ।

'বিয়ের লগ্ন কটায়?' জিগগেস করল পরমা।

'মধ্যরাত্রে।'

'তা হলে ফিরব কি করে?' বাধ্য মেয়ে মাকে শুনিয়ে বললে।

'নেই বা ফিরলি।' সোহিনী রাজেশ্বরীর দিকে তাকাল: 'নেই বা ফিরল আজ রাতে। কাল সকালে ফিরবে। বাসর-জাগন্তীদের মধ্যে ও থাকবে না এ হতেই পারে না।'

'সাব্বোনাশ!' রাজেশ্বরী হাঁসফাঁস করে উঠলেন: 'তা তুমি যদি ওকে দেখ—'

'আমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই—' সোহিনী বেঁকেচুরে হেসে উঠল।

'দাঁড়াও, তা হলে দাদাকে জিগগেস করি। অভিভাবকের মত নেওয়া দরকার।'

মণিলাল বললেন, 'আমার সঙ্গে ফিরবে।'

তখন তাঁকে নিয়ে পড়ল সোহিনী। পরমা কি এমনি একজন উটকো লোক যে, শুধু নিমন্ত্রণ খেয়েই চলে যাবে? ও আমার কতদিনের বন্ধু, রোদজলের ছাতা, বিয়ের সময় ও পাশে না থাকলে সাহস দেবে কে? কে আমার আনন্দের টিপ্পনী হবে? যূথিকা-লিপিকারা থাকছে, দীপালি-অঞ্জলি-অর্চনা-কল্পনা! ওও তাদেরই একজন, আমার আপনজন। আমার আসরে আর সকলে পিদিম, ও-ই ঝাড়লণ্ঠন।

'বেশ, যাক, কিন্তু আমি কাল ভোরবেলা গিয়ে নিয়ে আসব।' ফরমান দিলেন মণিলাল।

শাড়ি পরছে পরমা, কাছে গিয়ে বললে সোহিনী, 'আমার বিয়েতে আমাকে কি দিবি?'

'বল, কি চাস?'

চাওয়া কঠিন, দেওয়া কঠিনতর।

রিকশা নিল দুজনে।

বিয়ের লগ্ন কাছিয়ে এসেছে, হঠাৎ রব উঠল পাওয়া যাচ্ছে না কনেকে। সাজাগোজা অবস্থায় এইখানে এই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যেই তো ছিল, গেল কোথায় সোহিনী?

কোথায় আবার যাবে? যত সব অকারণ হৈচৈ। বাথরুমে গিয়েছে।

হ্যাঁ, বাথরুমেই গিয়েছে। ঢুকে বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। পরমাকে আগেই পাঠিয়েছে সেখানে. তারপর এখন নিজে ঢুকল। ছোট ঘরে দুজনে দাঁড়াল মুখোমুখি। যেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম এখন স্তব্ধ।

নিজের দু হাতের দুগাছি চুড়ি খুলে পরমার দু হাতে পরিয়ে দিল সোহিনী। বললে, 'বিয়ের লগ্ন আজ শুধু আমার নয়, তোরও। আর নে এই কিছু টাকা। হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিল ভাঁজকরা কটা নোট।'

'টাকা?'

'হ্যাঁ, টাকা। জেব ছাড়া দৈব নেই, তেমনি টাকা ছাড়া প্রেম নেই। নে, রাখ বুকপকেটে।' সোহিনী নিজেই পরমার ব্লাউজের মধ্যে হাত ভরে দিল: 'আর শোন, কদমতলার কাছে রিকশা দাঁড় করানো আছে, নীলুদাকে বলেছি, সেই রেখেছে ঠিক করে। জানাশোনা বিশ্বাসী রিকশা। পারবি যেতে?'

'খুব পারব।' দ্রুত অথচ গভীর রোমাঞ্চের মধ্যে অকস্মাৎ এসে পড়েছে, গায়ের সমস্ত রক্তবিন্দু যেন লাল হয়ে উঠেছে পরমার।

'ব্ল্যাক আউটের রাত, ভয় করবে না তো?'

'করবে না।'

'নীলুদাকে দিতে পারতাম সঙ্গে, কিন্তু কেউ দেখলে অন্য মানে না করে বসে।' সোহিনী প্রায় আইনের ধার দিয়ে হাঁটল: 'এ সব ক্ষেত্রে গোড়াতে একাই বেরুনো উচিত। নিজের দায়িত্বে। তা হলে নিজের থেকে বেরিয়ে আসাই হয়, অন্যের বার করে নেওয়া হয় না—'

'অত ব্যাখ্যার দরকার নেই।' ছুঁচের মুখে মুহূর্তের ডগায় এসে পরমা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

'আর শোন, যদি পথে কেউ কিছু জিগগেস করে, বলবি, আমার বিয়েতে এসেছিলি, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিস।'

'বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নলিনেশবাবুর বাড়িই এখন তোর বাড়ি। সে বাড়ির নাম করবি। সতী নারীর মত মামার বাড়ির নাম করবিনে। যদি বলে মণিলাল হাজরা আপনার কে হয়, বলবি, চিনিনে। বলবি নলিনেশ সরকারই আমার সব। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব—পারবি না বলতে?'

'প্রাণ ভরে পারব।'

'আর আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরুবি না, ঘর খানিকক্ষণ অন্ধকার রেখে পরে বেরুবি। ফাঁক বুঝে বেরিয়ে পড়বি রাস্তায়। খানিকটা হেঁটে কদমতলায় রিকশা পাবি। যদি দেখিস সেখানে একাধিক রিকশা, তখন গফুরালির কোনটা জিগগেস করবি। ভাড়া-টাড়া দিতে হবে না। সিধে চলে যাবি বৈকুণ্ঠে।'

বিয়ে-বাড়ির ভিড়ের থেকে পিছলে বেরিয়ে এল পরমা। হুডতোলা রিকশা, ঠিক, এইটেই গফুরালি। চলো, জানো তো কোথায়? জানি। যদি আরো দূরে যেতে বলেন তো আরো দূরে।

অন্ধকার রাত, ছুরির ফলার মত অন্ধকার, নির্জন রাস্তা, অচক্ষু

গহ্বরের দিকে যা নেমে গিয়েছে, অচেনা রিকশাওয়ালা, কে জানে ব ছদ্মবেশী কৃতঘ্ন—তবু উত্তেজনার তাপের মধ্যে ভয়ের ঠাণ্ডা হাতকে ঢুকতে দিল না পরমা। অগাধ আশ্বাসের মত জেগে রয়েছে একটি অতন্দ্র আকাশ, সমস্ত না-জানার পরেও যে জানা, সমস্ত ভুলের পরেও যে নির্ভুল।

ভারি পায়ের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে ধারেকাছে, একটা টর্চের আলোও তার গায়ের উপর ছিটকে পড়ল। গেঁয়ো মফস্বলী শহরে জঙ্গী অত্যাচারের কথা কানে এসেছে অনেক—গা-হাত-পা ভার হয়ে উঠল পরমার। কিন্তু না, এলেকা ঠিক পার করে নিয়েছে গফুরালি।

পরমার মনে হল আসল ভয় সামনে। সে-ভয়ের প্রতিকার কি, প্রতিরোধ কোথায়? সে-ভয়ের বিরুদ্ধে আক্রম-বিক্রম করবারও পথ নেই। উপায় নেই আর্তনাদে দীর্ণ করি শূন্যতা। ক্রুদ্ধ মত্ত হই। কারু কাছে বা অভিযোগ করি, সাহায্য চাই। আগুন জ্বালাই কাগজে।

সে-ভয় নিষ্ক্রিয়তার ভয়, অমনোযোগের ভয়। যদি বলে আমি প্রস্তুত নই, আরো কিছুকাল দিন গুনি। যদি বলে, তুমিও আরো কিছুকাল প্রতীক্ষা করো। যাচাই করে দেখ। যা চাও তাই সত্যি আমি কিনা।

চাওয়াটাই পাওযা। আর পাওয়াটাই হচ্ছে চাওযা। যদি সত্যি পেতে চাও পেয়ো না। কে জানে হয়তো এমনি ফাঁকা দর্শনের বুলি আওড়াবে।

হয়তো চোখের সামনে পরমা দেখবে কে এক মন্ত্রহারা গুণী। সুর-খোয়ানো গায়ক। কোন অকৃতী কবির পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির মতই পড়ে আছে এক কোণে। ধূলিমাখা হয়ে। ধ্বনি নেই স্পন্দ নেই তরঙ্গ নেই।

তা হলে কি করবে পরমা? কাঁদবে? সাধবে? চুল ছিঁড়বে? মাথামুড় খুঁড়বে? কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝগড়া করবে? গঞ্জনা দেবে? শঠ-কপট বলবে?

তারপর ফিরে যাবে বাড়ি? ছোট মাছধরা জালে কুমির ধরতে পারল না বলে বুক চাপড়াবে?

গফুরালি বলেছিল যদি দরকার হয় তো আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা তাকে বলে দেয়নি সোহিনী। যেন গফুরের কথা ফলে, গফুর যেন পয়া হয়। যেন বাড়বাড়ন্ত হয় সোহিনীর।

তার চেয়ে আরো ভয় যদি নলিনেশ না থাকে। যদি আর তাকে না দেখে পরমা। ছুটি দিল না বলে যদি রাগ করে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যায় কলকাতা।

তবু বেকারের চেয়ে বেগার ভালো। তবু তার পৌরুষের প্রমাণস্বরূপ কিছু একটা করেছে। কোথায় গেছে ঠিকানা না জানাক তবু তার কাজে

ইস্তফা দেওয়ার সাহসের মধ্যেই রয়েছে তার চরিত্রের ঠিকানা। সে-ঠিকানায় জীবনের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিঠি দেব প্রত্যহ।

সে-ঘটনার মধ্যে তবু যেন আশা আছে। চাষার আষাঢ় মাস আছে। ঘৃত ছাড়া যজ্ঞ নেই। তাই আশা ছাড়া বাসা নেই।

এখন যাক, পরে নিশ্চয়ই দেখা হবে একদিন। কি অবস্থায় হবে, তখন কি শুধু সরল বাঁশ না বাঁশের পাবে ছিদ্র, কে জানে! তবু যেন আরেকবার দেখা হয়। আরেকবার যেন সে মুখের নিশ্বাস ফেলে বাঁশিতে।

ভগবান, যেন তার বাড়িঘর সব অন্ধকারে মোড়া থাকে। ঘুমের অন্ধকার নয়, পলায়নের অন্ধকার।

কিন্তু পরমার বুকের মধ্যিখান দিয়ে হঠাৎ একটা ফিনফিনে তরোয়াল চলে গেল যখন দেখল দরজার দু পাল্লার ফাঁক দিয়ে সরু একটা আলোর রেখা বাইরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

আছে? জেগে আছে?

বিলাসী ঠুকঠুক নয়, একেবারে দুই হাতে ডাকাতপড়া ধাক্কা মারতে লাগল পরমা। ওঠো, দোর খোলো, আমি এসেছি।

যদি দোর না খোলে! যদি চিনতে পাচ্ছি না বলে! দুষ্মন্তের মত যদি ফিরিয়ে দেয় শকুন্তলা!

বই পড়ছিল নলিনেশ। উঠে দরজা খুলে দিল।

নাগিনী নদীর মত তোলপাড় করে উঠল পরমা। 'শিগগির উঠুন, চলুন, কোথায় কি আছে ভাবতে হবে না, কাল কি করবার তাও নয়, বেরিয়ে পড়ো এইমাত্র। হ্যাঁ, এইমাত্র, এই মুহূর্তে। রিকশা নিয়ে এসেছি, বান্ধব রিকশা।'

'কোথায় যাবে?' যেন ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে বললে নলিনেশ।

'বলতে পারতাম যেদিকে দু চোখ যায়, কিন্তু আপাতত ইস্টিশানে। কতক্ষণ পরেই ডাউন একটা ট্রেন যায় সেই ট্রেনে কলকাতায়।'

'উঠব কোথায়?' মেলার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল নলিনেশ।

'তা আমি কি জানি! তোমার—আপনার দায়িত্ব আপনি জানেন।'

তবু যেন অথই, পায়ে মাটি পাচ্ছে না নলিনেশ এমনি অসহায় ভাব করল।

'আপাতত কোনো হোটেলে।'

'টাকা? টাকা কোথায়?' নলিনেশ হাতড়াতে লাগল।

'কেন, নেই কিছু টাকা? যা কিছু সামান্য—'

'খুলে দেখ না মনিব্যাগ। ঐ তো টেবিলের উপর পড়ে আছে। এখন মাসের প্রায় শেষ, এখন হাত খালি—'

'দরকার হবে না। আমার কাছে টাকা আছে।'

তোমার কাছে? কত, ভাগ্যিস জানতে চাইল না নলিনেশ। জানতে চাইলেও উত্তর প্রস্তুত ছিল পরমার। অসংখ্য, অজস্র, অফুরন্ত। শুধু মোহিনীর উপহার নয়, এ টাকা আছে মানে জীবনে সাহস আছে, বিশ্বাস আছে, উৎসাহ আছে।

'হোটেলে কতদিন থাকব?' নলিনেশ এমন ভাব করল যেন এ-ও পরমাই বলে দেবে।

'বেশিদিন নয়। সুপ্রভাত নতুন বাড়ি-ভাড়া নিয়েছে, বিয়েটা চুকে গেলেই সেখানে সংসার পাতবে—তখুনি আমরা সেখানে থাকতে যাব। যতদিন আমাদের না একটা আস্তানা হয়।'

এ তো দেখছি লম্বা প্রোগ্রাম! আর নলিনেশই তার ক্লান্তকায় সভাপতি। উপায় নেই, একবার যখন নিমন্ত্রণ নিয়েছে, কার্ডে নাম ছাপতে দিয়েছে, তখন নির্ঘণ্টের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতে হবে, বিদায়-সঙ্গীত পর্যন্ত।

দোকানে ঢুকে পকেটকাটার মতন মুখ করে নলিনেশ বললে, 'আমার চাকরি?'

'ছাড়েননি?'

'কই আর ছাড়লাম!'

'সমস্ত অপমান হজম করলেন?' দুই চোখে কালো আগুন ঝলসে উঠল পরমার।

'তাও না। তীর যখন ছুঁড়েছি, তখন আর তা ফেরানো যাবে না।' হাত বাড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে গায়ের পাঞ্জাবিটা তুলে নিল নলিনেশ: 'ছুটি নিয়ে করব ভেবেছিলাম, পরে দেখলাম ছুটি পেয়েও তো করা যায়। আশেপাশে কতই তো ছুটি আছে। মিছিমিছি চাকরি খুইয়ে লাভ কি? দুদিন আগে আর পরে। তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থেই তো ভালো—'

ধীরেসুস্থেই জামাটা গায়ে দিল নলিনেশ। মনিব্যাগ আর কি কি সব দরকারি কাগজপত্র কুড়িয়ে ভরে নিল পকেটে। চয়ন সিংকে ডাকল, আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি কি বোঝাল তাকে। চুলটা আঁচড়াল। কোঁচাটা ঠিক করল। আটপৌরে স্যান্ডেল ছেড়ে পোশাকি জুতো পরল। যেন কলেজ যাচ্ছে। কিংবা বাজারে যাচ্ছে।

ধীরসুস্থেই সব দেখছে পরমা।

'কিন্তু কিছুই ধীরেসুস্থে হবার নয়—সতীশক্তি যখন দরজায় এসে

দাঁড়ায়।' দিব্যি হাত বাড়িয়ে পরমার হাত ধরল নলিনেশ। বললে, 'তুমি তো আমার হাতে পড়নি। আমিই তোমার হাতে পড়েছি। তোমার সোনার তরী কোথায়?

গফুরালি হর্ন বাজাল।

'চলো—'

কিন্তু এই কি সেই ডেকে নেবার বুকে তুলে নেবার কণ্ঠস্বর? আবেগ নেই, আগুন নেই, উত্তাপ নেই, উল্লাস নেই। ষড়যন্ত্রের যে একটু ফিসফিসানি থাকে, তাও পর্যন্ত নেই। অন্তত যোগসাজসের চুপচাপ। তাও না। যেন কোনো প্রবন্ধ-পড়া মিটিঙে যাবার কথা, তাই যাচ্ছে একসঙ্গে। সাদামাঠা কাষ্ঠ কণ্ঠ। সুর নেই, রঙ নেই, গন্ধ নেই।

এই বুঝি তার সেই অভিসারের রাত, এই বুঝি সে দৈন্যের দেশ থেকে চলেছে প্রাচুর্যের দেশে। দাসীর পদ ছেড়ে রানীর পদে। ঘুপসি মফস্বল ছেড়ে দীপজ্বলা রাজধানীতে।

কিন্তু উপকরণ কে দেখে! সুধা কোন পাত্রে আছে কে দেখে তার কারুকার্য। এ এমন সুধাপাত্র উজাড় করে উপুড় করে ঢেলে দিলেও তার এক ফোঁটা ক্ষয় হয় না।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' রিকশা চলতে শুরু করলে জিগগেস করল পরমা।

'ঐ যে বললে ইস্টিশানে '

'সেখান থেকে?'

'সেখান থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে কলকাতা।' সমস্ত ছক যেন মুখস্থ নলিনেশের 'কলকাতায় প্রথমটা হোটেল, পরে দু-তিনদিনের মধ্যেই সোহিনীরা তাদের নিজের বাড়িতে গেলে সেখানে। সেখানে বিয়েটা সমাধা করেই আবার এখানে, স্বধামে।'

'এখানে ফিরব আমরা?' পরমা নিজেই এবার নলিনেশের হাত চেপে ধরল: 'আমি ভেবেছিলাম আর বোধহয় ফিরব না।'

'বা, তা কেন? মরু-বিজয়ের কেতন ওড়াব না এসে? কমিটির মুখের কাছে তুড়ি বাজাব না? ধরব না চাকরি?'

কি জ্বলন্ত আনন্দ! একটি জ্বলন্ত শিখা মাথায় ধরে এখানেই সাম্রাজ্য স্থাপন করব। আর ভয় নেই, মহৎ যুদ্ধে জয়ী বীর সৈনিকের মত দাঁড়াব সকলের সামনে। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দ্রোহ নেই। দুর্ভাগ্য নেই। কুমারী মৃত্তিকা ফুলন্ত হয়ে উঠেছে।

'তবে এ-কটা দিন যে চাকরি থেকে গরহাজির থাকবেন?'

'কলকাতা থেকে কাজুয়েল লিভের দরখাস্ত পাঠাব। কারণটা এবার বিয়ে দেব না। দেব অসুখ, দাঁতের ব্যথা। ছুটি, অল্পদিনের ছুটি—এতে কমিটি লাগবে না, মঞ্জুর হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। রাতের নিরালা হাওয়া ঠান্ডা হাতে আদর বিলোতে লাগল।

'আকাশের নীলোজ্জ্বল থালায় কত হীরের টুকরো দেখেছ?' নলিনেশ বললে সামনের দিকে তাকিয়ে: 'গুনে নাকি শেষ করা যায় না। কিন্তু আমি গুনে দেখেছি দুটি টুকরো কম।'

'কম?' অন্ধকারে চোখ বড় করে তাকাল পরমা।

'সে দুটি আমার হাতের মধ্যে।' পরমার দুটি চোখ স্পর্শ করল নলিনেশ।

পরমা বললে, 'আমার কোনো দাম নেই।'

'টিকিট কেটে পিন দিয়ে গায়ে সাঁটা নেই বুঝি? দাম জিনিসে নয়, দাম দিতে পারাব মধ্যে, দেখতে পারার মধ্যে। মধ্যরাত্রিব আকাশের কি দাম থাকত যদি আমরা না এমনি পথে বেবিয়ে তাকে দেখতুম। তেমনি তোমার দাম আর কিছুতে নয়, আমার আনন্দেব মধ্যে, আশ্চর্য হযে যে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে, সেই আশ্চর্য দৃষ্টির মধ্যে।'

সব চর্যেরই শেষ আছে, আশ্চর্যেরই শেষ নেই।

'কলকাতায় আপনার কোনো আত্মীয়েব বাসা নেই?'

'না, আছে বৈকি।'

তবে হোটেলে না উঠে তেমন কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলে ভালো হত না? আর কিছুর জন্যে নয়, দ্বিতীয় জামাকাপড় নেই কারো, নেই বা বিছানাপত্র। হোটেলের লোক কি ভাববে?'

বাড়ির লোকও স্বর্গ ভাববে না। জামাকাপড় বিছানা বালিশ কিনে নেব কলকাতা পৌঁছেই। আর যা যা দরকারি। মনিব্যাগে টাকা না থাক, ব্যাঙ্কে আছে কিছু খুদকুঁড়ো। সে-সবে তোমার ভাবনা নেই। ভাবনা যা আছে, তা হচ্ছে উমাশশী। আত্মীয়ের মেলায় গেলে সেইটেই ভয়, কখন না পিঁপড়ের পায়ে হেঁটে হেঁটে তার কানে গিয়ে খবর ওঠে। হয়তো শেষে বেরুবে জৌনপুরে-কানপুরে নেই, আছে যাদবপুর না মমিনপুর, আর এখন তার খান্ডার মূর্তি। উমাশশী ছিল, এলোকেশী হয়ে গিয়েছে।

'আমি ওসবে আর এখন ভয় পাই না।' নলিনেশের বাহুর পাশে গাল রাখল পরমা।

'হোটেলকে ভয় পাও?'

'তাও না। আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই আমি নির্ভয়।'

'আবার আপনি?' ধমক দিয়ে উঠল নলিনেশ।

পরমা হাসল। বললে, 'এখন সহজে আনতে পারছি না তুমিটা। মনে হচ্ছে সে-রাতটা না কেটে যাবার আগে আসবে না ঠিকঠাক।'

'কোন রাত? বিয়ের রাত?' জিগগেস করল নলিনেশ।

'হ্যাঁ, তাই—'

থার্ড ক্লাস কামরায় কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পরমা। গাঁয়ের মাঠে সন্ধ্যা হয়ে এলে অন্ধকার যেমন গালে হাত রেখে শোয় তেমনি শুয়েছে। আশার রঙমশাল নয়, বিষাদেব মেঘচ্ছায়া। কিছুতেই শুনল না, দমল না। ঠেকানো গেল না। ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পাখি বনের পাতার কুঞ্জ ছেড়ে খাঁচায় এসে ঢুকল। নিজে ধরা দিয়ে গৃহস্থকে খুশি করতে চাইল। তোমার অগাধ দুই পাখার আলোড়নই আমার আনন্দ ছিল, কেন সঙ্কুচিত হতে চেয়ে বঞ্চিত হতে গেলে? যদি বিশ্রাম করতেই চাইলে, এক পাখির বন্ধু যে আর এক পাখি, এক ডালে পাশাপাশি বসা, তেমন কেন বন্ধু হলে না? শুধু তুমি জানতে আর আমি জানতাম তুমি আমার মর্মের গেহিনী নর্মের সহচরী। আমার অনাবশ্যকের অবকাশ। আমার হাতের ছাড়চিঠিটি চিরকাল তোমার বুকে করে রাখতে। কেন তুমি অনেক রাত না নিয়ে শুধু সেই রাত, এক রাত, বারে বারে একই রাত নিতে গেলে?

মাথার চুল কপালকে ছোট করে কতদূর পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেই কপালের কাছেকার চুলে হাত বুলুতে লাগল নলিনেশ। এক ঝলক মেয়ে কিন্তু এক আকাশ আলো। এই হাড়মাসের হিজিবিজির মধ্যে কোথায় সেই অলৌকিকের ঠিকানা। লোকে বলে অলৌকিক বলে কিছু নেই। এই যে পরমসুন্দর প্রেম যে পাঁককে সোনা করে, তুচ্ছকে অসীম, হাড়মাসের কাঠামোতে প্রতিমার লাবণ্য আনে, এ কি অলৌকিকের কম?

একটা মধ্যবিত্ত হোটেলে ঘর নিল ছোট ঘর, একটিমাত্র প্রাণীর পক্ষেই পরিমেয়। মানপাতাতেই কুলোবে তেঁতুল-পাতায় কুলোবে না এ কে বললে? যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় দুজন।

ম্যানেজারের খাতায় স্পষ্ট করে সত্য নাম-পরিচয়ই লিখলে নলিনেশ। সত্যের মত স্বস্তি নেই। ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য, যে যাই বলুক, একমাত্র সত্যই স্বচ্ছ। সব সওয়া যায় হাসিমুখে যদি সত্য বুকে থাকে। শুধু সত্য দিয়েই সব সুন্দর।

ম্যানেজার একবার তাকিয়েছিল তেরছা চোখে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, যুদ্ধে যখন সমস্ত কিছু বিপন্ন, সমস্ত কিছু ঘোলাটে, তখন কে আর তলায়। উপর-উপর চলে যাও।

আইনের কি সব বায়নাক্কা তারই খোঁজে বেরিয়েছে নলিনেশ আর পরমা তার ছোট ঘরের ক্ষণিক সংসারিতে সোনালি জলের পাড় বুনছে। একেবারে যেন ধর্মশালার চেহারা না নেয়, লাগে যেন গৃহস্থালির সুর। নতুন রোদের প্রসাধন। যদি বিরলতা কিছু বা থাকে তা আনুক মন্দিরের নিভৃতি। শুভ্রতাই বেশি উচ্চারণ পাক। একটু ধূপ পুড়ুক। কিছু ফুল থাক এখানে-ওখানে।

আদিমের ঘরে কি আইন থাকে? আন্তরিকতার দেশে কে দেখে আঙ্গিকের খুঁটিনাটি?

এইবার বুঝি গভীর রাত্রে সেই গুহা, সেই প্রাচীন মৌন কথা কয়ে উঠবে? যে পর্বতচূড়ায় কেউ ওঠেনি, সেই পর্বতচূড়ায় দাঁড়াবে গিয়ে দুজনে? যে নির্জনতম সমুদ্রতীরে কেউ কোনোদিন যায়নি সাহস করে সেইখানে বসে তারা ঢেউ নেবে? যে ঈশ্বরকে দেখা যায়নি কখনো দেখবে সেই পরিপূর্ণকে!

কিন্তু এমনি করেই আসবে, এ কি কেউ ভেবেছিল? এমনি করে! সকালবেলাই হোটেলে পুলিশের আনাগোনা।

কি ব্যাপার?

আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। নলিনেশকে বললে দারোগা।

নলিনেশ পড়ল পরোয়ানা। বললে, 'এ কি দণ্ডবিধির আইন, না দণ্ডকারণ্যের?'

'সে-কথা কোর্টে গিয়ে বলবেন।'

'তা তো বলবই। কিন্তু আপনাকেও বলি। যে মেয়ে গ্রাজুয়েট সে নিজের ইচ্ছায় ঘর ছাড়তে পারবে না?'

'নিজের ইচ্ছায় কিনা সেইটেই জিজ্ঞাস্য। না কি ফ্রড না ফোর্স—' মোটা মোটা গলায় বললে দারোগা।

'বেশ তো জিগগেস করুন না ভদ্রমহিলাকে।' প্রশ্নালু চোখে পরমার দিকে তাকাল নলিনেশ। মুখ টিপে টিপে হাসছে পরমা। যেহেতু নলিনেশ প্রশান্ত পরমাও সপ্রতিভ।

'সে যা হয় জিগগেস করব থানায় গিয়ে, আপনার অগোচরে।' নাকের ডগাটা তীক্ষ্ণ করল দারোগা: 'এখন এসব প্যাক করুন।'

এক রাতের হাটের বেসাতি গুটোতে বসল পরমা। কথায় বলে নতুন

হাটে যত যায় তত বিকোয় না। এ কি তাই হল? পাঠের জিনিস মাঠে গেল?

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, এঁরাই সব সীজ্ করবেন।' নলিনেশ বাধা দিল: 'আমরা এখন আসামী আর এসব আলামত। এখন আমাদের প্রোগ্রাম কি?'

'আপাতত এখানকার থানায়--'

'কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবেন? দুজনকেই?' নলিনেশ স্বর বেশ তরল রাখতে পেরেছে: 'মন্দ হয় না তা হলে। নতুন গ্রন্থিতে বাঁধা হয় গাঁটছড়া।'

সমস্ত হোটেল ভেঙে পড়েছে, শুধু হোটেল নয়, রাস্তা-পার্ক, সামনের-পাশের যত জানলা-বারান্দা। আষাঢ় এখনো আসেনি, কিন্তু আষাঢ়ে গল্পের কমতি নেই। কার বিবাহিত স্ত্রী বার করে নিয়ে এসেছে, কেউ বললে ডাকাতি করে, কেউ করলে আরো বীভৎস কটূক্তি। বস্তু একই নাম আলাদা। যার মনের যাতে স্বাচ্ছন্দ্য সে তাতেই ছন্দ মেলাচ্ছে।

পুলিশের লোক ট্যাক্সি নিয়ে এল। একটা গাড়িতেই তুলল দুজনকে। পরমার মনে হল বিয়ের পর যেত যখন শ্বশুরবাড়ি এমনি কি ভিড় হত দরজায়? এত কৌতূহলাকৃষ্ট দৃষ্টির জনতা কি সংবর্ধনা করত তাকে?

এমনিতে হলে মাথায় ঘোমটা থাকত, চোখে থাকত লজ্জার কুহেলি, হয়তো বা বিষাদের নম্রতা। কিন্তু এখন, এখন বেশ ভালো লাগছে দেখতে, মাথায় ঘোমটা নেই, উন্মুক্ত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে পারছে চারপাশে, একটু বা ক্ষমা ও অনুকম্পার সঙ্গে, ভঙ্গিতে স্পষ্ট জয়ের ঋজুতা। মেয়েটার কি সাহস লোকে বলুক, কি সত্যের ঔজ্জ্বল্য তার চোখে-মুখে। লোকে বুঝুক, তাকে বার করে এনেছে না সে-ই বার করিয়েছে। থানা-আদালত মন্দ কি, পরমা তা হলে একবার দাঁড়াতে পারে সকলের সামনে, উচ্চকণ্ঠে জানাতে পারে তার বাঞ্ছিত সত্য কথা। সে না জানি কত বড় সুখ, কত বড় গর্ব। সূর্য কখনো তার পূর্বদিক ত্যাগ করে না। তেমনি আমিও ত্যাগ করি না আমার সত্য, আমার পূর্বদিক।

'এখানকার থানার পর কোথায় যেতে হবে?' ট্যাক্সিতে জিগগেস করল নলিনেশ।

'যেখান থেকে আপনাদের অ্যারেস্ট করার রিকুইজিশন এসেছে, সেই মফস্বলের শহরে আপনাদের পাঠিয়ে দেব।'

'বলেন কি! আবার সেইখানে?' এবার যেন নলিনেশ ম্লান হয়ে গেল।

কলকাতা চিহ্নহীন মানুষের ময়দান, সেখানে কারু কোনো রেখার স্পষ্টতা নেই, কিন্তু ছোট মফস্বল শহরে সব সময়েই তুমি নির্দিষ্ট, নম্বর-মারা। কি না-জানি সোরগোল উঠবে, তোলপাড় হবে সমস্ত শহর। তখন আর শুধু পুরুষ আর নারী নয়, তখন এক প্রোফেসর আর ছাত্রী। গাড়ি চাপা দিলে যেমন লোকে ভাবে গাড়ির চালকই দোষী, রেলে মাল খোয়া গেলে রেলই চোর, ধর্মঘট হলে, আহা, ধর্মঘটী না-জানি কত বঞ্চিত, তেমনি এক্ষেত্রে সন্দেহ কি, নলিনেশই অপরাধী, নলিনেশই দণ্ডনীয়। এই সেই প্রোফেসর, জ্বলন্ত চোখের দাগনি দিয়ে সবাই ছ্যাঁকা দেবে তাকে, বলবে, এই সেই কদাকার যে একটি নিরীহ নিষ্কলুষ মেয়েকে পথভ্রষ্ট করেছে। কে জানে, আপাতচক্ষে আইনেরও হয়তো সেই ভাব!

'কেমন লাগছে?' পরমার দিকে তাকাল নলিনেশ।

'অসামান্য।' নির্ভয়ে, অগ্রপশ্চাৎ গ্রাহ্য না করে পরমা নলিনেশের হাতের উপর হাত রাখল। বললে, 'যে অবস্থায়ই হোক, কলঙ্কে বা কর্দমে তোমার পাশে যদি আমি থাকতে পাই তাহলেই আমি অক্ষত। তখন আমার শ্রীঘরও শ্রীধাম।'

'একসঙ্গে থাকতে দেবে কই?' ভবিষ্যতের ভয়াবহ ছবি আঁকল নলিনেশ: 'তুমি ভিকটিম-গার্ল, তোমাকে নিয়ে যাবে তোমার বাড়িতে, আর আমার স্থান পুলিশ-হাজতে, যেহেতু আমিই অভিযুক্ত। জামিন দেবে কিনা জানি না। দিলেও দাঁড়াবে কে? মনে হচ্ছে এর পিছনে আইন নেই শুধু আক্রোশ আছে। তোমার মামা মণিলালের আক্রোশ আর তার সে আগুনে অন্যান্যদের বিদ্বেষের ইন্ধন। চতুর্দিকে যদি গোলমাল ওঠে, তখন নিঃশব্দও হঠাৎ তাতে কণ্ঠ মেলায়।'

'আমাকে আবার বাড়িতে পুরবে?' চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল পরমা। নিবিড় করে আঁকড়াল নলিনেশের হাত।

'তোমার উপর নির্যাতন চালাবে। তোমাকে শেখাবে-পড়াবে। বলতে বলবে, আমিই তোমাকে ফুসলিয়ে বার করে এনেছি। ছাত্রী অবস্থার সাহচর্যের সুযোগ নিয়ে তোমার মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছি যে, তুমি আমার স্ত্রী আর সেই ভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে—'

'একবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে দেবে তো আমাকে?' পরমা ছটফট করে উঠল।

'তা দেবে হয়তো। তুমিই তো মামলার মূল গায়েন। কিন্তু যখন তুমি বলতে দাঁড়াবে, তখন তোমার মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে, অনেক জল

পড়ে পড়ে একদিন যা পাথর ছিল তাই হয়ে উঠেছে তলতলে কাদা। যেমন হয় মেয়েদের বেলায়।'

'অসম্ভব। এত কিছুর পর আর কি আমি বলতে পারি?'

'কত কিছুর পর কত কিছুই বলতে পারে মেয়েরা। বলতে পারো, শাড়ি-গয়নার প্রলোভন দেখিয়েছি, মানে ঝকঝকে বাড়ি আর ছিপছিপে গাড়ির, কিংবা চাকরির প্রলোভন কিংবা বিদেশে পড়বার স্কলারশিপ পাইয়ে দেবার। কি ভাবে বলাবে তোমাকে, তোমার উকিলমামা আর তাঁর তদবিরকারেরাই জানেন।'

'আর, তাই বলব আমি? আমি বুলি-পড়া পাখি?' পরমা ফোঁস করে উঠল।

'কি করবে, তোমার মায়ের চোখের জল ঠেলবে কি করে?'

'রাখো। সব মা-ই প্রথমে তেজ দেখায়, পরে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর মেনকা হয়ে যায়। পার্বতীর মা মেনকা। মায়ের কথা আমি ধরি না। অশ্বত্থের মতন ছায়া নেই মায়ের মতন মায়া নেই। আমি ভাবছি অন্য কথা, অন্য রকমের ভয়।'

'অন্য রকম?'

'হ্যাঁ, ধরো, আমাকে বাড়ির মধ্যে আটকে ফেলল, আর, তারপর পুলিশ মামলা চালাল না। তোমাকে ছেড়ে দিল আর তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলে। তখন আমার কি দশা!' সর্ব অঙ্গে শিউরে উঠল পরমা।

'তখন আমাকে নখে-দাঁতে লড়তে হবে বাইরে থেকে।' নিজেরও অগোচরে নলিনেশের হাতের মুঠ বুঝি দৃঢ় হল: 'তোমাকে চিৎকার করে দাবি করতে হবে। অবৈধভাবে আটকে রেখেছে এই মর্মে নালিশ করতে হবে। এমন সাপ নেই যে তুমি তাকে পায়ে মাড়াবে অথচ সে তোমাকে কামড়াবে না।'

'সে তো সাপ, মাটির জীব, আর তুমি মাটির মানুষ।' পরমা আবার হাত রাখল হাতের উপর: 'আমার ভয় হচ্ছে তুমি না নিষ্ক্রিয়তায় ডুবে যাও। অনেক জেরবার হয়েছ, যদি ভাবো, আর কেন নিজেকে ক্লান্ত করি। দড়ি ছেড়ে দিই এবার।'

এমন ইচ্ছেও হয় নাকি, হতে পারে নাকি? সমস্ত বর্তমানকে অন্ধকার করে দিয়ে চোখ বুজল নলিনেশ। সে ইচ্ছেটি কেমন দেখতে চাইল অন্ধকারে। আবার তার সেই পরিচিত পরিমিত জীবনের উষ্ণতায় সে ফিরে গিয়েছে, এলোমেলো একাকী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে গা ভরে। উদ্বেগ নেই উত্তেজনা নেই শোক নেই শূন্যতা নেই—সে এক খেদহীন

খ্যাতিহীন শান্তি। সেই আবার চারদিকে বইখাতা ছড়ানো, ছন্দহীনতার স্বাচ্ছন্দ্য, আবার সেই নিঃশব্দ অনুভবের অলোকলোকে ঘুরতে যাওয়া।

'কি, কথা কইছ না কেন?' পরমা একটু ঠেলা দিল।

নলিনেশ বললে, 'ভাবছি তোমার কল্পনা কতদূর যায়।'

'সব রকমই তো মনের মধ্যে আসে।'

'তাই দেখছি। আমিও কেমন এসেছি তোমার মনের মধ্যে।'

যা ঠিক ভেবেছিল নলিনেশ। মফস্বল শহরে স্টেশন থেকেই ভিড়। থানায় কিছুটা বা পাতলা ছিল, আদালতে লোকারণ্য। স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত কিউ দিয়েছে। হ্যাঁ, কাঠগড়ায় গিয়েই দাঁড়াল নলিনেশ। সত্যের জন্যে প্রেমের জন্যে বলি হতে এসেছে এমনি মুখ করতে চাইল, কিন্তু জনতার মুখে তার এতটুকুও প্রতিবিম্ব দেখল না। কাউকে খুন করে এসেছে এমনি হলেও বুঝি দেখতে পেত মমতার ছায়া করুণার কান্তি। এখন চারদিকে শুধু ঘৃণা, ধিক্কার, নির্বাক তিরস্কার।

যা ভেবেছিল। মণিলাল সব মোক্তারদের হাত করেছে। এমন কেউ নেই যে নলিনেশের পক্ষে একটা জামিনের দরখাস্ত করে। ভেবেছিল সহকর্মী কেউ আসবে তার সাহায্যে। কিন্তু না, কেউ আসেনি। সমস্ত শহর, সমস্ত মধ্যবিত্ত ভদ্র-সমাজ তার উপর ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত। এত বড় অনাচারকে সামান্যতম প্রশ্রয় দিতেও কেউ রাজি নয়।

পরমা অস্থির হয়ে উঠল। সে তো খাঁচার মধ্যে নয়, সে তো কিছু করতে পারে বাইরে থেকে। এখনো কিছু পারে। নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তা হলে তো তার নিজের উপরেই ফিরে আসছে। হৃৎপিণ্ড তাল ভুল করতে লাগল। কিন্তু কি সে করবে, কাকে বলবে, কাকে ধরবে? আর সে এমনি জড়পদার্থ বলেই নলিনেশ চলে যাবে হাজতে?

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখল, নীলুদা।

বিয়ের পর সোহিনী চলে গেলেও আসর গুটোনোব পালা এখনো শেষ হয়নি, তাই নীলাদ্রির কাঁচড়াপাড়ায় ফিরে যেতে দেরি হচ্ছিল, এমন সময় কানে এল এই ব্যাপার। তবে আর কথা নেই, এগুতে হবে নীলাদ্রিকে। রুদ্ধ দ্বারকে অনর্গল করতে হবে।

কে তার নলিনেশ? কেউ নয়। তবে তার কেন এই মাথাব্যথা? মাথাব্যথা পরমার জন্যে। কে তার পরমা? তার সোহিনীর বন্ধু। পরমার কষ্ট মানে সোহিনীর কষ্ট। পরমার বিপদ মানে সোহিনীর বিপদ। কে তার সোহিনী? তার সোহিনী!

'ওঁকে যে করে পারুন জামিনে খালাস করে আনুন।' পরমা হাতের

দুগাছি সোনার চুড়ি খুলে দিল নীলাদ্রিকে। বললে, 'এ চুড়ি সোহিনীর দেওয়া। আমার প্রথম পাথেয়।'

নীলাদ্রি নিল তা হাত পেতে। বললে, 'তুমি ভেবো না। মোক্তার না জোটে আমি ওপাড়া থেকে উকিল নিয়ে আসছি।' বলেই তার সাইকেলে উঠে ছুট দিল।

পুলিশ ভেবেছিল পরমার একটা বিরুদ্ধ বিবৃতি পাওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু নীলাদ্রির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের পর আর সে আশা রইল না। আরো কিছুকাল প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন, পরমাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

যাবার সময় নলিনেশের মুখের দিকে তাকাতে চাইল পরমা, কিন্তু চোখের সঙ্গে চোখ মেলাতে পারল না। তোমাকে অকারণে ম্লান করে দিয়ে গেলাম, রেখে গেলাম পরিত্যক্ত অরণ্যে। আমি কোন সুখে আর ঘরে থাকব। আমার কালকের রাতের পর আজকের রাত কি করে কাটবে?

পরমাকে তার মামাবাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় দারোগা বললে মণিলালকে, 'মেয়েকে দিয়ে যদি আসামীর বিরুদ্ধে না বলাতে পারেন তবে সব বৃথা। দেখুন ভজিয়ে-ভাজিয়ে—'

মেয়েকে ঘরে পুরে দরজায় আবার শিকল দিলেন রাজেশ্বরী।

এদিকে উকিল যোগাড় করেছে নীলাদ্রি। বললে, 'মশাই, এ নিয়েও থানা-পুলিশ হয় নাকি?'

'কিছুমাত্র না। শুধু জবরদস্তি।' চশমার কাচ মুছে বললে উকিল, 'শুধু হায়রানি।'

বললে কি হবে, ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিলে না। ছাত্রীর সঙ্গে যাত্রী হওয়া, এ নিদারুণ অনাচার। বাছাধন একদিন থাকুন হাজতে। বিবেক-দংশন না হোক মশকদংশনটা কি বস্তু উপভোগ করুন।

নলিনেশকে নিয়ে চলল হাজতে।

বেড়া আগুনের মত দেশজোড়া আন্দোলন হচ্ছে, বন্ধনছেদনের আন্দোলন, কত লোক জেলে গেল, ফাঁসি গেল, বুক পেতে গুলি খেল আর সে কিনা সেই পরিবেশে রাজদ্বারে এসেছে একটা মেয়ের প্রতি আসক্তিতে। যদি সামনে সে এখন আয়না পেত, দেখত, প্রতিচ্ছায়ায় নলিনেশ নয়, কে এক বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ।

জামিনের দরখাস্ত নিয়ে নীলাদ্রি গেল জজের কাছে। উকিলের থেকে সব শুনে হাকিম বললেন, 'এ কি হুজ্জত, প্রাইমা ফেসি কেস কই?'

'নাথিং। নট এ জট।'

'মেয়ে কি বলে? স্টেটমেণ্ট আছে?'

'নিতে সাহস করেনি পুলিশ।' চশমার কাঁচ মুছল উকিল: 'মেয়ে বলে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বেরিয়ে এসেছে—'

'তবে পুলিশ ফাইন্যাল রিপোর্ট দিচ্ছে না কেন?'

'দেবে শেষ পর্যন্ত। শুধু নাকাল করা, কদিন একটু নাকানি চোবানি খাওয়ানো।'

'কি না জানি নাম বললেন মেয়েটির? পরমা—প্রেমা—চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন।'

'আমাদের মণিলালবাবুব ভাগ্নি। গার্জিয়ানশিপ মামলা আছে এ কোর্টে, সেখানেই বয়স লেখা আছে ঠিকঠাক।'

প্রাসঙ্গিক নথিটা আনালেন হাকিম। দেখলেন, পরমার বিয়ে আসন্ন এই অজুহাতে তার নামের বাকি টাকা থেকে তুলে নেবার জন্যে দরখাস্ত করেছেন মণিলাল, তার সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত গার্জিয়ান। এদিকে বিয়ের নামে টাকা তোলবার দরখাস্ত, ওদিকে বিয়ে আটকাবার জন্যে পুলিশী পরোয়ানা। টাকা তুলতে পারেনি তো এখনো? না, পারেনি। কোর্ট থেকে বিয়েব খরচের এস্টিমেট চাওয়া হয়েছে, দশদিন বাদে তার তারিখ। আর ওয়ার্ড, পরমা একুশ হচ্ছে কবে? গোনাগুনতি সাত দিন পব।

হাকিম গার্জিয়ানকে মানে মণিলালকে হুকুম করলেন সাত দিন অন্তে পরমাকে তাঁব কাছে হাজির কবিযে দিতে হবে। আর নলিনেশকে সামান্য জামিনে খালাস দিয়ে দিলেন।

'ওরে ও চয়ন সিং, তুই আছিস?' নলিনেশ বাইবে থেকে হাঁক দিল 'তবে দরজা খুলে দে, আমি এসেছি।'

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল চয়ন। জিগগেস করল, 'কোথায় ছিলেন বাবু এ কদিন?'

'কোথায আবার থাকব। এখানেই ছিলুম। এই আমার সেই বাড়িঘর, বইখাতা, বিছানা-বালিশ। এই আমার সেই তুই আর আমি। নে, দাড়ি কামাবার জল দে, স্নানের জল ঠিক কব, কি রান্না করেছিস? জানিস বেফাঁস একটা মামলায় জড়িয়ে গেছি, সাত দিন পরে আবার তারিখ পড়েছে। ঐটুকু হ্যাঙ্গাম না থাকলে, উঃ কি মজাটাই যে হত। আবার তোকে এক প্লেট রসগোল্লা আনতে বলতাম আর তা আমি আর তুই দুজনে মিলে সাবাড় করতাম টপাটপ।'

চয়ন হাসল একগাল।

ক্যাজুয়েল লিভটা বাড়াবার জন্যে কলেজে দরখাস্ত পাঠাল নলিনেশ। আর দিনের দিন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গিয়ে হাজির হল।

পরমাও এসেছে তার মামার সঙ্গে। সাজেগোজে জাগা মনের ছোঁয়া লাগিয়ে। নলিনেশ তাকাতে চাইল তার চোখের দিকে। ঘুমে জড়ানো না-ভোলা রাতের চোখের দিকে। কিন্তু ধরতে পেল না। ফিরেছে না ফেরেনি নিভেছে না নেভেনি কি লেখা আছে চোখের কালো কালিতে তা কে জানে! আসবে এও ভয়, চলে যাবে সেও ভয়। ভয় কি কিছুতেই যাবে না? জয় করেও ভয় যায় না। এই কি ভালোবাসার ধারা? খোঁজা শেষ হলেও কি যোঝার শেষ নেই?

পুলিশ ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট নলিনেশকে ডিসচার্জ করে দিল।

'আর আমি?' শিহরসুন্দর চোখ তুলে জিগগেস করলে পরমা।

'আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন একলা কিংবা যার সঙ্গে আপনার ইচ্ছে।' বললে ম্যাজিস্ট্রেট।

নলিনেশ একটু অপেক্ষা করল বারান্দায়, একটু বা সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে। কিন্তু কই, কেউ তো তার আঁচলের উত্তাপ নিয়ে দাঁড়াল না গা ঘেঁষে। দুই চোখে মুঞ্জরিত কাননের আনন্দ নিয়ে। বুকে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড় নিয়ে। বরং, এ কি নিদারুণ, মণিলালের সঙ্গে চলে গেল ভিন্ন পথে।

একটা রিকশাতে করে অনেকক্ষণ শহর ঘুরল নলিনেশ। রাস্তাঘাট দোকানপাট লোকজন গাড়িঘোড়া সব যেন অপূর্বের পোশাক পরেছে, রিকশার ঘুরন্ত চাকায় যেন কোন নতুনের ভাষা—তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো, যদি চাও তো একা-একা, দূরে-কাছে আড়ালে-আদুলে সদরে-মফস্বলে। মুক্তির মত সুখ নেই, মুক্তির মত রোমাঞ্চ নেই।

তবু, দেরি করে যখন বাড়ি ফিরল তখন এ কি আশা করেনি বাড়ির মধ্যেই দেখতে পাবে সে মূর্তিমতী মুক্তিকে?

'কেউ এসেছিল?' চয়ন সিংকে জিগগেস করল নলিনেশ।

'কেউ না।'

তবে শূন্যতাই কি মুক্তি? শুভ্রতাই কি নিশ্চিহ্নতা? কিন্তু শূন্যতারও যে শেষ প্রান্তে একটি রেখা আছে, শুভ্রতায়ও যে লেগে আছে একটি কালিমার স্বপ্ন!

বারান্দায় মণিলাল অপেক্ষা করছে, জজের খাস কামরায় ভীরু পায়ে একা-একা ঢুকল পরমা। বসুন, না বোস, কি বলবে এক পলক ভাবতে চেষ্টা করলেন হাকিম। পরে বললেন, 'বোস।'

প্রকাণ্ড টেবিলের ধার ঘেঁসে পাশের চেয়ারে বসল পরমা। সামান্য সূচীপত্র কোন বিরাট গ্রন্থের নির্দেশ হতে পারে উপর-উপর কে বোঝে?

'তোমার বিয়ে হচ্ছে?' জিগগেস করলেন হাকিম।

লাজুক হাসির লাবণ্য লাগল মুখে। কোনো কথা বললে না।

'যদি এ সময় তোমাকে কিছু টাকা দিই কেমন হয়?'

'টাকা?' চমকে উঠল পরমা। চোখে যেন আলাদিনের প্রদীপ জ্বলে উঠল: 'আপনি—'

'না, আমি না। তোমার নিজের টাকা।'

'আমার নিজের?'

'তোমার নিজের মানে তোমার বাবার। তোমার বাবা তোমার নামে আলাদা করে অনেক টাকাই রেখে গিয়েছিলেন, অথচ খরচ হয়ে হয়ে এখন তার সামান্য কিছুই আছে, যদি বলো তো তোমাকে দিতে পারি। তোমার একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে, তুমি সম্পত্তির ব্যাপারে সাবালক হয়েছ, তাই এ-টাকা তোমার প্রাপ্য। নেবে?'

'কত?' জিগগেস না করে পারল না পরমা।

'দু হাজার।'

'এত?' এ লোভের চেয়েও বেশি।

'হ্যাঁ, এ টাকার মালিক এখন তুমি—এ তোমার টাকা, তোমার নিজের কবজায়, নিজের এক্তিয়ারে। তুমি এখন তা ওড়াও-পোড়াও দান-খয়রাত করো তোমার ইচ্ছে।'

'এখুনি পাব?' পরমার চোখ চকচক করে উঠল।

'এখুনি। এই মুহূর্তে। হাতে-হাতে। নগদ। একশো টাকার, যদি বলো তো, দশ টাকার নোটে—'

যেন চোখের সামনে অন্ধকার দেখল পরমা। বললে 'এত টাকা কি করে নেব? যদি কেউ কেড়ে নেয়?' বারান্দার দিকে ভুরু বেঁকিয়ে ইঙ্গিত করল।

সে ভ্রূকুটির মানে বুঝলেন হাকিম। বললেন, 'হ্যাঁ, সে ভয়ের কথা আমি জানি। তাই তোমার সঙ্গে লোক দিচ্ছি, তোমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবে। সেখানে তুমি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলবে, টাকাটা রেখে দেবে জমিয়ে। তারপর যখন দরকার চেক কাটবে। খুব কায়দা করে সই করবে নিজের নাম।'

দুঃসহ রোমাঞ্চ। চতুর্বর্গের অর্থটাই বুঝি বাকি ছিল, তাও অকৃপণ

ভাগ্য মিলিয়ে দিল অহেতুক। চেয়ারের মধ্যে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না পরমা, উছলে উছলে উঠছে।

নাজিরকে ডেকে টাকাটা পাইয়ে দিলেন সত্যি সত্যি। একথাম ভর্তি একগাদা নোট। মণিলালকে বললেন, 'এ-টাকাটা এখন ও ব্যাঙ্কে রাখবে, ভালোই হবে, কি বলেন?' আর আমলাকে বললেন, 'ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে আমি ফোন করে দিয়েছি, যান, সব পাকাপাকি করে দিয়ে আসুন।'

আমলা পরমাকে নিয়ে রওনা হল। আর কোনো তার কর্তৃত্ব নেই, মণিলাল তাকিয়ে রইল হতাশের মত।

ব্যাঙ্কে গিয়ে পরমা বললে, 'হাজার টাকা জমা রাখব। আর বাকিটা আমার হাতে থাকবে।'

অনেক উদ্দীপ্ত অপব্যয়ের স্বপ্ন দেখছে বুঝি পরমা। খরচে ক্ষয় হয়ে যাওয়া উড়ুন তুবড়ির জুঁইফুল।

আমলা বললে, 'যা আপনার খুশি।'

চেকবই আর পাসবই নিয়ে রানির মত উঠে দাঁড়াল পরমা। স্বাধীনতার ঘরে সামর্থ্যের চাবি মিলল এতদিনে।

এখন কোন দিকে যায়! যদি কিছুদিন আগে এ টাকাটা তার হাতে আসত তো কোন দিকে যেত! রিকশা নিয়ে অগত্যা পরমা চলল তার মামার বাড়ির দিকে।

'কি হল?' মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে অনেক কিছু আশা করে রাজেশ্বরী এগিয়ে এলেন।

'ছেড়ে দিয়েছে।'

'আর তুই? তুই ছেড়ে দিয়েছিস?'

পরমা চুপ করে রইল।

যখন নিজের থেকে ফিরে এসেছে তখন ইঙ্গিত অনুকূল মনে মনে এই ব্যাখ্যাই করলেন রাজেশ্বরী, কিন্তু মণিলাল বাড়ি ফিরে এসে অন্যরকম রব তুললেন। এ পর্যন্ত বলে এসেছেন—মেয়েকে আটকা, বন্ধ কর, এখন বলতে শুরু করলেন,—তাড়িয়ে দে, ঘরের বার করে দে। ওকে আর এখন বাড়িতে রেখে লাভ কি? জাত-মান সব তো দিয়েছেই টাকাটাও দিয়ে এল।

'দিয়ে এল?' মণিলালের স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন।

আমার টাকা আমি যাকে খুশি দেব, এমন করে বললে না পরমা। শুধু বললে, 'আমি কি জানি, কোর্ট থেকে হুকুম হলো ব্যাঙ্কে টাকাটা সরিয়ে রাখতে, তাই রেখেছি।'

'তার মানেই তাই। প্রেমের ইনকাম-ট্যাক্স।' এবার মামিমা ধরলেন।

মেয়ের সঙ্গে বন্ধ ঘরে নিভৃত হলেন রাজেশ্বরী। আর নিভৃত হতেই পরমা একরাশ টাকা রাজেশ্বরীর শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিল। বললে, 'মা, এ আমার টাকা. এ আমি তোমাকে দিলাম।'

লোভালু চোখে তাকালেন রাজেশ্বরী। কণ্ঠস্বর ঝাপসা করে বললেন, 'কত ?'

পরমাও গলা নামাল: 'হাজার। সাবধানে রেখে দাও তোমার কাছে। মলয়ের টাকাও আমি বাঁচিয়ে দেব। মামাকে সরিয়ে আমিই নতুন গার্জিয়ান হব তার। ওকে নিয়ে যাব আমার কাছে। আমি আর অযোগ্য নই অশক্ত নই। আমাকে তুমি আশীর্বাদ করো।'

রাজেশ্বরীর মন বুঝি মোড় ফিরল। কণ্ঠস্বরে করুণা মিশিয়ে বললেন, 'কিছুতেই ফিরবিনে ?'

'ফেরবার পথ আর নেই মা।' মাকে প্রণাম করল পরমা। বাবার ফটোতে হাত বুলিয়ে আদর করল সস্নেহে। মাকে দেখতে বলল খিড়কির দিকটা নিরিবিলি কিনা।

আজ রাজেশ্বরীর কত ভাবনা: 'পারবি যেতে একা একা ?'

'পারব। আর কত দূরেই বা যাচ্ছি—' পরমা বেরিয়ে গেল।

দেখল বারান্দায় বসে আছে চয়ন সিং। বাবু? ঘুমোচ্ছেন। এখন মোটে সন্ধ্যা, এখুনি ঘুম? বাবু বলছেন. একশো বছর নাকি ঘুমুনি, এক রাতে পুষিয়ে নেবেন।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল পরমা।

'ও বাঁদর, আলো জ্বাললি কেন? বললুম না তখন—সে কি, তুমি—তুমি এসেছ?' নলিনেশ চোখ কচলাতে লাগল।

'তবে কি ভেবেছিলে আর আসব না?'

'ঠিক অতদূর ভাবিনি। তবে মনে হয়েছিল তোমাকে আবার বাঁধবে আর আমাকে লড়াই করতে হবে নতুন করে।' আরামে চিত হল নলিনেশ: 'এসেছ না শ্মশানে বৃষ্টি নেমেছে। এবার হাত লাগাও নিজের সংসারের পিয়োনোতে—টুং টাং টুং টাং। আমি শুয়ে শুয়ে শুনি—'

'নিজের সংসার, না শিবের সংসার।' হাসতে চাইল পরমা।

'ও একই কথা। শিবোহহং, শিবোহহং।' বুকের উপর দুই হাত যুক্ত করল নলিনেশ: 'তারপর একটু রান্নাবান্নাটা দেখ, পেট ভরে খাও, তারপরে

বিস্তীর্ণ নিদ্রা দাও। তুমিও নিশ্চয় আমারই মত এখন ঘুমের জন্য উদ্‌গ্রামিনী—'

'আজ্ঞে না, উঠুন, ঘুমোবার সময় নেই—' কি অদ্ভুত লাগছে গলা থেকে পরিহাসের সুর বের করতে: 'গা তুলুন, সূর্যদেব।'

'যদি কোনো কিছুর সময় থেকে থাকে তা হচ্ছে ঘুম। সূর্য যে কেন একদিন ক্যাজুয়েল লিভ নেয় না, তা কে জানে।' আবার পাশ ফিরল নলিনেশ: 'আজ আর সংকীর্ণ হবার দরকার নেই। থানা থেকে আলামতী জিনিসপত্র সব দিয়ে গেছে, মায় বিছানা। আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি—'

'তারপরেই 'ভোরে উঠেছি।' তোমাকে রাতেই উঠতে হবে।' নলিনেশের একটা পা ধরে টানতে লাগল পরমা: 'মধ্যরাতে আবার ট্রেন ধরতে হবে কলকাতার। এখনো সব কিছুই বাকি। বিয়েটাই হয়নি এখনো।'

জগদ্দল পা, নাড়ায় কার সাধ্য?

নলিনেশ নিঝুমের মত বললে, 'কি দরকার। এই তো বেশ আছি। তুমিও বেশ আছ। ধুতুরার বনে মালতী হয়েই ফুটে থাকো অজস্র—'

'শুধু ফুটে থাকব?' এবার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল পরমা. 'শুধু বেশ? শুধু সাজগোজ?'

গায়ের জোরে পারছে কই পরমা? তবে? গলায় ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল অবশেষে। অসহায়ের মত মুখ করে উঠে বসল নলিনেশ। মাথা চুলকোতে লাগল। সে কি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে. নিরাভ, নিষ্কবচ? একটু খেলো একটু জোলো। একটু বা অকেজো। একটু বা অসার। দরের পারা কি এখন অনাদরের ঘরে নেমে যাচ্ছে?

উপায় নেই। অজানার পাহাড়চূড়া থেকে এখন যে সে নেমে এসেছে প্রাত্যহিকতার সমতলে!

'উপায় নেই। তবে আবার প্যাক কবো। চলো কলকাতায়। অনুষ্ঠানটা সেরে আসি।' শুকনো গলায় বললে নলিনেশ।

কত কারুকার্য দরকার হবে দেহে মনে, কত কাঠিন্য ও ধৈর্য, সেই দূরত্বকে ও গাম্ভীর্যকে নিয়ে আসতে। আবার তার সঙ্গে মেশাতে হবে ক্ষমা আর স্নেহ যাতে না বৈরাগ্য বলে দেখায়, না বা নিষ্ঠুরতা।

সেই মধ্যরাত্রির ফিরতি ট্রেনের কামরায় আবার পাশাপাশি বসেছে দুজনে। বেঞ্চির পিঠে ঠেস দিয়ে ঘাড় কাত করে ঘুমুচ্ছে নলিনেশ। পরমার ঘুম নেই। বাইরে দূরের অন্ধকার দেখছে আর মাঝে মাঝে

নলিনেশের মুখ। অনেক কান্নার পর রুগ্ন শিশু যেমন ঘুমোয় তেমনি দেখাচ্ছে তাকে। কে বলবে একজন জ্ঞানী গুণী বিদ্বান বিদগ্ধ, বীতরাগ-শীততাপ, অনুভবের অগম্য দেশের যাত্রী—মনে হচ্ছে অনাশ্রয়, অনুপায়, গৃহহারা।

কত না-জানি আরো ক্লান্ত আরো দগ্ধ করব তাকে। এমন কথাও পরমা না ভাবছে তা নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে তার মসৃণ জীবন থেকে। হয়তো বা আচারভ্রষ্ট হয়েছে, মূলচ্যুত। মায়ায় দু চোখ ছলছলিয়ে এল পরমার। যেন কিছু নয়, হাতের উপর একটু হাত রাখল লুকিয়ে।

কলকাতায় পৌঁছেই পার্কসার্কাসে সোহিনীদের নতুন ফ্ল্যাটে হাজির হল দুজনে।

সুপ্রভাত আর সোহিনী হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল।

'সব ঠিক করে ফেলেছি।' সোহিনী বললে, 'আজ অধিবাস, কাল বিয়ে।' কলকলিয়ে উলু দিয়ে উঠল।

ঘরদোর সুন্দর সাজিয়েছে গুছিয়েছে। সাফল্যের ঢেউ উথলে দিয়েছে চারদিকে। ছিটিয়ে দিয়েছে সিঁদুর-রঙা আনন্দের পিচকিরি। কৃতকর্মতার চেকনাই।

নিচের তলার ফ্ল্যাটটা খালি আছে সেটা পরমা নিতে পাবে ইচ্ছে করলে। একটা বাড়তি ঘর থাকলই বা না কলকাতায় ভাড়া যখন সাধ্যের মধ্যে। তা ছাড়া সোহিনী যখন প্রতিবেশী।

'তা ছাড়া,' সুপ্রভাত বললে, 'বিয়ের নোটিশ যখন এখান থেকে দিতে হবে তখন এখানে একটা বাসা থাকা উচিত। আইনে বলছে অন্তত এক মাসের রেসিডেন্স—'

আবার হাঙ্গামা। মিইয়ে গেল নলিনেশ। নোটিশ দাও বসে থাকো, দিন গোনো, সাক্ষী জোটাও, সই সাবুদ করো—হাজার রকম বায়নাক্কা। মরি তাতে খেদ ছিল না, এ যে কাঁটাবনের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া।

মুখে বললে মন্দ কি। এতদিন একা একা মফস্বলে ছিল সে একরকম, এখন বিয়ের পর আত্মীয়-স্বজনের বাড়বে না আনাগোনা? সব-সময়ে-একঘেয়ে মফস্বলী সবুজের পরে ফুটুকই না একটু রাজধানীর সোনার জল। মাঝে মাঝে একটু বা ক্ষুধা বাড়াবার উপবাস। দুরকমের দুটো সংসার, একই উপকরণে দুটো আলাদা স্বাদের রান্না। মন্দ কি। তারপর যদি বি-টি পড়ে পরমা। যদি চাকরির জন্যে বা বেরোতে হয় চেষ্টায়।

'ঐ বড়ো বাড়িটা কার রে সোহিনী?' জিগগেস করলে পরমা।

'মিস্টার সি. সি চৌধুরী, রিটায়ার্ড আই. সি. এস-এর।'

'বাংলা নাম কি?'

'কেউ জানে না।' বললে সোহিনী, 'সাহস করে একদিন গিয়েছিলাম পাড়া বেড়াতে, কুকুরের যন্ত্রণায় ঢুকতে পারলাম না।'

আশেপাশের প্রতিবেশীদের খোঁজ নিচ্ছে পরমা। 'ঐ বাড়িটা কার রে?'

'কোনটা? যেটার দোতলার বারান্দায় ফুলের টব? ওটা গীতালির। চিনলি গীতালিকে? কি করে চিনবি? আমার সঙ্গে পড়ত, তুই তো আমাদের নিচে। ঐ তো ছেলে নিয়ে এসেছে বারান্দায়। দ্যাখ দ্যাখ ছেলেটা কেমন গুটি গুটি হাঁটছে!'

'গীতালি বোস?' যেন চিনল পরমা।

'হ্যাঁ, বিয়ে করে ব্যানার্জি হয়েছে।' কানের কাছে মুখ আনল সোহিনী: 'আর, এই বছর খানেক।'

আর বাকি সব?

হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জু পশ্চিমী-দক্ষিণী সব আছি আমরা পাশাপাশি। জায়গার নাম সার্কাস, তাই খেলোয়াড়-জানোয়ার ক্লাউন-ক্রিমিন্যাল সব রকমই থাকবে। কিন্তু, শোন, হ্যাঁ রে নীলুদার কোনো খবর রাখিস?

৫

বাসুদেব ব্যানার্জি আফিসে বেরুচ্ছে, ডাকপিওন চিঠি নিয়ে এল। তিনখানা খামের চিঠি, ঠিকানা পড়ে দেখল তিনখানাই গীতালির।

গীতালি এগিয়ে দিতে এসেছিল, চিঠি তিনটে তার হাতে দিয়ে হাসিমুখে বাসুদেব বললে, 'তোমার কি ভাগ্য। তোমার কত আত্মীয় বন্ধু—'

'আমার পাস্ট কত বড়–' শরীরে ঢং ফুটিয়ে পরিহাস করল গীতালি।

গীতালি যা করে যা বলে সবই সুন্দর দেখে বাসুদেব। তার যা সব ত্রুটি তাও যেন সত্য নয়, ছলনার নামান্তর। বাসুদেব বললে, 'আর পাস্ট মাত্রই গৌরবময়, কি বলো?' হাত তুলে টা-টা জানিয়ে ছুট দিল ট্রাম ধরতে।

এক-এক করে চিঠি খুলতে লাগল গীতালি।

মনে পড়ল, যখন বিয়ে হয়, গীতালি জিগগেস করেছিল বাসুদেবকে: 'আমার নামে অনেক দুর্নাম শুনেছ?'

'কই, না তো।' যেন হতাশার মত মুখ করল বাসুদেব। ভাবখানা এই—যখন গীতালির সম্পর্কে, তখন দুর্নামও সুন্দর। একটু থেমে নিয়ে বললে: 'তা ছাড়া দুর্নাম খানিকটা জৌলুস। চরিত্রের নুন। যার একটু দুর্নাম নেই তার যেন জোরও নেই ধারও নেই।'

রসে হাস্যে হৃদয়ে ভরা মানুষ। জীবনের থালায় এমন আশ্চর্য-মনোহরকেও পরিবেশন করে ভাগ্য এ একেবারে অজানা। অজানা আছে বলেই তো আমিও আছি। অজানা আর কে, আমারই হৃদয়ের তন্তু দিয়ে সে বোনা। আমিই অজানা। নইলে কে জানত আমিও আবার দেখব রোদের স্বাদ, অন্ধকারে মধু, মানুষের মুখেই দেবতার মুখ। শুধু অন্নজলেই এত তৃপ্তি। এই অজানা দৃষ্টি অচেনা অনুভব তো আমারই মধ্যে লুকোনো ছিল। অন্ধকূপের বাইরে যে আছে অপরিমেয় স্বভাব-নিশ্বাস এ তো আমার আবিষ্কার। জীবন যে নির্মম সমর্পণ নয়, নিঃশেষ সমর্পণ এ তো আমার প্রবন্ধ।

বাসুদেবের সামনে সরকারিভাবে যখন গীতালি প্রথম এসে দাঁড়াল, খোলা-ঢালা পোশাকে, সদ্য স্নান করে, ভাবতেও পারেনি, এত সহজেই ভুলবে ওর চোখ। সে কি তার নিজের গুণ, না ওর চোখের পবিত্রতা! হায়, তার নিজের গুণ! মা যদিও একবার বললেন, মাঝে খুব ভুগল টাইফয়েডে, তাই এত কাহিল-বোগাটে দেখাচ্ছে, ওর দুই চোখ তাই ক্ষমা করে নিল, শোধন করে নিল। বললে, 'তা অসুখ বিসুখ তো হতেই পারে—'

সঙ্গে একজন বন্ধু নিয়ে এসেছিল দাদারা বললেন, 'কিছু জিগগেস করবেন নাকি?'

'বি. এ. পাস করা মেয়েকে আর কি জিগগেস করব?'

তবু গলার স্বরটা একটু দেখা দরকার। মুখচোখের ভঙ্গিই বা কেমন হয় কথার সময়! তারপর যদি একটু হাসানো যায়! কেমন দাঁড়ায় না জানি দাঁতের সার!

বাসুদেব জিগগেস করল 'গান জানেন?'

ঘাড় হেলাল গীতালি।

'গাইবেন?'

বলল না, গলাধরা আছে। বা বাজনা নেই। বা বই লাগবে। বা অন্য কোনো ডাঁটের কথা। স্বচ্ছন্দে গান ধরল। মুক্ত কণ্ঠে বই না দেখে বাজনার সাহায্য না নিয়ে। মুখস্থের গান নয়, প্রাণভরা গান।

বন্ধু রসিকতা করবার চেষ্টা করল· 'সাধে কি আর গীতালি নাম?'

'আলি বা আবলি যখন তখন তো একাধিক গাইতে হয়।' বললে. বাসুদেব।

এতটুকু আয়াস নেই আড়ম্বর নেই, গীতালি আরেকখানা গান গাইল।

গীতার এক দাদা জিগগেস করল বাসুদেবকে, 'আপনি গান জানেন?'

'আমার তো এক গুণ নয় আমার ডবল গুণ।' গম্ভীর হল বাসুদেব।

'তার মানে?' গীতালিও তাকাল উৎসুক হয়ে।

'আমার গুনগুন। মানে আমি গুনগুন করি।'

সবাই হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গীতালিও। তার দাঁত দেখা গেল। সাজামাজা মিছরির দানার মত সুন্দর দাঁত।

বাসুদেব বলে ফেলল, 'ঠিক আছে।'

ঠিক আছে। এ শব্দপদ যে কবে কে চালু করেছে বাংলা ভাষায় কে বলবে। একটু যেন বোকার মত শোনাল। একটু রয়ে-সয়ে দেখে-শুনে বলতে হয়। কিচ্ছুই কি ঠিক আছে, না থাকে? কেউ-কেউ বললে ঝটিতিই ঠিক নীতি, দাঁও ফসকাতে দিতে রাজি নয় ছোকরা। নগদে আসবাবে দশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে, তার উপরে মার গয়না এ সোনামুঠ কেউ ছাড়ে না। যদি পাই রুপোর কুচি, কথায় বলে, মুচিকেও করি শুচি।

চাকরিদার ছেলে, উন্নতি বুঝতে সমৃদ্ধি বোঝে, তাই সবাই বললে রূপ না দেখে রূপচাঁদ দেখেছে।

কিন্তু মুক্ত গগনে এসে গীতালি ছাড়া আর কে বেশি জানে বাসুদেব দেখেছে সত্যি রূপার চাঁদ।

গীতালি জিগগেস করেছে: 'আচ্ছা, তুমি কাউকে ভালোবাসনি?'

'দাঁড়াও হিসেব করে নিই।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হিসেব করবার ভাব করল বাসুদেব। পরে বললে, 'বেসেছি হয়তো।'

'তবে তাদের কাউকে বিয়ে করলে না কেন?'

'কেন? তোমাকে বলি।' খুব বিজ্ঞের মত মুখ করল বাসুদেব: 'যেখানে ভালোবাসার পরে বিয়ে সেখানে বিয়েতেই শেষ। আর যেখানে বিয়ের পরে ভালোবাসা সেখানে ভালোবাসাটা অশেষ। আগেরটাতে শুধু পেঁছনো, পরেরটাতে অতিক্রম করে যাওয়া। তাই তুমি আমার গন্তব্যের চেয়ে বেশি, আমার লক্ষ্যের চেয়েও দূর।'

'কিন্তু কেন, কেন তুমি আমাকে ভালোবাস?' আরো ভালোবাসা পাবার জন্যেই অমনি করে বলে গীতালি· 'কেমন করে আসে এ ভালোবাসা।'

'এ যেন মাটিকে বলা কেন তুমি ফুল ফোটাও? কবিকে বলা কেমন করে তোমার কবিতা আসে?'

প্রথম পরিতুষ্ট প্রেমের সংস্পর্শে এসে সব পুরুষই বাক্যে ও ব্যবহারে একটু ভাবুনে হয়। নইলে বাসুদেব এমনিতে ফেল কড়ি মাখ তেল-এর লোক। এখন সে যেন মাখতে না পেলেও কড়ি ফেলতে রাজি। তুমি কাবুর চেয়ে কম নও। তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে—কি আছে ঈশ্বরও বলতে পারে না—যাতে তুমি সকলের চেয়ে মূল্যবান। আমার স্পর্শের তিলকেই তুমি অসাধারণ।

সব শেয়ালেরই এক রা। সব গভর্নমেণ্টেরই শেষ পর্যন্ত গুলিচালানো।

গীতালি বললে, 'কিন্তু তুমি হয়তো জানো না আমি চোবাবালি।'

বাসুদেব উদার প্রশান্তিতে হাসল। বললে, 'চোবাবালিই আমার ফসলের খেত।'

এক-এক করে তিনটে চিঠিই পড়ল গীতালি। তৃতীয় চিঠিটা সবচেয়ে ছোট আর সেটা, সেটুকু পড়তে-পড়তেই, চোখে যেন অন্ধকার দেখল, পাথুরে অন্ধকার। চেয়ারের উপর বসে পড়ল, বসে পড়ল নয় ভেঙে পড়ল। চুলের খোঁপাটা কাঁধ বেয়ে পিঠে গড়িয়ে পড়ল, গায়ের উপর থেকে শাড়ির আঁচল খসে পড়ল এক পাশে। একটি মুহূর্তের চূড়ার উপর এসে তন্ময় হয়ে গিয়েছে গীতালি।

না, বসবার সময় নেই। কৃতনিশ্চয় হতে দেরি কিসের?

উঠে বাড়ির লোকদের—এক খুড়শ্বশুর আর শাশুড়ী থাকেন, আর তাঁদের দুই ছেলে-মেয়ে এখন স্কুলে—তাঁদের বললে আগে ব্যাপারটা, তারপর রাস্তার ওপারে একটা ডিসপেনসারিতে গিয়ে ঢুকল।

ফোনটা ব্যবহার করতে পারি? করুন।

রিসিভারটা তুলে নিল গীতালি।

'হ্যালো। শুনছ?'

'কে?'

'আমি গীতু।'

'কি ব্যাপার?'

'চিঠিগুলো তো পড়ে গেলে না। তৃতীয় চিঠিটা খারাপ।'

'কেন কি হয়েছে?' বাসুদেবের স্বর আধচমকা।

'আমার সেই মীরাদির কথা বলিনি তোমাকে—আমার সেই মামাতো বোন—'

'হ্যাঁ, বলেছ হয়তো। তার কি হয়েছে?'

"সাংঘাতিক অসুখ। মর-মর। আমাকে ভীষণ দেখতে চায়। দিদি হলে কি হবে, পড়তাম এক সঙ্গে। গলায়-গলায় ভাব ছিল—' গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে কথাটা পল্লবিত করছে গীতালি।

'হ্যাঁ ছিল, এখন কি করতে চাও?' সংলাপটা তাড়াতাড়ি সারতে চায় বাসুদেব।

'যেতে চাই। আর এই দুপুরের ট্রেনে।'

'লাঞ্চ টাইমে আমি বাড়ি আসছি, তখন সব ঠিকঠাক করে দেব।' বাসুদেব রিসিভার প্রায় নামিয়ে রাখে আর কি।

'শোনো, হ্যালো, হ্যাঁ.' ধরতে পেরেছে গীতালি : 'শোনো অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। মুমূর্ষু রুগী, পত্রপাঠ যেতে লিখেছে। একজনের অন্তিম ইচ্ছাটি রাখবার জন্যে প্রাণপণ করা উচিত। আমি এখুনি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই, নেয়ে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি—'

'একা পারবে যেতে?' বাসুদেবের প্রশ্নে স্নেহঘন উদ্বেগ।

'আহা, পঞ্চাশ-ষাট মাইলের তো মামলা—তোমাকে ভাবতে হবে না। কত দূরের রাস্তা একা একা পাড়ি দিয়ে এলুম, এ তো পাছদুয়ার।'

'একটা পিওন-টিওন দেব সঙ্গে?'

'খোদ পেয়াদাই যখন সঙ্গে নেই তখন খুদে পেয়াদা নিয়ে কি হবে?' পরিহাসের সুর আনল গীতালি।

'শোনো বেশি করে টাকা নিও। কাকাকাকিমাদের বুঝিয়ে বলো ব্যাপারটা। আর পেঁছেই ওয়্যার কোরো।' প্রায় কান্না-কান্না ছোঁয়াচ লাগাল স্বরে: 'ভেবেছিলাম আজ দুজনে সিনেমায় যাব নয় তো—'

রিসিভার রেখে দিয়েছে গীতালি।

পড়ি-মরি করে স্নান করল, নাকে-মুখে গুঁজল কি না-গুঁজল, তারপর ঘরে ঢুকল কাপড় বদলাতে। আপাদমস্তক আয়নায় নিজেকে দেখবে না ভেবেও দেখল একবার স্থির হয়ে ভাবল সাজগোজ বা গয়নার ছিটেফোঁটা গায়ে রাখবে কি না। গয়না তো পরে খুলে ব্যাগে রাখলেও চলবে, কিন্তু পরবে কি? রঙিন না সাদা? গায়ে কি একটা কুহেলিকার পর্দা চাদর ফেলবে, না কি স্পষ্ট হয়ে থাকবে তার দারিদ্র্যে?

কি কথা ভাবছে সে এখনো? তার চিঠি—চিঠিটা কই?

ত্বরিত বিস্মৃতিতে আটপৌরে শাড়ি পরল, গায়ে সেই ছন্দে নিরঙ ব্লাউজ। আর হাতে একটা কাঁধ-ঝোলানো ব্যাগ।

কাকিমা বললেন, 'কবে ফিরবে?'

আশ্চর্য, সে-কথাটা চিন্তা করেনি তো। মনে মনে একটু হিসেব

করল গীতালি। বললে, 'কতক্ষণ আর লাগবে? ওখানে—সেখানে—তারপরে যা হয়—হ্যাঁ, কাল, একদিন—একদিন লাগুক—হ্যাঁ, কাল, কালকেই ফিরে আসব।' পরে মনে-মনে জিভ কাটল। এ সে কি হিসেব করছে! পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, 'মর-মর রুগী কখন কি হয় কে জানে! এক-আধদিন দেরিও হতে পারে বা।' আবার ঘুরে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে এসে: 'না, বাঁচুক মরুক, আমি দেরি করি কেন? আমার দেরি করবার কারণ কি? না, তিনি ফিরলে বলবেন কালকেই ফিরে আসব।'

ট্যাক্সি নিল গীতালি।

মানিকতলার মোড়ে নেমে একটা খেলনা কিনল। তারপর আরো খানিকটা পুবে এগিয়ে গিয়ে বাগমারির দিকে ঢুকল। একটা গলির মোড়ে দাঁড় করাল গাড়ি। এর পরে বাঁ-হাতি একটা কয়লার গুঁড়ো-ফেলা সরু গলি, সামনে সরফেলা ঘোলাজলের বড় পুকুর, তার এদিককার দু ধারে সারবাঁধা বস্তি। যেটায় ঠিক ভিতরের রোয়াকের ধার ঘেঁসে নারকোলগাছ উঠে গিয়েছে সেটাই মেনকাদির আস্তানা। দু-একবার এসেছে গীতালি, এদিক ওদিক বাড়ি আরো বেড়ে গেলেও চিনতে দেরি হল না।

দোরগোড়াতে কস্তুরী বসে।

'এই যে বাপু এসেছ। ধড়ে প্রাণ এল। আর দুজনের তো দেখা নেই।'

'কি হয়েছিল মেনকাদির?'

'এ-সব বস্তিতে যা হয়।' চিত হাতে ভঙ্গি করে কস্তুরী বললে, 'কলেরা।'

'কলেরা?' ভয়ে গীতালির মুখ এতটুকু হয়ে গেল। চোখ কপালে তুলে তাকাতে লাগল এ-পাশ ও-পাশ।

'আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সাবাড়।' লেপটে বসেছে কস্তুরী, উঠতে চায় না 'হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম কিছু করতে পারল না। কত লোকের প্রাণদান করেছে কিন্তু ওঁর প্রাণ কেউ দিতে পারল না—'

'খোকা কেমন আছে?' ঢোঁক গিলে জিগগেস করল গীতালি।

'ভালো আছে।'

'আর দুজনের যে আর দুজন ছিল—'

'ওরাও।' ভাগ্যের বিধানে বিশেষ খুশি নয় কস্তুরী। বললে, 'ওরা কি কেউ মরতে এসেছে? ওরা কিছুতেই মরবে না বলেই তো এই গেরো।'

'কোথায় খোকা?' ভিতরে আরো একটু পা বাড়াল গীতালি।

'কোথায় আবার! ঘরে। ঘুমুচ্ছে—'

সন্তর্পণে উঠল রোয়াকে। ঘরের দরজা খোলা। বাইরে থেকে উঁকি মারল। না, ঘরে রুগী কেউ নেই, তিনটি শিশু পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। একটি ছেলে দুটি মেয়ে।

ওই, ওই যে তার খোকন। ঠুঁটোর মতন মুঠো করে শুয়ে আছে চিত হয়ে। দিব্যি কাজল পরিয়ে দিয়েছে দেখ। টেবো-টেবো গালে কেমন ভারিক্কি ভারিক্কি ভাব করেছে। কই, না, ভারিক্কি কোথায়! চিবুকের খাঁজটিতেও স্পষ্ট একটি খুশির টান। তাকে চিনতে পেরেছে বুঝি। গীতালির বুকটা খালি-খালি লাগতে লাগল। ইচ্ছে হল ঐ আনন্দ-পুঞ্জটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে একটু কাঁদে। কতদিন কাঁদেনি গীতালি। কাঁদতে যেন ভুলে গিয়েছে।

তোমাকে পৃথিবীতে আনতে পেরেছি, বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি, যেখানে নিষ্ঠুর অন্ধকারের ওপারে আছে একটি শুকতারা। জন্মের কণ্টকবৃন্তের পর জীবনের পুষ্পোচ্ছ্বাস।

তারই জন্যে কান্না।

কিন্তু, না, এখন বুকের মধ্যে ধরতে গেলে ঘুম ভেঙে যাবে, কাঁদতে থাকবে, তখন যদি না আর শান্ত করা যায়।

কস্তুরী উঠে এল ঘরের মধ্যে। বললে, 'এবার নিজের ছেলে নিজের কাছে নিয়ে যাও, দিদি।'

'নেব।' নইলে চিঠি পেয়ে আসার মানে কি। 'কিন্তু,' গীতালি ভাবনাধরা গলায় বললে 'কিন্তু এ নার্সিং হোম কি তুলে দেবে?'

'আর নার্সিং হোম! যিনি নার্স ছিলেন তিনিই যখন চলে গেলেন তখন একে আর কি করে রাখা যায় বলো।'

'কেন, তুমি রাখবে?'

'আমি কি ডাক্তারি জানি? কাটতে-ফুঁড়তে জানি? আমি তো শুধু ধাই।'

'আর গঙ্গা?'

'ও তো ঝি।'

'ও কোথায়? দেখছি না তো।' গীতালি উসখুস করল।

'বাজারে গেছে। আসবে এখুনি। বোস একটু। গাড়ি এনে দেবে'খন। বাচ্চাটাকে এবার নিয়ে যাও কোলে করে।'

'এখুনি?' গীতালি যেন হোঁচট খেল চলতে-চলতে।

'যখন এসে পড়েছ তখন আর দেরি করে লাভ কি।' শিশুগুলোকে কস্তুরী পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

'আগে ঠিক করি কোথায় নিয়ে যাই। কোথায় রাখি। তারপর—' যেন ডুবজলের ভিতর থেকে গীতালি বললে।

'সে কি, দেরি কেন, দেরি চলবে না। এখন এসব ঝামেলা কে পোহাবে? দিদি ছিলেন—সে একদিন গেছে। এখন কে দেখবে-শুনবে? না নেবে তো,' কস্তুরী মুখ বাঁকাল: 'ভেসে যাবে, টেঁসে যাবে—'

'কাল—কাল নিয়ে যাব।' তারপর কুণ্ঠিতের মত বললে, 'এ মাসের টাকা তো দেয়া আছে।'

'সে আর আছে নাকি কিছু? মেনকাদির অসুখেই সব শেষ হয়ে গেছে।'

'আর ও দুই বাচ্চার কি হবে?' খোকনকে রেখে আর দুজনকে ইঙ্গিত করল গীতালি।

'সকলেরই এক হাল। দুদিন অপেক্ষা করব, তারপর লোকজন যদি কেউ না আসে বস্তিতে কাউকে বেচে দেব নয় তো কোনো ভিখিরীর আড্ডায়। নয় তো—'

'নয় তো—' কত ভয়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে, এ আবার আরেক নতুন ভয়।

'নয় তো,' থামল না কস্তুরী· 'নয় তো আব কি! পড়ে থাকবে একলা ঘরে। না খেতে পেয়ে মরে যাবে শুকিয়ে। এ দোকানপাট আমরা আগলাতে পারব না। আমাদের মাইনে দেবে কে?'

গঙ্গা এসে দাঁড়াল বাজার নিযে। সবাই আবার বেরুল ঘর থেকে। এক গাল হেসে বললে, 'বাপু, এসেছ, বেশ করেছ। এবার নিয়ে যাও যার যা আঁচলে সোনা। নিজের কাছে রাখতে নার বাপের কাছে রেখে এস। মনের অগোচর পাপ্ নেই, মায়ের অগোচব বাপ নেই। মেনকাদি ছিলেন সব সামলেসুমলে। এখন বাচ্চাগুলি যদি পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে তা হলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে—লাভ হবে কি? লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে।'

ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করল গীতালি। কস্তুরীর হাতের মধ্যে নোটটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'আরেকদিন আমাকে সময় দাও। আমি কাল যা হোক ব্যবস্থা করব।'

'যদি না আস?'

'তা হলে আরো একদিন।' ব্যাকুল হয়ে বললে গীতালি।

'না বাপ্‌, পারব না এত দেরি সইতে।'

'যদি নিতান্তই না আসি, তা হলে যা ভালো বোঝ কোরো। আমি তখন আর কি বলব!' গীতালির দুই চোখ ছলছল করে উঠল। আরেকবার ঢুকল ঘরের মধ্যে। ইচ্ছে হল জাগিয়ে দিয়ে ওর একটু শব্দ শুনি। হয় কান্না নয় হাসির আওয়াজ। ওকে আদর করি। বুকের মধ্যে বেঁধে ছুটি মাঠ দিয়ে।

আর, শোনো, এই খেলনাটা ওকে দিও। ও তো বুঝবে না এ ওকে কে দিল? যদি আর না আসি ওকে বোলো যেন এই ঝাণ্ডা ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে চলে আসে একদিন। ব্যাগের থেকে খেলনা ঘোড়াটা বের করে কস্তুরীকে দিল।

তারপর বেরিয়ে এল সটান। স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল।

মফস্বল শহরে যখন এসে পৌঁছল তখন রঙ্গমঞ্চের উইংসের ফাঁকে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা উঁকিঝুঁকি মারছে, পূর্ণ প্রত্যক্ষ হয়নি।

খানিকক্ষণ স্টেশনে হেলাফেলা করল। খিদে পেয়েছে, লজ্জা কি, লুকিয়ে কিছু খেয়ে নিল। অন্ধকারটা একটু ডাঁসালো হোক ততক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এসে রিকশা নেব। দুজনেই, আমি আর রিকশা, মাথায় তুলে দেব ঘোমটা।

শুধু পাড়ার নাম নয়, রাস্তা ও বাড়ির নাম করলে। হাঁকডেকে বাড়ি। নামেই সবাই তটস্থ।

'বাবু বাড়ি আছেন?' গেট পেরিয়ে এসে ভিতর-দারোয়ানকে জিগগেস করলে।

না, নেই, সিনেমায় গেছেন কিংবা বেরিয়ে গেছেন কিংবা কোনো বন্ধুর বাড়ি, এমনি হয়তো বলবে। যদি তাই বলে, আবার আসব। যে করে হোক মধ্য রাতেই হোক, ধরবই ধরব।

যদি বলে, আছেন কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় আড্ডা দিচ্ছেন বা তাশ খেলছেন, তা হলে? তা হলে বলব, বলোগে নিরালায় দেখা করতে এসেছেন এক ভদ্রমহিলা।

কিন্তু যদি শোনে, এখানেই নেই চলে গিয়েছে বাইরে, বিদেশে, কবে ফিরবে কেউ জানে না, তাহলে কি করবে?

তাহলে ফিরে যাব। যা থাকে অদৃষ্টে, ছেলেকে বুকে নিয়ে ঝাঁপ দেব।

সমুদ্রে? হ্যাঁ, সমুদ্রে, যে সমুদ্র প্রত্যাখ্যানই করে না, মাঝে মাঝে আশ্রয়ও দেয় সেই সমুদ্রে। জলের সমুদ্রে নয় ভালোবাসার সমুদ্রে।

'বাবু আছেন?'

'কোন বাবু?'

'মেজবাবু। অরবিন্দবাবু।'

'আছেন।'

'আছেন? তা হলে বলো একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন।'

'যদি নাম জিগগেস করেন?'

'বোলো গীতালি বোস, না, না, গীতালি ব্যানার্জি দেখা করতে এসেছে।'

দাঁড়িয়ে রইল উত্তেজনায় সংযত হয়ে। কতক্ষণ পরে ভিতর-দারোয়ান ফিরে এসে বললে, 'আসুন।'

'নাম জিগগেস করেছিলেন?' সঙ্গে যেতে-যেতে জিগগেস করল গীতালি।

'না। এমনি বলতেই নিয়ে আসতে বললেন।'

এখনো শুধু ভদ্রমহিলা বলতেই আগ্রহ উত্তেজিত হয় দেখছি। কি নাম কি ধাম কি প্রয়োজন কোনো কিছু অনুষঙ্গেই আর কৌতূহল নেই।

কোনো দুঃস্থ নারী অর্থসাহায্য চাইতে এসেছে এ বুঝলে সকালে আসতে বলত। এটা কি দুঃস্থের ভিক্ষা নেবার লগ্ন? নিশ্চয়ই দারোয়ানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে আগন্তুকার বয়স কত, কিংবা সভাস্থ হবার যোগ্য কি না। নইলে এই উদার উদ্যোগের কারণ কি?

নিচের নিরাভরণ একটা ঘরে দারোয়ান বসাল গীতালিকে। এ-বাড়িতে এর আগে আর কোনোদিন আসেনি তাই জানে না এ ঘরটা কোন জাতের। বসবার না শোবার না প্রতীক্ষা করবার।

ইচ্ছে করলে কিন্তু আসতে পারত একদিন।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই অরবিন্দের শব্দ। কিন্তু কে জানে হয়তো দেখবে, হাতে রাইফেল নয় ক্যামেরা, সেই মেজবাবু। কলকাতার গলিতে বর্ষা এল বলে কতদিন উৎসুক হয়ে তাকিয়েছে বাইরে, দেখেছে এক পশলা বৃষ্টি নয়, একটা ট্রাক চলে গেল, এ শুধু তার এঞ্জিনের কোলাহল।

কি আশ্চর্য, আলো জ্বালায়নি ভোগ সিং। সুইচ টেনে আলো জ্বালাল অরবিন্দ।

'এ কি! এ কে! তুমি? তুমি কোত্থেকে?'

গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ—শুধু ক্রোধ নয়, ঘৃণা।

'বসো। বলছি।' গীতালি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল।

কিন্তু কিভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারল না। কলকাতার রাস্তায়

মাঝে মাঝে দেখেছে একটা মোটর-গাড়ি বিগড়ে গেয়েছে, ভিতরে মধ্যবিত্ত মেয়েছেলে, গাড়ি কিছুতেই মন্ত্র পড়ছে না আর পিছনে ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ে অনবরত ঘণ্টা দিচ্ছে। তখন গাড়ির ভিতরকার আরোহীকে যেমন মূর্খ দেখায়, তেমনি মূর্খ দেখাচ্ছে গীতালিকে। কিন্তু স্থির পায়ে যখন একবার এসেছে তখন স্থির স্বরে পাড়তেই হবে কথাটা।

তার আগেই নিজেই অরবিন্দ কথা পেড়েছে। বললে, 'তোমার তো এ-বাড়িতে আসবার কথা নয়। তবে এলে যে বড়?'

'পথ ভুলেও তো লোকে আসে। এমনি কত এসেছে আগে-আগে।' চোখ স্থির রেখে নিশ্বাস রুদ্ধ করে গীতালি বললে।

'জানো আমি বিয়ে করেছি?' তপ্ত হয়ে উঠল অরবিন্দ।

'জানি।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অর্ধনিম্নস্বরে গীতালি বললে, 'বউ কোথায়?'

সেই দমিত কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করল অরবিন্দ। বললে, 'বাপের বাড়ি।'

'তা হলে তো ভালোই হল।' লঘু হবার চেষ্টা করল গীতালি: 'তা হলে তোমাকে অনেকক্ষণ পাওয়া যাবে।'

'আমার অনেকক্ষণ বসবার সময় নেই।' অরবিন্দ বাঁকানো ধনুকের মত উদ্যত হয়েই আছে: 'আর যে এ-বাড়ি কোনোদিন ঢুকবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই বা কেন আসে পথ ভুলে এ আমার বুদ্ধির অগম্য।'

'আমি আমার নিজের প্রয়োজনে আসিনি তোমার প্রয়োজনে এসেছি।' বললে গীতালি।

'আমার প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ, তোমাকে তোমার জিনিস ফিরিয়ে দিতে এসেছি।'

'আমার জিনিস!' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল অরবিন্দ।

'হ্যাঁ, তোমার ছেলে।'

'আমার ছেলে!' অরবিন্দ তর্জন করে উঠল: 'আমার ছেলে কোথায়? তুমি এ-সব কি বলছ অন্যায় কথা?'

'অন্যায় কথা!' শব্দ করে হেসে উঠল গীতালি। বললে, 'যা তুমি তোমার বিবেকের বিবেকে জানো, যা সকলে জানে যা জলের মত প্রমাণিত, তা নিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে কেন? কাকে শোনাবার জন্যে? তোমার বউ তো নেই কোথাও আশেপাশে। তবে কেন এই আস্ফালন?'

'আস্ফালন তুমিও কম করনি।'

'শোনো, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি পরামর্শ করতে

এসেছি।' বসবার ভঙ্গিতে স্নিগ্ধ আলস্য আনল গীতালি : 'ছেলেটা যে নার্সের কাছে হয় ও যার কাছে সে এ দু বছর মানুষ হচ্ছিল সে হঠাৎ মারা গেছে। কলকাতায় কেউ নেই তার সেই নার্সিং হোম চালু রাখে। সুতরাং ছেলেকে সরাতে হবে। কোথায় রাখি তাকে? তুমি ছাড়া আর তার বলশালী আশ্রয় কোথায়? তাই তোমার হাতে সঁপে দিতে এসেছি।'

'ছেলের মা কে?'

'আমি।' সত্য ও সারল্যের চূড়া স্পর্শ করে আছে গীতালি : 'আমি যদি তোমার স্ত্রী হতাম আর তোমাতে-আমাতে যদি এমনি বিচ্ছেদ হত তা হলে, তুমি বাপ, তুমিই আইনে ছেলের আশ্রয়দাতা অভিভাবক হতে।' কাজে কাজেই তোমারই অগ্রাধিকার।'

'আমি আধখানা নেব কেন?'

'আধখানা?'

'হ্যাঁ। আমি মা-ছাড়া ছেলে নেব কেন?' অরবিন্দ তার চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরল : 'আমি দুজনকেই নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি, তুমিই তো—'

দু হাতে মুখ ঢাকল গীতালি।

মা যখন ঘরদোর অন্ধকার করে রুদ্ধশ্বাসে জিগগেস করলেন বল কে, তখন গীতালি এক ডাকে বললে, অরবিন্দ। কে অরবিন্দ? ঐ যে সিনেমা-হাউসের মালিক হেরম্ব দাস, পেট্রল পাম্প আছে, দুটো, তার দ্বিতীয় ছেলে। দাদারা আরো ভালো চিনলেন। ঐ যে বখা উড়নপেকে নচ্ছার ছেলেটা, রাঙা মুলো, খালি ফাংশান করে বেড়ায় আর একটা টুরার কারে করে ঘোরে, ইয়ারবক্সিদের নিয়ে, কখন বা নাটকের পাত্রপাত্রীদের নিয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বা সীমান্ত-রেখার মেয়ে, সঙ্গে দুই শিকারের যন্ত্র, রাইফেল আর ক্যামেরা, সেই অল্পাশয় অপদার্থকে পছন্দ করলি? ছি ছি ছি! এখন কি বলে সেই হতচ্ছাড়া? জানি না, জানি না, গীতালি মুখ ঢাকল দু হাতে।

দাদারা অরবিন্দকে গিয়ে ধরলেন। প্রথমটা পাশ কাটাতে চাইল অরবিন্দ। তুমুল করবে, পুলিশ লেলিয়ে দেবে, কোর্টে তুলবে, আরো অনেকভাবে নাকাল করবে, জাতসাপের মাথায় পা দিয়েছ আর যার মান যায় সে প্রাণ পর্যন্ত নিতে পারবে—তবে ও তখন অরবিন্দ রাজি হল। দাদারা জয়ীর মত বাড়ি ফিরলেন। মাকে বলতে মারও বুকের ভার লাঘব হল।

কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার। গীতালি কিছুতেই এ সন্ধিতে রাজি নয়,

কিছুতেই নয়। আমি কিছুতেই আর ওর ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব না, কিছুতেই পারব না ছুঁতে। না না না। ও আমার সঙ্গে ছলনা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমার মুহূর্তের অসাবধানতার সুযোগ নিয়েছে, ও কপট ধূর্ত মিথ্যাবাদী—

'যাই হোক, এখন আর ফিরে যাবার রাস্তা কই? তোর নিজের জন্যে না হোক, অন্তত যে আসছে তার জন্যে এ ব্যবস্থা মানতেই হবে। না মেনে সমাধান নেই সমাপ্তি নেই—' বললেন মা-দাদারা।

কিছুতেই না। যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে সব দেওয়া যায়, সব নেওয়া যায়। আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে প্রবেশ করা যায় আগুনে। কিন্তু যেখানে এক বিন্দু স্নেহ নেই বিবেক নেই হিতবুদ্ধি নেই, যেখানে শুধু প্রতারণা অশ্রদ্ধা অপমান সেখানে পারব না সাড়া দিতে।

ও যদি ধূর্ত হয় তুইও ধূর্ত হ।

ঐ অপঘাতের চেয়ে আত্মহত্যাও ভালো।

তবে এর পরিণাম কি হবে?

যা হয় তা হবে। আমি ভুল করেছি আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আমি দাঁড়াব পৃথিবীর মুখোমুখি, জীবনের সঙ্গে সমক্ষ সংঘাতে। পেছপা হব না। পাপ করে থাকি, নিজেই প্রক্ষালন করে যাব।

উদ্দণ্ড অত্যাচার চলল গীতালির উপর। কিন্তু মেয়ে টলে না, ভাঙে না, উহু করে না একবার।

দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রে পুরুষই কেটে পড়ে, কিন্তু মেয়ে এমন অবস্তুবাদী হয় এ বিপর্যয় কাণ্ড কেউ ভাবতেও পারে না। আগে এ কলঙ্ক মুছে ফ্যাল, এ লজ্জা চাপা দে, তারপরে যত খুশি সংগ্রাম কর, বিদ্রোহ কর, যা খুশি কর।

এ কলঙ্ক মোছবার নয় কিছুতেই, এ লজ্জা যাবে না চাপা দেওয়া।

মায়ের গুরুদেব আছেন, সহজানন্দ স্বামী, শহরের উপান্তে বিরাট আমবাগানের মধ্যে আশ্রম করে থাকেন, তাঁর কাছে আনা হল গীতালিকে।

ক্ষমা ও সান্ত্বনার খনি, শ্যামস্নিগ্ধ আশ্রমে সৌম্য সুন্দর সন্ন্যাসী, সব শুনলেন ধৈর্য ধরে।

কিন্তু তাঁরও মীমাংসা তাই। বললেন: 'যখন গ্রহণ করতে চাচ্ছে তখন আর কথা কি।'

'ও হচ্ছে ওর কথার কথা, মুখের কথা।' বললে গীতালি, 'কোনো রকমে লেপাফা ঠিক রেখে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ফলের ছিবড়ের

মতন, বিচির মতন। একবার অপমান করেছে, দ্বিতীয়বার সইতে পারব না।'

অনেক বোঝালেন স্বামীজী।

'কিন্তু ধরুন, যা স্বাভাবিক ছিল, ও যদি রাজি না হত? তাহলে আমি কি করতাম? আমি ওকে বুঝেছি। ওর হাঁ বলা না বলারই ছদ্মবেশ।' গীতালির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ শাড়ির পাড়ের খানিকটা দু হাতে ছিঁড়ে ফেলল লম্বা করে। বললে, 'আমি বিধবা, আমি বিধবা হয়েছি। যে লগ্নে আমার বিয়ে সেই লগ্নেই আমার বৈধব্য। আমার স্বামী মৃত। মেয়ে কি সসন্তান বিধবা হয় না?'

'আত্মহত্যাও তো করে।' মার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

না, মরব না, কেন মরব? আমি যুঝব প্রাণপণে। দেখব স্থান পাই কি না, মাটির মালিন্য মুছে ফেলে উঠতে পারি কি না ফুল হয়ে। যে রুগ্ন সে কি আর সুস্থ হতে পারবে না, যে হৃতসর্বস্ব তার কি নেই আর সার্থক হবার অধিকার? জীবন কি এত ক্ষুদ্র? ঈশ্বর কি এত কৃপণ? দুঃখ কি অফলদায়ী?

'ভবিষ্যৎ ভাবছ? কি করবে তবে?' ঘোরালো মুখে স্বামীজী জিগগেস করলেন।

'আশ্রম করব।'

'আশ্রম করবে!' যীশুখৃস্টের মতন করে হাসতে চাইলেন স্বামীজী।

'এই শূন্য আশ্রম নয়, পূর্ণ আশ্রম। যে সমস্ত শিশু এমনি অনাথ, পরিত্যক্ত, অকাঙ্ক্ষিত, যাদের স্থান সমাজ করে দিয়েছে ভিক্ষুকের আড্ডায়, জেলখানায়, নর্দমায়, আঁস্তাকুড়ে, তাদের বিকলাঙ্গ পঙ্গু জীবন থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই আশ্রম। আপনি সাহায্য করবেন আমাকে। সাহায্য না করেন আশীর্বাদ করবেন।'

কিন্তু পরিবার এ-সব মানতে চায় না। এ শুধু মেয়ের মুখে চুনকালি নয়, সমস্ত পরিবারের মুখে।

দাদারা লুকিয়ে তাই ডাক্তার আনলেন।

ডাক্তার যাই বলুক, গীতালি কিছুতেই রাজি হল না। তখন ডাক্তারই মেনকার নার্সিং হোমের খবর দিলে। মেনকা শুধু খালাসই করে না, প্রতিপালন করে। যতদিন টাকা দাও ততদিন তোমার। না দাও তো আমার।

এ ব্যবস্থা সুস্থতর। নিজেও বাঁচল শিশুও বাঁচল। শিশু বাঁচল দেহের হত্যা থেকে, গীতালি বাঁচল আত্মার হত্যা থেকে। আর যদি

একবার কেউ বাঁচে তার বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা বাড়তেই থাকে। সব আগুনই নেভে, কিন্তু বাঁচবার আগুন বাজবার আগুন নিভতে চায় না।

শুধু ক্ষতচিহ্নের উপর সময়ের ভস্মস্তূপ চাপা দিতে হবে। তাই দাদারা শহর বদলালেন, বাসা নিলেন কলকাতায়। আর সময়ের হাত ধরে একদিন চলে এল বাসুদেব। নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

গীতালি মুখ সরিয়ে নিল হাত থেকে।

বললে, 'সে একদিন গেছে। বুঝতে পারিনি নিজের অনুপাত। পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম, কি যন্ত্রণা যে পেয়েছি তা আমিই জানি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা, ভুলের যন্ত্রণা, ভুল করে ফিরিয়ে দিয়েছি তোমাকে। তুমি উৎসুক আর আমি কিনা উদাসীন। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম বলে তুমি আজ ভুল কোরো না।'

'না. এতে ভুল করবার কি আছে!' চোখের দৃষ্টি ভালো করে বিছিয়ে দিয়ে তাকাল অরবিন্দ।

'শত হলেও তোমারই তো ছেলে। তোমার হাড়ের হাড় রক্তের রক্ত। একে তুমি নর্দমার ইঁদুরের মতন বয়ে যেতে দেবে? তুমি তো একেবারে স্নেহহীন নও। আজ যতই কেননা দূরে দূরে দাঁড়িয়েছি আমরা. একদিন তো ছিল, একদিন তো অন্তত—' গাঢ় আবেশে চোখ নত করল গীতালি।

'তুমি আমাকে কি করতে বলো? তোমার প্রস্তাবটা শুনি?'

'ছেলেকে তোমার কাছে রাখো। ঠিক এ-বাড়িতে না হোক. অন্য কোথাও. কিন্তু তোমার চোখের সামনে তোমার তত্ত্বাবধানে। তোমার ছেলে তোমার কাছে থাকবে এই আমার সাধ, আমাব শান্তি। নইলে ও কোথায় চোব ডাকাত পকেটমারের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, মদ চোলাই করবে. ওয়্যাগন ভাঙবে. ট্রাম পোড়াবে. এ আমি সইতে পারব না। আমার মুখের ভাত আর চোখের ঘুম বিষ হয়ে যাবে। তার বদলে তোমার কাছে আছে, তার বাবার কাছে—'

'ছেলে কোথায়? এনেছ?'

'না আনিনি। তুমি আমার সঙ্গে চলো. কলকাতায় সেই মেনকাদির নার্সিং হোমে, তোমার হাতে তোমার ছেলেকে পৌঁছে দিই—'

'আমি তো সেই নার্সিং হোমের রাস্তাটাস্তা চিনি না. আর আমাকেই বা তারা চিনবে কেন?'

'বা, কি বললাম, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে। কাল ভোরের ট্রেনে। দেখবে তোমারই মত নাকমুখ, তোমারই মত রঙ—'

'আজ রাত্রে তবে থাকবে কোথায়?' উঠে দাঁড়াল অরবিন্দ।

'কেন, এইখানে, তোমাদের বাড়িতে।' সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করে আছে গীতালি এমনি তার দুঃসাহসের সুর।

কপট, ধূর্ত, প্রবঞ্চক। চিৎকার করে তীব্র কণ্ঠে ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছে হয়েছিল অরবিন্দের। কিন্তু নিজেকে সংযত করল। চেয়ার আর টেবিলের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, 'শোনো। ছেলেছাড়া মাকে নিতে আমার প্রবৃত্তি নেই। ভোগ সিংকে বলব তোমাকে একটা রিকশা ডেকে দিতে?'

'না, আমি একাই পারব।' অসমান পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেল দীপালি।

আর মন স্থির করতে দ্বিধা নেই। ছেলে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝাঁপিয়ে পড়বে বাসুদেবের ক্ষমার সমুদ্রে, ঔদার্যের সমুদ্রে, ভালোবাসার নীল জলে। স্বীকৃতি আছে বলেই মার্জনা করবে, শ্রান্ত আছে বলেই তৈরি করবে শান্তির পরিবেশ। আবার নতুন করে একটি শৈশব-আলোতে আলিঙ্গনের সঙ্গে সমর্পণের শুভদৃষ্টি হবে, স্থৈর্যের সঙ্গে আকুলতার।

রাতটা স্টেশনে, ওয়েটিং রুমে কাটাল। ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি, তাই ট্রেন ধরতে সেই ফার্স্ট ট্রেন। ফিরে এল নার্সিং হোমে।

'কি, জায়গা ঠিক হয়েছে?' জিগগেস করল কস্তুরী।

'হয়েছে।'

মীরাদিকে দেখতে গিয়েছিলাম. মীরাদি এই দু বছরের ছেলেটাকে রেখে মারা গিয়েছে। কেউ নেই ছেলেটাকে যত্ন করে, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এমনি করে বললেও তো মন্দ হয় না। কিন্তু না. কেমন যেন সত্যিসত্যি শোনাচ্ছে না তা ছাড়া মীরাদির সঙ্গে সম্পর্কটা ধবাছোঁয়ার মধ্যে। সত্য সরল কথা বলায় অনেক শক্তি. অনেক তৃপ্তি। সত্যই প্রক্ষালন। সত্যই নীল আকাশ।

কুড়ি টাকা কস্তুরীর হাতে দিয়ে বললে 'যদি এক কাজ করতে পাবো।' গঙ্গাকে আরও দশ টাকা দিল, বললে, 'তুমি ছাড়া এ-কাজ হবার নয়, কিছুতেই নয়।'

'কি কাজ?' দুজনে জিগগেস করল এক সঙ্গে।

'আজ শেষ রাত্রে খোকনকে বেশ করে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ির বাইরের রোয়াকে চুপ করে রেখে আসবে।' এদিক ওদিক তাকিয়ে চক্রান্তঘন গূঢ়স্বরে বললে গীতালি, 'আমি জেগে থাকব বাইরের দিকে চেয়ে। যখন ছেলে রেখে পালাবে তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি নেমে আসব,

আর ছেলে কাঁদ্ক বা না-কাঁদ্ক তুলে নিয়ে ছ্টব উপরে আর খালি বলব—পেয়েছি, পেয়েছি, আমার না-পাওয়া ধন পেয়েছি—'

হাত পাতল গঙ্গা। বললে, 'দশ টাকায় হবে না আরো দশ টাকা লাগবে।'

তাই দিল বার করে। বললে, 'ওকে একেবারে শক্ত রোয়াকের উপর শ্ইয়ে দিও মা। ওর মাথার ছোট্ট একটা বালিশ নিয়ে এস। কি, পারবে তো?'

'খ্ব পারব। তবে আজ যদি না পারি?'

'কাল নিয়ে এস।'

'পরশ্র মধ্যে ঠিক পেশছে দেব। আগে থেকে সব ঘাঁতঘোঁত দেখে আসতে হবে। এখান থেকে তো রাত করে বেরোনো যাবে না, ট্রাম বাস নেই, পথেই ধরবে। তাই কাছাকাছি, হাঁটার পথের মধ্যে ডেরা একটা খ্ঁজে নিতে হবে, সেখান থেকেই তাক ব্ঝে ফাঁক খ্ঁজে রেখে আসব ছেলে।'

'কেমন আছেন মীরাদি?' বাড়ি ফিরলে জিগগেস করলে বাস্দেব।

'এ যাত্রা রক্ষা পাবেন মনে হচ্ছে।' হাতে কিছ্ রসদ এখনো রাখল গীতালি। 'তবে ক্রাইসিস প্রো কাটেনি এখনো। কোলের ছেলেটাকে নিয়েই বেশি ম্শকিল, কেউ তেমন নেই দেখে-শোনে।'

আধ-চাওয়া চোখে সমস্ত রাত কাটিয়েছে শ্য়ে-বসে। বারে-বারে উঠে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে দেখছে নিচের দিকে, কোনো কাপড়ের প্টলি দেখে কি না, শোনে কিনা কোনো শিশ্কণ্ঠের কান্না। আর মনে মনে আকুল প্রার্থনা করেছে, বাস্দেবের চোখে যেন সম্দ্রের ঘ্ম নামে অপার-বিশাল ঘ্ম। অসংশয়ের ঘ্ম।

পরদিন রাত্রে স্বপ্নভরা চোখে নামছে নিচে টের পেয়েছে বাস্দেব। একি, কোথায় যাচ্ছ?

'একটা বেরাল কাঁদছে শ্নতে পাচ্ছ না? আমাদের বাড়ির মধ্যেই বোধহয়। নিচে, বোধহয় ঘ্ঁটে-কয়লার ঘরটাতে। দেখে আসি।' কোণ থেকে একটা ছড়ি কুড়িয়ে নিল গীতালি 'ওটাকে না তাড়াতে পারলে ঘ্ম আসবে না কিছ্তেই।'

বেরাল ছানা দেখা গেল না কোথাও। তবে এ কান্না কি তার নিজের ব্কের মধ্যে? একটি শাশ্বত নিরাশ্রয় শিশ্র নিষ্ফল কাকুতি?

আরো এক রাত কাটল। কাঙাল কান শ্নতে পেল না সেই কান্নার আনন্দ।

তবে কি আরেকবার খোঁজ করে আসবে? খোকন ভালো আছে তো? আর কোনো বাধেনি তো বিপদ? অন্য কোনো ব্যাঘাত? বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল, অরবিন্দই এসে নিয়ে যায়নি তো ছল করে?

ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি গীতালি। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে লাগল : 'বউমা, ওঠো ওঠো।'

কাকিমার গলা। আগুন-ছোঁয়া তুবড়ির মত উঠে পড়ল গীতালি। দরজা খুলে বাইরে এসে বললে, 'কি? চোর?'

'না, কে একটা বাচ্চা শিশু আমাদের রোয়াকে শুয়ে কাঁদছে।' উদ্বেল গলায় বলছেন কাকিমা · 'কে কখন ফেলে গেছে কে জানে!'

'ছেলে, না মেয়ে?' তরতর করে গীতালি নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

'কি জানি কি। একটা কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা শিশুর কান্না।' কাকিমাও নামলেন।

বাসুদেবও নামল।

ভালোই হল। রোয়াক ঘেঁসে কাকিমার ঘর, কাকিমাই প্রথম চাক্ষুষ সাক্ষী। তিনিই বলতে পারবেন বাইরে থেকে কে কার ছেলে রেখে গিয়েছে দোরগোড়ায়।

দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ব্যাকুল হাতে শিশুটাকে কুড়িয়ে নিল গীতালি। সেই চোখ সেই নাক, সেই চিবুকের খাঁজ। উদ্বেল বুকের মধ্যে চেপে ধরল। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বাসুদেবকে বললে, 'দেখ, দেখ, কি ফুটফুটে সুন্দর!'

বাসুদেব গম্ভীর হয়ে বললে, 'কার না কার ছেলে ঘরে তুলছ না জেনে—'

'যারই হোক যখন ফেলে গেছে দরজায তখন ঘরের লোককে নিতেই হবে হাত বাড়িয়ে। যদি কচি শিশুর একটু সেবা বা শুশ্রূষার দরকার হয় দিতেই হবে গৃহস্থকে।' ধৈর্যের প্রতিমা জননীর ভাষায় কথা বললে গীতালি।

'আমার মনে হয় যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দিলেই ভালো হত।' বাসুদেব মুখ ঘোরালো করল 'পুলিশকে খবর দিতাম।'

'পুলিশকে খবর দেবে কি!' প্রায় ঝামটে উঠল গীতালি · 'এ কি মরা ছেলে যে কোনো অপরাধ সন্দেহ করবে? দিব্যি জলজ্যান্ত ছেলে, তাজা সুস্থ—'

'তবু কে জানে এর মধ্যে কোনো অপরাধের গন্ধ আছে কি না।' হাওয়ায় যেন বারুদ শুঁকল বাসুদেব।

'বড় জোর হতে পারে চুরি। চুরি হলে ফেলে যাবে কেন?' একটা প্রায় লোহা-ঢালাই প্রশ্ন করেছে এমনি ভাব করল গীতালি।

নস্যাৎ করে দিল বাসুদেব। বললে, 'এমনও হতে পারে ছেলের হাতে-গায়ে গয়না ছিল তাই নেবার জন্যে চুরি করেছে, তারপর গয়না খুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে ছেলে—'

'চোর বুঝি অমনি বিছানা-বালিশ শুদ্ধু তুলে আনে?'

'আপত্তি কি? তার লক্ষ্য হচ্ছে গয়না, তাই আর সবে তার লোভ নেই। কি অবস্থায় চুরি তার সম্ভব ও সুবিধের ছিল তা চোর জানে। কিন্তু আমি সে-কথা ভাবছি না।' দু কদম পায়চারি করল বাসুদেব: 'আমি ভাবছি যাদের ছেলে তারা না জানি কোথায় খুঁজছে হন্যে হয়ে। সুতরাং থানায় একটা খবর দেওয়া উচিত।'

'দাও না, কে বারণ করছে?' গীতালি প্রায় মুখিয়ে উঠল: 'ছেলেটা কাঁদছে। হয়তো খিদে পেয়েছে। ওকে কি তোমার একটু খেতে দিতেও আপত্তি?'

'এভাবে আঁকড়ালে থানায় খবর দিই কি করে?'

'তা হলে দিও না। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।' বললে গীতালি, 'পথে একটা হারানো ছেলে কুড়িয়ে পেলে তাকে কি কেউ ঘরে আনে না? না, যার সত্যিকার ছেলে খোঁজ পেলে তাকে দিয়ে দিতে দ্বিধা করে?'

'কিন্তু বিপদের কত রাস্তা কে জানে!' অন্ধকারে রোয়াকে এসে দাঁড়াল বাসুদেব।

'কিন্তু সমূহ এ ছেলেটার বিপদ দেখবে তো!' কান্নাধরা ছেলেকে শান্ত করবার জন্যে দোল দিতে লাগল গীতালি।

বাসুদেব রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক ঘুরে এল। কোথাও কোনো সূত্র নেই, বাষ্পের কণাটি পর্যন্ত নেই।

ফিরে এল বাসুদেব। বললে, 'তুমি দেখছি একটা খেলনা পেয়েছ।'

'সত্যিকার যখন পাব তখন পাব। যতদিন না পাই এই খেলনাটা নিয়েই খেলি।' বলতে এতটুকু বাধল না গীতালির।

'বিপদে পড়বার ভয় তো রইলই, তার উপর আবার দুঃখ পাবার ভয়।'

'দুঃখ?' চমকে উঠল গীতালি।

'কে কখন নিজের বলে দাবি করে বসে ঠিক কি!'

'দাবি করলেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে।'

'প্রমাণ করা কঠিন হবে না যেহেতু মামলায় কোনো প্রতিবাদী নেই। একতরফা ডিক্রি হয়ে যাবে এক ডাকে।'

'যখন হবে তো হবে। তুমি এখন দরজাটা বন্ধ করে দাও তো। বাচ্চাটার কত না জানি খিদে পেয়েছে, কতদিন ধরে না জানি বেচারা উপবাসী।' বলে ছেলের মুখটা আতপ্ত বুকের মধ্যে গুঁজে দিল গীতালি। সর্বশরীরে কাঁপতে লাগল স্থির হয়ে।

ঠিক যা বলেছিল বাসুদেব। খামে এক চিঠি এসে হাজির, লিখেছে সালকে থেকে কে এক আগমনী আদক।

লিখেছে, সে মেনকার বোন। জন্মে অবধি তার ছেলে মেনকার কাছে মানুষ হচ্ছিল। সেখান থেকে সেই ছেলে চুরি হয়ে গিয়েছে। খবর এসেছে সেই ছেলে আপনার বাড়িতে। সুতরাং আমি যাচ্ছি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে। কবে ও কখন যাব ঠিক করে জানাবেন।

পত্রপাঠ উত্তর দিল গীতালি : 'যে কোনো দিন দুপুরবেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আসবেন।'

ঐ সময়টা বাসুদেব নির্বিঘ্নরূপে আফিসে। বাদীর দাবির বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিঘাত করতে হবে, জানাতে হবে প্রতিবাদ, সেই পদ্ধতিটা সে নাই দেখল।

কিন্তু বাসুদেবকে সব কথা জানতে দেওয়াই তো উচিত ছিল, অন্তত এখন, এই আগমনীর আবেদনের সময়। গোড়াতে সেই কথাই তো ভেবেছিল যখন অরবিন্দের কাছ থেকে ফিরে আসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে। কিন্তু কি ভেবে কেন যে মন হঠাৎ বাঁকা পথ ধরল, ঘুর-পথ, কে বলবে! যেন শেষ পর্যন্ত বাসুদেবকেই তার ভয়। যে সমুদ্রে নিশ্চিত নিঃশেষ ঝাঁপ দেবে, ভয় সেই সমুদ্রকেই।

খোলার বস্তির অধিবাসিনী, এমনিই দেখতে আগমনীকে, যদিও এরই মধ্যে সাধ্যমত সে সম্মানিত প্রসাধন করেছে।

আশিরপদনখ একবার তাকে দেখল গীতালি। বললে, এখানে যে তোমার ছেলে আছে কে বললে?'

'গঙ্গা।'

'এ ছেলে যে তোমার তার প্রমাণ কি?'

'কস্তুরী।'

'ওরা কেউ এসেছে তোমার সঙ্গে?'

'না।'

'তবে যাও, মামলা করো গে। ফৌজদারি দেওয়ানি যা খুশি।' সত্যের আগুনে আলো হয়ে উঠেছে গীতালি : 'ছেলে আমি দেব না। ছেলে আমার।'

'আপনি কলেই হবে? আমার ছেলে। কই নিয়ে আসুন তো দেখি।' আগমনী শেষ চেষ্টা করল।

'তুমি চাইলেই তোমার কোলে ছেড়ে দেব এ তুমি মনে কোরো না।' গীতালি ঋজু দেহে দৃঢ়তার রেখা টানল : 'জিগগেস করি তুমি যদি মা তবে হারানো ছেলের খবর পেয়ে তখুনি ছুটে এলে না কেন? কেন দিনক্ষণ ঠিক করে দেখা করতে চাইলে?' কি একটা বলতে চাচ্ছিল আগমনী, গীতালি বাধা দিল : 'শোনো, কস্তুরী আর গঙ্গাকে কুড়ি টাকা করে দিয়েছি. মনে হচ্ছে তুমি পাশের বস্তিতে থাকো, তোমাকেও কুড়ি টাকা দেব। এ-পথে আর পা বাড়িয়ো না। কি, নেবে টাকা?'

'না, দরকার নেই।' চোখ নামাল আগমনী।

''কেন, অনেক পেয়েছ বুঝি?'

গীতালির চোখের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঠিকরে পড়ল আগমনীর চোখ।

'কে দিয়েছে?'

আগমনী আর পারল না লুকোতে। বললে, 'অরবিন্দবাবু।'

আরো কিছু পরিচয় দিতে যাচ্ছিল বুঝি. গীতালি বললে, বুঝেছি।

৬

পাশের জমিটা বিক্রি হয়ে গেল।

'কে কিনল? জিগগেস করলে চৌধুরী, মিস্টার সি. সি. চৌধুরী। বাংলা নাম যে চন্দ্রচূড় চৌধুরী এ স্বয়ং সি. সিই ভুলতে বসেছেন।

'আমাদের জাতগোত্রের কেউ নয়।' উত্তর করলেন চৌধুরানী, মন্দিরা দেবী : 'শুনলাম কে না কে এক মশলার ব্যবসাদার।'

'মশলার ব্যবসাদার!' ইজিচেয়াবে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন চৌধুরী, খবরেব কাগজ হাত থেকে মাটিতে খসে পড়ল : 'বাড়ি করবে নাকি?'

'তবে কি ফেলে রাখবে?' চায়ের টেবিলটা গুছোতে গুছোতে ঝঙ্কার দিলেন মন্দিরা : 'তখনই বলেছিলাম গোটা জমিটা কিনে ফেল। দু আদ্ধেকে দুটো বাড়ি হবে। একটাতে. বড়টাতে, আমরা থাকব, আরেকটাতে দেখেশুনে ভাড়াটে বসাব। যাকে তাকে নয়, দেখেশুনে। আমাদের দলের, লাইনের, অন্তত ব্রাণ্ড লাইনের লোক বেছে।' মানুষের কত রকম দুঃখ আছে। মনোমত প্রতিবেশী হবে না, এও এক দুঃখ।

'সত্যি, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। লোকটা টাকার কুমির বোধহয়।' মুখেচোখে অস্বস্তি ফুটে উঠল চৌধুরীর।

'কে জানে, টাকার হিপোপটেমাসও হতে পারে।' মন্দিরা মূর্তিমতী ঝাঁঝ।

'তাহলে! যদি আমাদের চেয়ে বড় বাড়ি তৈরি করে ফেলে?' দমধরা রুগীর মত উঠে বসলেন চৌধুরী।

'ফেলবেই তো।' টেবিলের উপর জিনিস ফেলার শব্দ করলেন মন্দিরা।'

'উপায়? তাহলে উপায় কি হবে?'

'কলা চুষবে।' অঙ্গুষ্ঠ দেখালেন মন্দিরা। মুখখানা গোল করে বললেন, 'গ্রহণের চাঁদ হয়ে থাকবে।'

'তুমি ওদের বাড়ির প্ল্যান দেখেছ?'

'আমি কোত্থেকে দেখব?'

'দাঁড়াও, কর্পোরেশনে খোঁজ নি। আর সিভিল লিস্টটা একবার দাও তো, দেখি কে আছে ডিস্ট্রিক্ট জজ, একটা ইনজাংকশান হানতে পারি কিনা '

সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন চৌধুরী। কিন্তু যেহেতু আই-সি-এস, সূর্য অস্ত যাবে না কোনোদিন। নাগপাশে বাঁধলেও গরুড় এসে জোটে। মরেও রাম মরে না। আর সব চাকরি ফুরোয়, এ ফুরোলেও জুড়োয় না। এর থেকে ছাড়ান পেলেও ছোড়ান পাবে না কোনোদিন।

'কিন্তু এত বড় দক্ষিণ পাবে কোথায়?' আপন মনে বলে উঠলেন চৌধুরী · 'এত বড় ফ্রন্টেজ? এত বড় গেটওয়ালা বাগান?'

'তবু ও-বাড়ি উত্তরে দাঁড়াবে তো গা ঘেঁসে।' গা যেন ঘিন ঘিন করে উঠল মন্দিরার।

'দাঁড়াক। ও তো পশ্চাৎ। পশ্চাতে চাব না মোরা, মানিব না দিক।' চৌধুরী কাব্য করে উঠলেন · 'এমন দক্ষিণ থাকতে কে আসবে টেক্কা দিতে? যতই ঘেঁসে দাঁড়াক কুঁকড়ে থাকবে।'

'তা হয়তো থাকবে, কিন্তু কি আপদ!' যেন কি সর্বস্বান্ত চেহারা মন্দিরার : 'ছাদের উপর দাগধরা কাঁথা-তোশক শুকোতে দেবে, চারপাশ থেকে শাড়ি-কাপড় ঝোলাবে, ছেলেরা ছাদে ঘুড়ি ওড়াবে, ডাণ্ডাগুলি খেলবে, ক্রিকেট খেলবে—'

'বোলো না, আর বোলো না—' দু হাত দিয়ে কান চেপে ধরলেন চৌধুরী।

'বিকেলে নিজেদের ছাদে হয়তো বেড়াতে উঠেছি, দেখব পাশের বাড়ির ছাদে কয়লার গুল দিয়ে রেখেছে কিংবা ঘুঁটের পাহাড় জমা করেছে—' যেন বিভীষিকা দেখছেন মন্দিরা।

এর মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজছেন চৌধুরী। বললেন, 'যাই বলো, আগেই অত ভয় পাই কেন? বাড়ি আগে হোক, দেখি না কে বসত করে! মশলাওয়ালার বাড়ি হলেও এমন হতে পারে নিজে না থেকে ভাড়া দিয়ে দেবে। আর এও আশা করা যাক সে-ভাড়াটে ভদ্রলোকই হবে শেষ পর্যন্ত।'

আপাতত সেই আশাতেই উত্তাপ খুঁজুন মন্দিরা। গাল পুরে কটা পান খান।

একটা প্রায় চৌকো প্লট। পুবদিকে বড় রাস্তা, ট্রাম রাস্তা। দক্ষিণ-দিকেও বেশ একটা চওড়া রাস্তা ট্রাম রাস্তা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে পশ্চিমে। সেই কোণেই চৌধুরীর বাড়ি, কিন্তু দক্ষিণে মুখ করা। উত্তরের দিকে প্লটের খানিকটা ফাঁকা, সেইখানেই মশলাওয়ালা সুবোধ সরখেলের বাড়ি উঠছে। তার উত্তরে আবার একটা গলি পুবে-পশ্চিমে টানা।

চৌধুরীর বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ। তেতলায়, ছাদের একধারে ঠাকুরঘর।

চৌধুরা জানতেন হাল আমলে ঠাকুরঘরও একটা আভিজাত্যের চিহ্ন। এবং সে ঠাকুরঘর বসবে সংসারের হট্টগোলের মাঝখানে নয়, একেবারে ঘরের চুড়োতে, সম্ভ্রান্ত নির্জনতায়।

ফুলকাটা দামি পাথরে দেয়ালে-মেঝেতে চেকনাই ফুটিয়েছেন। বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের। মূর্তিটিই কেমন শালীনশোভন। জগন্নাথ, তাঁর মতে, কিম্ভুত, শিবলিঙ্গ অশ্লীল। আর কালী বীভৎস।

রাধাকৃষ্ণটিই বেশ। পটলচেরা চোখে বাঁশি হাতে কৃষ্ণ কেমন দাঁড়িয়েছেন কোমর বেঁকিয়ে। আর লজ্জা-মাখানো মিষ্টিমুখে রাধিকার ঠাটটিও কেমন মোলায়েম।

কিন্তু এদিক দিয়েও মন্দিরার সুখ নেই পুরোপুরি। চাকরিতে থাকতে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র নিয়ে চৌধুরী প্রার্থিত ফল পেয়েছিলেন, তারই জন্যে সেই গুরুকেই চৌধুরী আঁকড়ে আছেন। জোর করে মন্দিরার কানেও গুঁজে দিয়েছেন সেই অনুস্বার-বিসর্গ। মন্ত্র যাই হোক, কুব্জা বা প্যারী, মন্দিরার আপত্তি নেই, তাঁর আপত্তি ঐ গুরুটিতে। গুরুই তাঁর বেপছন্দ। মাথায় জটা, গায়ে ছাই, বুকে গলায় গুচ্ছের মালা, পরনে গান্ধীর চেয়েও ছোট কানি। ফোর-ফিফ্থ্ নেকেড ফকির। ভীষণ বুনো আর গেঁয়ো, সাংঘাতিক রকম সেকেলে। কদাচিৎ কখনো যখন আসে কলকাতায়, শাঁসালো শিষ্য চৌধুরীর বাড়িতে এসে ওঠে, মন্দিরা

মনে মনে রি-রি করতে থাকেন। লোকজনকে ডেকে এনে সভায় বসিয়ে দেখাবার মত চেহারা নয় এই দুঃখই মর্মে ধ্বনি জ্বালায় সারাক্ষণ। কতক্ষণ বোঁচকা বেঁধে বিদায় হবে তারই প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গোনেন।

তার চেয়ে বেশ একখানা ছিপছিপে, ছিমছাম চেহারার গুরু হত, পরনে সোনালি রঙের পাতলা গরদ, গায়ের উপর তেমনিধারা ফুরফুরে চাদর, দরকার হলে তথৈবচ পাঞ্জাবি, ঘাড়ে-কাঁধে কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ, চাঁচাছোলা মুখ, গলায় কনকচাঁপার মালা—ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হতেন মন্দিরা। মন যেখানে প্রশস্ত না হয়ে সঙ্কুচিত হয়, মুখের উপর চোখ না পড়ে ভুঁড়ির উপর পড়ে, সেখানে মাথা ঠুকে সুখ কোথায়?

শবরীর প্রতীক্ষা রামের জন্যে, মন্দিরার প্রতীক্ষা একটি হালফ্যাশানের গুরুর জন্যে।

যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। বাড়ি উঠেছে সরখেলের।

মশলার ব্যবসাদার তাতে আর সন্দেহ নেই। ছোট-ছোট ঠোঙার মত একরাশ ঘরে যেন একটা দোতলা মুদিখানা। যতই উঁচু করুক চৌধুরী-বাড়ির ছাদ ছুঁতে পারেনি। 'শুধু পয়সা থাকলেই চলে না।' ওদিক থেকে টিপ্পনী কাটেন মন্দিরা: 'মাথা উঁচু করতে হলে বুকও দরাজ হওয়া দরকার।'

পুব-সদর বাড়ি, ট্রাম-রাস্তার দিকে মুখ-করা। যেটা চৌধুরীদের পিছন সেটাই সরখেলদের ডান হাত। মাঝখানে যে একফালি জমির ফাঁক সেটা চৌধুরী-বাড়িরই লপ্ত। সে-ফাঁকটা আছে ট্রাম-রাস্তা বরাবর, কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে পিছনের দিকে সে-ব্যবধানটা প্রায় মেরে দিয়েছে সরখেল। চৌধুরী-বাড়ির ছাদের উত্তর আর সরখেল-বাড়ির ছাদের পশ্চিম প্রায় ঘেঁসে বসেছে। কর্পোরেশনে লড়তে গিয়েছিলেন চৌধুরী কিন্তু কায়দা করতে পারেননি। .প্লটটার এমনি নাকি ছিরি যে পিছনেব ফাবাকটা ফাঁপাও করা যাবে না। এখন মামলার ফিকির খুঁজছেন।

তবু ও-বাড়ির ছাদ নিচু, এতেই চৌধুরীদের শান্তি। কিন্তু সরখেলরা সে-শান্তিও বেশি দিন স্থায়ী হতে দিল না। ছাদের উপর চিলেকোঠা বানাল। আর সে চিলেকোঠার ছাদ চৌধুরীদের ছাদের প্রায় সমান-সমান হয়ে উঠেছে। তখন চৌধুরীরা কি করে? যেটুকু ফাঁক ছিল সেটুকু লক্ষ্য করে কতগুলি লোহার শিক বাড়িয়ে দিল সরখেলদের দিকে। শিকগুলি আর কিছুই নয়, তিরস্কারের তর্জনী। ছোট হয়ে উঁচু নজরে তাকিয়ো না। বাইরে বলে বেড়াচ্ছেন এদিক দিয়ে একটা ঝুল-বারান্দা করব কিংবা

ফালতু একটা সিঁড়ি উঠবে পিছন দিয়ে। আসলে একটা মামলা ফাঁদবার তক্কে আছেন।

'ও-বাড়িতে কে এল ভাড়াটে?' মিসেসকে জিগগেস করলেন চৌধুরী।

'কে এক জজ শুনছি।'

'জজ?' আকাশ থেকে পড়লেন চৌধুরী।

'কে শুনছি ছোট আদালতের জজ।'

হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন চৌধুরী : 'তাই বলো। চুনোপুঁটি নয়, একেবারে কাতলা!'

ছোট আদালত কি? বড় ছেলের বউ মীনাক্ষী জিগগেস করলে।

যে আদালত ছুটিয়ে মারে, যেখানে কেবল ছুটোছুটি। বোঝাতে চাইলেন চৌধুরী। নইলে আদালত ছোট নয়। ইয়া পেল্লায় পাঁচতলা দালান। তবে যদি বলো লোক ছোট দাবি ছোট মন ছোট তাহলে আলাদা কথা।

হঠাৎ কুকুরের গর্জন শোনা গেল। নিশ্চয়ই কোনো অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের উপর হামলে উঠেছে। এখন তো কারো আসবার কথা নয় তাই কুকুরটা ছাড়া, শেকলছুট। যাকে তাড়া করেছে, সে পড়ি-কি-মরি করে ছুটেছে, পিছনে, কম্পাউণ্ডের লাল কাঁকরের রাস্তায় তার দ্রুতব্যাকুল জুতোর শব্দেই তা স্পষ্ট। মন্দিরা ডাকলেন, 'বেয়ারা! জয় অমন করছে কেন?'

কুকুরটাকে ধাতস্থ করল বেয়ারা। কিন্তু এ কি? বেয়ারার হাতে একটা কাগজের টুকরো। যাকে তাড়া করেছিল সে তবে দেখা করতে এসেছে!

ভবতোষ চন্দ। নাম দেখে চিনতে পারলেন না। নামের নিচে পরিচয় লেখা। জজ, স্মল কজ কোর্ট। উপায় কি। ডাকো।

বলতে হল না, অন্তর্হিত হলেন মেয়েরা, মন্দিরা আর মীনাক্ষী।

ধীর পায়ে ভীত গোল চোখে ঢুকল ভবতোষ।

পাজামা আর ড্রেসিং গাউনে শেষ অভিজাত চৌধুরী বললেন, 'বসুন।'

তবু যা হোক আজ বসতে বলেছেন চৌধুরী। সেই দিন—

'আচ্ছা, আমাদের কি আগে কখনো দেখা হয়েছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছিল।' জায়গাটার নাম করল ভবতোষ। সালটাও চিহ্নিত করল।

মনে আনতে পেরেও মনে করতে পারলেন না চৌধুরী।

সেদিন বসতেও বলেননি। স্টেশন থেকে সোজা কোর্টে এসে চার্জ নিতে হয়েছিল ভবতোষকে, এমন সময় ছিল না যাতে সাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখা করা চলে। তাই লাঞ্চ-টাইমে কার্ড পাঠিয়ে খাসকামরায় এসেছিল দেখা করতে। ঘরে ঢুকে গড় করে দাঁড়াল ভবতোষ, হাঁড়িমুখে একটু আখার ছাইয়েরও দাগ পড়ল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেই ভবতোষ বসল চেয়ারে। ইংরিজিতে বলল, 'আজ জয়েন করলাম স্যার। আপনাকে পে-রেস্পেক্ট করতে এসেছি।'

টুঁ শব্দটি করলেন না চৌধুরী। কি আশ্চর্য, কার্ড অনুমোদন করেই তো ডেকেছেন, তবে এখন কেন এই স্তব্ধতা! চাপরাশিকে দিয়ে বলালেই পারতেন এখন হবে না। আর কি বা দেখা করার উদ্দেশ্য। একটা রুটিন ভিজিট, মামুলি সেলাম। কিন্তু দেখ না এমন একখানা মুখ করে রয়েছেন যার নাম অভদ্রতা ছাড়া কিছু নয়। হীনাবস্থদের প্রতি অসৌজন্য দেখানোর মধ্যেও বোধহয় একরকম মাদকতা আছে।

একটা টেবিলের চারধারে স্তূপীভূত রেকর্ড সাজানো। ঘুরে ঘুরে পাইচারি করে করে সই করছেন আর চাপরাশি পর-পর উপরের নথি সরিয়ে নিচ্ছে ও নিচের নথিকে তুলে ধরছে। বসে বসে পায়ে বাত ধরা সম্ভব, তাই এমনি চলতে চলতে সই করার ব্যবস্থা। সই সারা হলে ভবতোষ আশা করল এবার বুঝি প্রভু মুখ খুলবেন। মুখ খুললেন বটে, কিন্তু তাঁর স্টেনোর কাছে। একটা অর্ডার ডিকটেট করতে বসলেন। দু লাইন বলেই উঠে পড়লেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে জানলায়। স্টেনো পালাল। পদাঙ্ক অনুসরণ করল ভবতোষ। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি এখন যেতে পারি?' চৌধুরী ফিরেও তাকালেন না।

কিন্তু তাকালেন একেবারে মর্মের মধ্যে। ভাবখানা, এখানে দেখা করতে আসার প্রয়োজন কি! এত যদি পে-রেস্পেক্ট করারই ইচ্ছে যথারীতি বাড়ি যেতে পারোনি? শুকনো হাতে 'পে' হয়? গাছের বলে আম বা পুকুরের বলে মাছ বা আমাদের দেশের স্পেশ্যালিটি বলে বাসন বা হাতির দাঁতের কোনো জিনিস আনতে পারোনি? কথায় বলে যেখানে আবাদ সেইখানে উৎপত্তি। চোরের আনন্দ অন্ধকারে। পেয়াদার আনন্দ বকশিশে।

জজ? জজ আর কিছুই নয়, পেয়াদার জেয়াদা।

সেই চৌধুরী আজ কথা কইলেন এবং অদ্ভুত, বাংলায়। বললেন, 'কিন্তু আমি তো এখন রিটায়ার করেছি। আমি আর আপনার জন্যে কি করতে পারি? কি ক্ষমতা আমার আছে?'

'কোনো কিছু করবার জন্যে আমি আসিনি।' বহু কষ্টের অভ্যাস, ভবতোষ ছোট হয়ে বললে।

'তবে?' বিনা প্রয়োজনে কেউ আসতে পারে কারো কাছে, বিশেষত উঁচু-নিচুর লোক, ভাবতে পারেন না চৌধুরী।

'আপনি আমার পরবর্তী দরজার প্রতিবেশী, নেক্সট্‌ডোর নেইবার, তাই প্রতিবেশী হিসেবে দেখা করতে এসেছি।'

'কলকাতায় আবার নেইবার! ও-সবে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তবু এক পাড়ার মধ্যে থাকা -'

'ও-সব কিছু না।' দৈবজ্ঞের মত বললেন চৌধুরী · 'সবাই নিজের নিয়ে মত্ত। আপনি বাঁচলে বাবার নাম। আপনি রাঁধি আপনি কাঁদি, এই জগৎসংসার--'

'তা তো বটেই।' সায় দিল ভবতোষ। সায় না দিয়ে উপায় কি! চৌধুরী এমন এক দেশ থেকে এসেছেন যার নাম সব-জানা সব-বোঝা সব-করতে-পারার দেশ। বরং একটু জুড়ে দিল : 'তোর তেল আঁচলে ধর আমার তেল ভাঁড়ে ভর। সবাই যে যার নিজের স্বার্থে মশগুল।'

'তবে দেখুন, একটা কথা- ' চৌধুরী হঠাৎ অনুভব করলেন আলাপের এক সমতলে ঘেঁসে বসছেন বুঝি, তাই নিজেকে সতর্ক করে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে সরিয়ে নিলেন : 'আপনার ছাদটা যেন নোংরা করে রাখবেন না। মধ্যবিত্ত অভ্যেসগুলো বড় কদাকার।'

'দোতলায় আরো একজন ভাড়াটে আছেন কিনা, আর ছাদটা এজমালি--' ভবতোষ আত্মদোষস্খালনের চেষ্টা করল।

'লোকটা কি করে?'

'ডাক্তারি।'

'নিজে ডাক্তার নয়, করাটা ডাক্তারি।' একটা চোখের উপরকার ভুরু তুললেন চৌধুরী।

'প্রায় তাই। সামনের কোনো এক ডিস্‌পেনসারিতে বসে। রুগি-টুগি বেশি দেখি না, যা রোজগার সার্টিফিকেটে।'

খুব পীড়িত বোধ করছেন এমনি মুখের ভাব করলেন চৌধুরী। বললেন, 'কিন্তু নিজের বাড়ি-ঘরের যে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তাও তো ঐ এক জাতেরই। ইজ অ্যাডভাইজড টু টেক এবসলিউট রেস্ট--তাই না?' হেসে উঠলেন চৌধুরী।

পরনিন্দায় আবার সমতল হচ্ছেন বুঝি। তাই আবার সামলালেন নিজেকে। বললেন, 'আমরা সবাই যদি সাবধান না হই তাহলে পাড়ার

অ্যারিস্টোক্র্যাসিটা বজায় রাখি কি করে? তা ছাড়া পশ্চিমের ঐ বত্রিশ-ভাজী বস্তিটা—উঃ, ফ্রাইটফুল—'

'কলকাতায় ভালো করে বোমাই পড়ল না—' ভবতোষ আপসোস করল।

'যা বলেছেন! বোমায় ও-সব ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

বোমা বেছে-বেছে শুধু বস্তির উপরেই পড়ুক, চৌধুরী-চন্দদের বাড়িগুলি ঠিক থাক, নিটুট থাক। তা হলেই হল। আপনার ঢাকা থাক পরের বিকিয়ে যাক।

লাল কাঁকরের রাস্তায় শোনা গেল আবার কার ভারী পায়ের জুতোর আওয়াজ। এবার কিন্তু ডাকল না কুকুর। কেন ডাকবে? আগন্তুক যে আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করে এসেছে। সময় বুঝে কুকুরকে সামলানো হয়, সময় বুঝে লেলানো। আগে থেকে যে এপয়েণ্টমেণ্ট করে আসে তাকে কুকুর উদ্ব্যস্ত করে না, যে অঘোষিত অবাঞ্ছিত তারই উপর কুকুর সমুদ্যত।

'আরে ভৌমিক যে, এস এস।' হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন চৌধুরী: 'তারপর, খবর কি?'

'খবর খুব খারাপ।' ভয়ার্ত চোখ করল ভৌমিক।

'খারাপ! কেন, কি হয়েছে?'

'আমরা স্বাধীন হতে চলেছি।' দুই হাত চিৎ করে নিঃস্ব হবার মত ভঙ্গি করল ভৌমিক।

'তা খবর গোলমেলে বটে, কিন্তু এত হতাশ হবার কি হয়েছে। বোস।'

ভৌমিক বসল। বললে, 'না, কয়েদীকে জেলখানা থেকে ছেড়ে দিলে সে কি হতাশ হয়? সেও স্বাধীন হয়।' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল ভবতোষের দিকে। বেফাঁস কথা বলা ঠিক হচ্ছে কিনা কে জানে।

চোখোচোখি হল। চিনতে দেরি হল না। চৌধুরীর বল লাইনের বাইরে চলে গিয়েছে. বটে, কিন্তু ভৌমিকের বল এখনো মাঝমাঠে। তাঁরা একই মাঠের খেলোয়াড়।

নবাগতকে নমস্কার করল ভবতোষ।

'কোথায় বাড়ি,' জিগগেস করল ভৌমিক।

'এই পাশেই।' ভবতোষ উঠে পড়ল। বুঝল ময়ূরের সভায় ছাতার পাখি শোভা পায় না।

অশেষ সান্ত্বনার মত চৌধুরী বললেন, 'আবার দেখা হবে।'

ভবতোষ তাইতেই ভরপুর। তা ছাড়া কুকুর এখন শৃঙ্খলিত, তার চিৎকার এখন রিটায়ার-করা অফিসারের মত নির্বিষ, সেটাও একটা শান্তি।

'ছোট আদালতের জজ।' ভবতোষ চলে গেলে চিনিয়ে দিলেন চৌধুরী।

'জজ নয়, রেজিস্ট্রার।' সংশোধন করল ভৌমিক।

'ও একই কথা। যা চালভাজা তাই মুড়ি।'

'কিন্তু ইংরেজের কাণ্ডটা একবার দেখুন।' ভৌমিক চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল: 'এমন জমিদারি কেউ তাচ্ছিল্য করে ছেড়ে দেয়! সাধ করে কেউ বৈরাগী হয়!'

'না হয়ে উপায় কি!' চৌধুরী সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন: 'ডাইনে-বাঁয়ে দু দিক থেকে খোঁচা—এক গান্ধী আর-এক সুভাষ—হাটের জিনিস হাটে ফেলে মাঠ নিয়েছে বাছাধন। বিবাগী না হয়ে যায় কোথায়!'

'কিন্তু বলুন, মাইনে-পেনশন পুরোপুরি প্যাব?' মুখ অন্ধকার করল ভৌমিক।

রুপোলি একটি রেখা টানলেন চৌধুরী। বললেন, 'সব রফায় হবে তো, দফারফা নাও হতে পারে। ইংরেজ আর যাই হোক ধূর্ত। তপস্বী হলেও বিড়ালতপস্বী। এতদিন যাদের কোল দিয়েছে তাদের একেবারে ঝোলছাড়া করবে না।'

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভৌমিক বললে, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

'তোমার কি মনে হয়?'

'মনে হয় আমাদের মাইনেও পাঁচশো হয়ে যাবে। নৃশংস-কষ্ট-পাওয়া ত্যাগী দেশপ্রেমীর দল ত্যাগ ও কষ্টের আদর্শ তুলে ধরবে দেশের সামনে, কুটিরে থাকো, শালু-কার্পেট বাদ দাও, ট্রেনের থার্ড ক্লাসে ট্র্যাভেল করো, নিজের কাপড় নিজে বোনো—তাহলেই গেছি—আর তাই হয়তো হবে অদৃষ্টে।'

'একমাত্র ভরসা কি জানো?' দৈবজ্ঞের মতন বললেন চৌধুরী।

'কি?'

'আজকের যাঁরা ত্যাগী-প্রেমী তাঁরা যদি একবার গদিতে বসতে আকৃষ্ট হন' গদা ধরাব অর্থই তো গদির জন্যে। যদি একবার তাঁরা ফাঁদে পা দেন, যদি শক্তির মদে চুমুক দেন ভুল করে—'

'তাহলে?'

'তাহলেই কেল্লাফতে। তাহলেই সব বজায় থাকবে।' চৌধুরী সিগারেটে ছেলে-ছোকরার মতো দীর্ঘ টান মারলেন: 'ইংরেজ চলে গেলেও ইংরেজের ভূত থাকবে। ব্যুরোক্রেসি থাকবে, ব্রাউন ব্যুরোক্রেসি। কোটপ্যান্ট থাকবে বোলবুকনি থাকবে মনমেজাজ থাকবে। সেই খেতাব

বা প্রাইজ, সেই খানাপিনা, শাল্-কার্পেট। সর্বোপরি সেই লাল ফিতের কালসাপ। তাহলে আমরাও থাকব, আমাদের মাইনে-পেনশনও থাকবে—'

অতটা স্বপ্ন দেখতে সাহস হয় না ভৌমিকের। নিচের ঠোঁট পুরু করে সে বললে, 'কিন্তু আমার মনে হয় ছবিটা আরেক পিঠের। এরা সব খাটাপেটা পোড়খাওয়া কর্মী, রোদেজলে মানুষ, জেলফেরত নিষ্কাম সন্ন্যাসী, এরা গান্ধীর চেলা, গীতার জলন্ত ভাষ্য, এরা টোপ গিলবে না কিছুতেই। এরা কিছুতেই নেবেনা মসনদ—'

'তা হলেই অন্ধকার।' অন্ধকার আনতে না আনতেই আবার আলোর ঝলক দিলেন চৌধুরী: 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কিছুতেই এরা লোভ সামলাতে পারবে না। সে পেরেছিল মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব—' হঠাৎ থামলেন চৌধুরী· 'তুমি তো মহাভারত পড়েছ -'

'কোন ছেলেবেলায় পড়েছি মনে হচ্ছে।'

'পঞ্চ পাণ্ডবের নাম জানো তো?'

'জানি বোধহয়।' মাথা চুলকোতে লাগল ভৌমিক· 'কি করেছিল তারা?'

'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয়ের পরে জয়ফল ত্যাগ করে চলে গেল মহাপ্রস্থানে—' বলতে যেন ফুলে উঠলেন চৌধুরী· 'কিন্তু সাধারণ মানুষ তো পাণ্ডব নয়, তারা শুধু তাণ্ডব। তাণ্ডবের শেষে চাইই এক গ্লাস সিদ্ধির শরবত। জয়ের পর দুধমধু পেলে সাধারণ মানুষ তাই খেতে বসে। ভাবে আমি তো খাই-ই, ভাগ্নেদেরও ডেকে এনে খাওয়াই। বুঝলে হে ভৌমিক, একেই বলে নেশা, সিদ্ধির শরবত।'

'ও! তা হলে তো বেঁচে যাই। সে সিদ্ধির শরবত অফিসাররা ছাড়া, আমরা ছাড়া ঘুটবে কে? কিন্তু--' ভৌমিক মুখ আবার মেঘ-মেঘ করল· 'আমার মনে হয় এরা দাঁতে ভাঙবার পক্ষে শক্ত বাদাম এরা অফিস নেবে না, তুচ্ছ ভূষিমালের কারবারী এরা নয়--'

'তাই যদি হয় এরা যদি দরবারের বাইরে থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি দিয়ে দেশ চালাতে দেয় গান্ধীর আদর্শের অনুরূপে, নিজেরা ধুলোট না করে, তাহলে দেশের চেহারা অন্নেবস্ত্রে স্বাস্থ্যেশ্রীতে উথলে উঠবে, তাহলে তোমার আমার পাঁচশো টাকায় ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু ভৌমিক, সে-আশা বৃথা—'

'কেন?'

'যে বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিল

সেও আশা করবে আমি উজির নাজির হবো। নইলে জেল খাটলুম কেন? ফয়দা কি?'

'জেলখাটাটাই ছাড়পত্র।'

'হ্যাঁ, এই হবে ভ্যালুজ। তখন কাপড়ের দোকানে পিকেটার মদের দোকানের পিকেটারকে, একই দলের লোককে, সুযোগ-সুবিধে করে দেবে। ঐ চলবে তখন অলাতচক্র। তাই মাভৈঃ, তুমি যা বলেছ, তাদের চাকা ঘোরাবার জন্যে রপ্ত-পোক্ত লোক চাই, চাই ইস্পাতের লোক। তাই ইস্পাতের লোক আমরা, আমরা ঠিক থেকে যাব। সব ঠিক থাকবে। মায় লাটবাড়ির বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত।'

'কিন্তু যাই বলুন, আমি এসব বিশ্বাস করি না।' ভৌমিক বললে, 'এরা সব নাড়াবুনে কীর্তুনে হয়নি। এরা কাস্তে ছেড়ে নেবে না কিছুতেই করতাল।'

'তাই যদি হয়, তবে আমরা সত্যি স্বাধীন হব।' চৌধুরীর গলা থেকে প্রায় কাকুতির স্বর বেরুল: 'আমাদের দাও একবার সত্যি স্বাধীন হতে।'

চৌধুরীদের বাড়ি থেকে ফিরে ভবতোষ নিজের বাড়িতে ঢুকল নিজের বাইরের ঘরে। উত্তর দিকের ছোট ফ্ল্যাটটা সদয়শিব ডাক্তারের। নিচে দক্ষিণের ফ্ল্যাটে বাড়িওলা নিজে ডান দিকের ছোট ফ্ল্যাটটা দু ভাগ করা সামনের দিকে মানে রাস্তার দিকের ঘরে থাকে দুজন ব্যবসায়ী পাঞ্জাবি হিন্দু, পিছনের দিকে দেবানন্দ ঘোষাল পেটের যন্ত্রণায় ভোগে আর চিৎকার করে।

উপরে নিচে বাড়িতে ঢোকবার সরকারি এজমালি প্যাসেজ খানিকটা যৌথ থেকেই বাঁ দিকে উপরে ওঠবার সিঁড়ি।

'দাদা, আমি এসেছি, আমি এসেছি' সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে কে উঠতে লাগল উপরে।

ভরাট গলার জমাট কণ্ঠস্বর। ভবতোষের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাইরের ঘরে বসে কাজ করছিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আরে কে? ফরিদ?'

'আমি এসেছি। দাদা যেখানে ভাইও সেখানে।' পর্দার বাইরে থেকে মে-আই-কাম-ইন বলে ঢোকা নয়, পর্দা আছে কি নেই কে খেয়াল করে, সেই দুর্বার অজস্রতায় ঢোকা। মুক্ত মাঠের হাওয়া নিয়ে।

হাত বাড়িয়ে ভবতোষ ফরিদকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল: 'ও টুকটুক, দেখে যা কে এসেছে।'

ক্লাস টেন-এ পড়ে টুকটুকি, নিঃসঙ্কোচে ছুটে এল। ওমা, কাকাবাবু যে। নিচু হয়ে প্রণাম করল ফরিদকে। চেঁচিয়ে উঠল · 'মা দেখবে এস কাকাবাবু এসেছে।'

আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে রান্নাঘর থেকে নীলিমা এল একমুখ আনন্দ নিয়ে। ফরিদ বললে, 'নমস্কার বউদি—'

'সালেহা কেমন আছে?' মুখভরা মিষ্টি নিয়ে জিগগেস করল নীলিমা।

পুরোনো কথা মনে পড়ল বুঝি?

ঘাটে স্টিমার লেগেছে। সালেহাকে নিয়ে ফরিদ নামছে আর নীলিমাকে নিয়ে উঠছে ভবতোষ। ঘাট থেকে স্টিমার পর্যন্ত যে পাতাসিঁড়ির পাটাতন তাতে দু দলের দেখা। সালেহার গায়ে বোরখা, নীলিমা তো মুক্ত চন্দ্রের পসরা।

নীলিমাকে দেখেই হাত জোড় করে ফরিদ বললে, 'নমস্কার বউদি।'

'একতরফা হলে চলবে না,' ভবতোষ এগিয়ে এল: 'দাঁড়াও, আমিও বউমাকে ছালাম করব। ওঁর মুখ খোলা পেয়েছ আর এঁর মুখ ঢাকা থাকবে এ হতে পারে না।'

সবাই হেসে উঠল আর তার মধ্যে মুখের ঢাকনিটা মাথার উপর তুলে দিল সালেহা।

'আদাব বউমা।' বললে ভবতোষ।

নমস্কার বউদি—ফরিদ এ কথা বলতেই মনে পড়ে গেল সেদিনেব সেই স্টিমারঘাটের ঘটনা।

'কি রান্না করেছেন?' কৌতুককণ্ঠে জিগগেস করল ফবিদ। 'আচ্ছা, এবেলা থাক। নোটিশ দিয়ে যাই, রাত্রে এসে নাস্তা করব।'

'কেন, থাকবে কেন?' নীলিমা চলে গেল রান্নাঘরে।

ভবতোষ জিগগেস করলে, 'এলে কবে?'

'এই তো এইমাত্র।' ধপাস কবে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল ফবিদ: 'বাড়িতে মালপত্র নামিয়ে রেখে এই আসছি এখানে ছুটতে-ছুটতে। কি গো টুকটুক, তোমার বন্ধুর খবর জানতে চাইছ না?'

'সে কি! আসেনি হাসিনা?' আর্তনাদের মত করে বললে টুকটুকি।

পর্দার আড়াল থেকে হাসিমুখ বেরুল একখানা। 'সে কি, আসেনি হাসিনা? হাসিনার খবর এত পরে। হাসিনা তো আর এখন মেওয়া-মিছরি নয়, হাসিনা এখন ধুলোবালি।'

ঘরে ঢুকল হাসিনা। পরনে রঙিন শাড়ি, মাথায় বিনুনিখসা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। চোখে ঘুমে-মোছা বাসি সুর্মার রেখা। পাতলা ছিপছিপে মেয়ে, রাখালিয়া বাঁশির মিঠে সুরের টান।

'ওমা, তুই এসেছিস?' দু হাত চেপে ধরল টুকটুকি: 'তুই না এলে শহর-মুলুক অন্ধকার। তুই নেই বলে জানিস আমার আকাশে একটা তারা কম ওঠে।'

'ইস্? আমি আসমানের তারা? আমি দূরের জিনিস?' ডাগল-দীঘল চোখ মেলল হাসিনা: 'ককখনো না। আমি মাটির প্রদীপ।'

'তুমি আমাদের হাসনুহানা।' বললে ভবতোষ।

হাসিনার গলার আওয়াজ পেয়ে রান্নাঘর থেকে আবার ছুটে এল নীলিমা: 'আমাদের হাসিহাঁ এসেছিস?'

'হাসিহাঁ মানে?' ভবতোষ অবাক মানল।

'ও তো হাসির না নয়, ও হাসির হাঁ।' বললে নীলিমা: 'জীবনে ও হাসিকেই হাসিল করতে এসেছে।'

ভবতোষ আর নীলিমার পা ছুঁয়ে সেলাম করল হাসিনা।

শুধু হঠাৎ ভেসে আসা এক ঝলক বা এক পশলা হাসি নয়, হাসির একটি নিরন্তু নির্ঝর, একসাজি ফুল, এক হ্রদ জ্যোৎস্না। স্রোতের জল যেমন আলোতে-আঁধারে সব সময়েই চিকচিক করে তেমনি প্রাণের পবিত্রতায় সব সময়েই হাসছে হাসিনা। বিজলীকেও স্থির ভাবা যায়, কিন্তু হাসিনা সব সময়েই চঞ্চল সব সময়েই তার চমকভাঙা সদ্যজাগর ভাব। সব সময়েই তার চোখে বিস্ময়ের রামধনু। তার হাত-পা যদি নাও চলে, নচবে তার চোখ, নড়বে তার ঠোঁট বদলাবে তার মুখে ছায়া আর সব সময়েই বয়ে যাবে হাসির হাওয়া, হাসির বৃষ্টির জল। মনে হয় হাসিনা একলা হাসে না, হাসে তার শাড়ি-জামা বিনুনি-ফিতে, তার আগল-পাগল কালো চুলের ঢেউ।

'তোর স্কুলেই ভর্তি হব, আর জানিস তো তোরই ক্লাশে।' বললে হাসিনা।

'আমাকে ছেড়ে তুই যাবি কই? আর তোকে ছাড়াই বা আমি থাকি কি করে?' বললে টুকটুকি, 'দুই মলাট না হলে কি বই হয়? দুই পার না হলে কি নদী? দুই পাখা না হলে কি পাখি?'

'ওরা যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।' বললে ভবতোষ।

'মোটেও না।' হাসিনা সারা শরীরে হাসির প্রতিবাদ তুলল। বললে, 'আমরা দুই বৃন্তে এক ফুল। আমরা দুই দেহ কিন্তু এক রক্ত। দুই

মানুষ কিন্তু এক মন। দুই বাসিন্দে, এক ঘর, এক দেশ। দুই ধর্ম কিন্তু এক ভক্তি, এক ভালোবাসা।'

এক মফস্বলী মহকুমা শহরে পাশাপাশি বাড়িতে থাকত এরা, মাঝখানে শুধু একটা সরকারি পুকুর। এ-ঘাটে এ সরে ও-ঘাটে ও। এক জল। এ-ঘাটে ঢেউ দিলে কাঁপতে-কাঁপতে ও-ঘাটে গিয়ে লাগে, ও-ঘাট থেকে ঢেউ দিলে এ-ঘাটে। এ-বাড়িতে যখন চণ্ডীপাঠ হয় তখন ও-বাড়ি শোনে, ও-বাড়িতে যখন মৌলুদ শরিফ পাঠ হয় তখন এ-বাড়ি। এ-বাড়িতে ও নেমন্তন্ন খায়, ও-বাড়িতে এ দাওয়াত। স্তবস্তোত্র কি সুন্দর, কি মিষ্টি আবার দরুদের আওয়াজ! ও দেবীর থানে গিয়ে বটের ঝুরির সঙ্গে সুতো বাঁধে। এ দরগায় গিয়ে মোমবাতি জ্বালায়। সন্ধ্যারতিতে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠলে ও কান পাতে আর এ তন্ময় হয়ে শোনে যখন আজান পড়ে মসজিদে।

এ-বাড়িতেও মাছের কাঁটা ও-বাড়িতেও মাছের কাঁটা।

একটা বেরাল দু বাড়িতে আনাগোনা করে। টুকটুকি ভাবে এ আমাদের। হাসিনা ভাবে এ আমাদের। হাসিনা নাম রেখেছে ইসাবেল, টুকটুকি নাম রেখেছে সিদ্ধেশ্বরী। আমাদের বেরাল সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের বাড়ি এসেছে? টুকটুকি একদিন হাসিনাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমাদের বেরাল ইসাবেল তোমাদের বাড়ি এসেছে? হাসিনা টুকটুকিদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ওমা, এই যে আমার ইসাবেল। কে বললে? কি ভীষণ, এই যে আমার সিদ্ধেশ্বরী। দুজনেই ধরতে গেল বেরাল। বেরাল চম্পট দিল। দেখা গেল দুজনের হাত দুজনের হাতের মধ্যে বাঁধা।

বৃষ্টি নেমেছে কতদিন। ঝপ ঝপ ঝম ঝম শেষ দিকে ঝিমঝিমুনি। এ-জানলায় এ, ও-জানলায় ও, পুকুরের উপর বৃষ্টি পড়া দেখছে। জলের উপর জল পড়ার খেলা জল পড়ার শব্দ। পুকুরের জল কেমন বাড়ছে, সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে এসে কোন বাড়ির দিকে আগে হাত বাড়াল তার মাপজোক। জল কাকে বেশি ভালোবাসে তাই নিয়ে গবেষণা। কিন্তু বৃষ্টিতে পুকুরের জল বেড়েছে বলে তাদের স্ফূর্তি করার মানে হয় না, যেহেতু নদীর জলও বেড়েছে। আর নদীর জল বাড়তেই ফাটল ধরেছে বাঁধে, রক্ত দিয়ে বোনা চাষাদের সোনার ফসল ভেসে যায় বুঝি। আয়, দুজনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও খোদার কাছে ফরিয়াদ জানাই। যে যেখান থেকে যাই বলি না কেন গাঁও-গেরামের লোক বাঁচুক, মাঠের ধান রক্ষা পাক, সকলের হাল-হাতিয়ার ঠিক থাক।

কথা আলাদা হোক, সুর এক, কান্না এক, মানে এক।

'দাদা, এক গ্লাস পানি দিন—' কপালের ঘাম মুছে ফরিদ বললে।

ভবতোষ বললে, 'পানি নেই, জল দিতে পারি।'

'জল খাই না, পানি চাই।' জোর গলায় বললে ফরিদ।

'পানি নেই তো দেব কোত্থেকে? জল চাও তো দিতে পারি অঢেল।' ভবতোষও নাছোড়।

'একটা লোকের পিয়াস মেটাতে দিলেন না দাদা?' ফরিদ হাসি-হাসি করুণ মুখ করল।

করুণ-করুণ হাসিমুখ করে ভবতোষ বললে, 'পানীয় থাকতে যে তেষ্টা না মেটায় তাকে লোকে কি বলে!'

ফরিদও কিছুতেই জল বলবে না, ভবতোষও কিছুতেই পানি দেবে না।

তবে এক কাজ করা যাক, দুজনে সন্ধি করলে।

'ওয়াটার দিতে পারি।' বললে ভবতোষ।

'তাই দিন, ওয়াটার দিন।'

'ভায়া এই হল ইংরেজ।' ভবতোষ বললে।

গ্লাসে করে জল নিয়ে এল টুকটুকি। জল খেতে খেতে ফরিদ বললে, 'যা বলেছেন এই হল ইংরেজ। আপনাকে আমাকে দিয়ে লাঠালাঠি করিয়ে শেষকালে মাথায় ওয়াটার ঢালবে।'

'মাথা ঠান্ডা তো হবেই না শুধু কাদা হবে।' ভবতোষ জের টানল আগের কথার।

'তাই তো ওরা চায়। ওদের কাদা আর আমাদের কাঁদা। কাদায় পড়ে কাঁদা।'

'তুমি জয়েন করছ কবে?' অন্য কথায় আসতে চাইল ভবতোষ।

'কাল।'

'কিন্তু, তোর কিন্তু আজ বিকেলেই জয়েন করা চাই।' টুকটুকির দিকে একটি হাসন্ত তর্জনী তুলে ধরল হাসিনা।

নীলিমা চা আর খাবার নিয়ে এল।

এক থালায় সবাই একত্র থাবা মারল। এক রসনায় এক রস, এক স্বাদ।

'যাস কিন্তু বিকেলে—' আঁচলভরা হাসির জুঁই ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল হাসিনা। চলে গেল ফরিদ।

বিকেলে তো যেতে বলে গেল হাসিনা, কিন্তু যাওয়া কি সহজ? সেজেগুজে বেরুচ্ছে, নিচে দোরগোড়ায় বসে আছে সেই ছোঁড়াটা।

সেই ছোঁড়াটা আর কেউ নয়, বাড়িওলা সরখেলের ছোট ছেলে, আভাস। দুবারের বার টায়েটুয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে পর-পর দু বছর আই-এ ফেল করে এখন ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাপের ইচ্ছে ছেলেকে গ্র্যাজুয়েট করে, ছেলে বলে, আমার গ্র্যাজুয়েটি কিছু হবে না, আমাকে দোকানে ঢোকাও, ব্যবসা শিখি। সরখেল বলে, বড়োটা ঢুকেছে ঢুকুক, তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হ, আমার মুখটা শুধু রুপোর আলোয় নয় সোনার আলোয় উজ্জ্বল কর। বংশ কি শুধু ব্যবসা নিয়েই থাকবে, কেউ তোরা একটু বিদ্যা ও গুণের স্বাদ নিতে দিবিনে? শুধু টাকা, একটু মান পাব না সভায়?

কি বুদ্ধি, সংসারে ধনীই একমাত্র মানী। টাকা থাকলে মেড়াকান্ত দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।

এই নিয়ে বাপের সঙ্গে তুমুল হয়ে গিয়েছে ছেলের। বাপ বলে, আবার পড়, পড়তে হবে আবার; ছেলে বলে, পড়ায় মন যায় না, মাথায় রাখতে পারিনে কিছুই। দোকানে না ঢোকাও আমাকে আলাদা ব্যবসা করবার জন্যে পয়সা দাও। তোমার পয়সা আছে কি করতে? পচতে?

'লেখাপড়া না করবি তো বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।' আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিল সরখেল।

'তোমার বাড়ি?' কোমরে হাত রেখে বললে আভাস।

'আমার নয় তো তোর?'

'আমারো নয় তোমারো নয়। যারা তিল-তিল রক্তকে তিল-তিল জল করে এই বাড়ি গড়েছে গেঁথেছে সেই সব মুটে-মজুর মিস্ত্রি যোগাড়েদের, মেহনতী দুনিয়ার '

বাপেরা মুখেই বলে বটে, বেরিয়ে যা, কিন্তু ফিরে এসেই প্রথমে খোঁজ নেয় ছেলে ফিরেছে কিনা, অন্তত এসেছিল কিনা খেতে।

তাই আর-আরদের মত আভাসও আধখানা বেরিয়েছে। রাস্তার মোড়ে অদূরে যে ডাইং-ক্লিনিংএর দোকান আছে তাতে ছোট্ট একটু রক, সেইটিই পাড়ার ছেলেদের একান্ন পীঠের এক পীঠ। সবাই যে বসতে পারে ঠাসাঠাসি করে তা নয়, বেশির ভাগই দাঁড়িয়ে থাকে। আড্ডার গুণে দাঁড়ানোই বসা। শেকড় যদি ঠিক থাকে ডালপালা মেলুক না বাইরের দিকে। ডালপালা মেলেই তো শেকড়ের আনন্দ।

শেকড় হচ্ছে আভাস। বর্তমানে সে চিৎ-হাত হলেও ভবিষ্যতে সে বাড়ির মালিক এই গর্বেই সে অধিপতি। আর তাকে ঘিরে আছে তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা, বিভূতি আর মন্মথ, এলেম জেলেম জুলফক্কর, এমন কি

অ্যাংলোদের গোমেজ। জবুরের সঙ্গে পিলে জুটেছে, ভাঙা ঢোলের সঙ্গে তালকানা বাজিয়ে।

এদের কাজ কি শুধু আড্ডা দেওয়া? শুধু রকের আরক খাওয়া? মোটেই না। এদের অনেক মহৎ কাজ। এদের কাজ পাড়া-বেপাড়ার অত্যাচার দমন করা। অনেক অলিখিত অত্যাচার।

কি তোমার ঝুলিতে? ময়লা কাগজ কুড়োও? মিথ্যে কথা। তোমার ঝুলি অনাবশ্যক ফুলে আছে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে বাচ্চা ছেলে কি মেয়ে আছে, তুমি নিশ্চয় ছেলেধরা। ওরে, পালাচ্ছে লোকটা। ধর ধর মার শালাকে। ওরে চল চল ঐ মোড়ে কে গাড়িচাপা পড়েছে —গোমড়কে মুচির পার্বণ—চল, ড্রাইভারটাকে মেরে আসি দু ঘা। বেশি তেড়িবেড়ি করে আগুন লাগিয়ে দেব গাড়িতে। স্ট্রাইকের দিন কে যাচ্ছে রে রিকশা চেপে? ধর ধর, আটকা, ঠ্যাং ভেঙে দে। কি হয়েছে মশাই? পকেট মেরেছে? থানায় নিয়ে যাচ্ছেন? শেষকালে তো নানা ভুজুং করে ছাড়া পেয়ে যাবে, দু ঘা এখুনি বসিয়ে দিন না মশাই। সাহস নেই? ওরে, হাত লাগা। ওখানে আবার কিসের জটলা রে? বিনা টিকিটের রেলসোয়ারী ধরেছে। ট্রেনে জায়গা দিতে পারে না, তার আবার টিকিট! কারা ওরা? কলেজের ছাত্র। আমাদের সব এক্স-ফ্রেন্ড। চল, ছিনতাই করে নিয়ে আসি। অত বড় প্যাণ্ডেল করেছে, কিসের জলসা মশাই ওখানে? গান হচ্ছে? গান হচ্ছে তো বাইরে মাইক দেয়নি কেন? উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিনা, সকলের তো বোঝবার নয়। ওরে, কি বলছে শোন, আমরা নাকি বুঝব না উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত! ঢিল ছোঁড়, ঢিল ছোঁড় এন্তার, ধসিয়ে দে খসিয়ে দে প্যাণ্ডেল। অত ভিড় কিসের? ইস্কুলের ফাংশান হচ্ছে। আমরা ঢুকতে পাই না? কার্ড লাগে ঢুকতে। সিট তো খালি আছে, আমাদের কটা কার্ড দিলেই তো ঢুকে যায়। কোন আক্কেলে? ওরে, আক্কেল দেখাতে এসেছে। ক্র্যাশ কর, গেট ক্র্যাশ কর ইলেকট্রিকের তার কেটে দে।

এমনি অনেক রকম অবিচার অত্যাচার আছে শহর-রাস্তায়। তারা ছাড়া কে আছে এ-সব প্রতিকারের কথা ভাবে, পথ দেখায়?

কিন্তু সব চেয়ে বড় অত্যাচার টুকটুকি। টুকটুকির উঠতি বয়স, ভরা ঘটের মত ছলছলে যৌবন।

কি অহঙ্কার দেখেছ মেয়েটার। ভুলেও একবার চোখের দিকে তাকায় না। কথা বলা আকাশের কথা, গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পর্যন্ত বের করে না। সামনে গরু-ঘোড়া পড়লেও তো লোকে 'হেট' বলে, তাও

পর্যন্ত না। গরবে গা দুলিয়ে যাচ্ছে। এমন ভাব, দুনিয়ায় এ নতুন বয়স যেন ওর একলার। আর কারো হয়নি বা হবে না। ওই শুধু একমাত্র ঈদের চাঁদ, রূপনগরের রাজধানী। চাঁছা বেতের মতো দীর্ঘ আর কৃশ, যেন সপাং করে গায়ে পড়বার জন্যে মুখিয়ে আছে। আভাসের বাপের উপর রাগ একটাও পয়সা দেয় না বলে। টুকটুকির উপর রাগ একটাও নয় চাউনি দেয় না বলে। শুকে আর প্যাঁচায় যেমন সম্পর্ক, যেমন সম্পর্ক আদায় আর কাঁচকলায় তেমনি আভাসে টুকটুকিতে।

সবুন সরে দাঁড়ান।' উপব থেকে এক ধাপ বাকি থাকতে বললে টুকটুকি।

কথা বলেছে। মনে মনে ফুর্তি হলেও চিরদিন যেমন বলে এসেছে তেমনি ভাবেই বললে এটা কমন প্যাসেজ। নিচেব কমন প্যাসেজের ধারেই আমাদেব বাড়ি। এখানে দাঁড়াবাব আমবা ষোল আনা অধিকাব।'

অধিকাব নেই কে বলেছে?' টুকটুকি ঝঙ্কাব দিল কিন্তু ভদ্রমহিলা দেখলে পথ থেকে সবে দাঁড়ানোই ভদ্রতা। সবুন।

সমস্ত ন্যাযেব জোব টুকটুকিব দিকে তাই আভাস নডবে না মনে কবেও শেষ পর্যন্ত সবে দাঁডাল বাস্তায।

ছোট ভাইকে নিযে সে যাচ্ছে হাসিনাদেব বাডি। বাডি দূবে নয হাঁটার মধ্যে। কিসেব ভয যে বিকশা নেব? নাক উঁচু কবে সোজা চলে যাব সামনে চেযে।

সঙ্গে সঙ্গেই পিছু পিছু চলল আভাস হাতছানি দিযে আবো ডেকে নিল দুটোকে। 'ওবে শুনেছিস? ভদ্রমহিলা– ভদ্রমহিলা চলেছেন।'

তাড়াতাডি কয়েক পা এগিযে এল আভাস। অমনি ছড়া কাটল

'ভ দ্র ম হি লা
এ কি কথা কহিলা'

টুকটুকিব সর্বশবীব পুডে যেতে লাগল। ছোট ভাই সাধনকে বললে। 'ভূতগুলো আসছে এখনো পিছনে?'

আসছে দিদি।'

আবাব ছড়া কাটল

ভ দ্র ম হি লা —
উঁচু জুতো স-হিলা
কত ঘা-ই সহিলা।'

'আসুক।' ভাইকে কাছে টানল টুকটুকি 'তাকাসনে পিছনে চলে আয়।'

ইস্কুল থেকে আসতে-যেতে সব সময়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আভাস। ইস্কুল দূরের পথ নয়, এক মুঠো টাকা দিয়ে বাসে যাবার কোনো মানে হয় না। পথের কতকগুলো কুকুর খেঁকাবে তার জন্যে সে নিজে জরিমানা দেবে? কখনো না। উৎপাতকে উৎখাত করব।

সেদিন আবার ইস্কুলের পথে আভাস। খানিকটা পথ ছুটে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে। যেই পাশ দিয়ে যাচ্ছে টুকটুকি অমনি ছড়া কেটেছে আভাস:

'টুকটুকি লো টুকটুকি
হবি বুকের ধুকধুকি'

রুখে দাঁড়িয়ে টুকটুকি বললে, 'চড় মেরে গাল উড়িয়ে দেব।'

ডাকাত গ্রেপ্তার হলে দারোগার যেমন আহ্লাদ তেমনি বিহ্বল গলায় আভাস বললে, 'মারবে চড় মারো না, গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি।' সত্যি-সত্যি গাল কাত করল: 'চড় তো হাত দিয়ে মারবে আর তা ভাগ্যবান এই গালের উপর। লোকে বলবে চড় আমি বলব আঁচড়। কই, মারো না।'

'জুতো মারব।' প্রায় খাঁড়া তুলল টুকটুকি।

'তাই মারো। তোমার সেই জুতো সোনালি লতার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব।'

বাবাকে বলেছে কতবার। ভবতোষ বলে, 'চালাক হও, চালাকি করে চলাফেরা করো, যাতে দেখা না হয়, যাতে সুযোগই না পায়। একা একা যাও কেন?'

'রাজ্যে গভর্নমেণ্ট নেই? ও কি বাঘ যে ওর ভয়ে একা একা চলা যাবে না? তুমি পুলিশে খবর দাও।'

'বাড়িওলার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে বিপাকে পড়ব।' ভবতোষ বললে, 'ও পক্ষের সঙ্গে লড়াই না করে নিজে সতর্ক হওয়াই ভালো। সঙ্গে চাকরটাকে নিও কিংবা আমি আমার আর্দালিকে বলে দেব।'

আমি থুকি? আমাকে চাকরের হাত ধরে ট্রাম রাস্তা পার হতে হবে, ইস্কুলের গেট পর্যন্ত যেতে হবে নির্ভয়ে? আর সব সময়েই যেন হাতের কাছে পাওয়া যায় চাকরকে। সেই ধরো না সেদিন দিদির বাড়ি যাচ্ছি বাসএ, সঙ্গে লোক ছিল, ঠিক তাল বুঝে উঠেছে আভাস। পাশের সঙ্গীটাকে বলছে, 'আমি কি করব? বাংলা ভাষায় টুকটুকির সঙ্গে ধুকধুকি ছাড়া আর কিছু মিল হয়? আর এক হতে পারে বুজরুকি। টুকটুকি লো টুকটুকি করবি কত বুজরুকি? সেটাও একই রকম বদখদ। বাস থামিয়ে সঙ্গের অভিভাবক ভগ্নীপতি, ট্যাক্সি নিলেন। কিন্তু ফেরবার

পথে বাসএ, শ্যামবাজার পাঁচ মাথা থেকে, আবার সেই আভাস। এবার বলছে, হসন্তটা খুব স্মার্ট। টুকটুকি নয় টুকটুক। টুকটুক টুকটুক, বুক করে ধুকপুক। সাপে কাটা হয়ে আছি করে দাও ঝাড়ফুঁক। কই, এবার ট্যাক্সি নিতে পারলেন জামাইবাবু? মুখ বুজে সহ্য করে গেলেন। আমি শুনেও শুনছি না এমান ভাব করে রইলাম। আরো মেলে— উৎসাহিত হয়ে পাশের সঙ্গীকে বলছে আবার আভাস: টুকটুক টুকটুক, আমি এক অজবুক তবুও বাছতে মোরে কোরো না কো ভুলচুক।

ভবতোষের আর্দালি উদয়প্রতাপ যখন সঙ্গে থাকে তখনো বাছাধনরা ঢিল দেয় না। একটু দূরে-দূরে থাকে, এই যা। কিন্তু যখনই একা বা ছোটখাটো চলনদারের সঙ্গে বা মেয়েদের সঙ্গে, তখন আবার তারা শামুক থেকে সাপ হয়ে ওঠে। যেমন বরফের উপর 'শি' চলে তেমনি ফুটপাতের উপর স্যাণ্ডেল চালিয়েই এগিয়ে আসে তারা।

এত তো মেয়ে আছে, যাওয়া-আসা করে ইস্কুলে-কলেজে, সবাইকে ফেলে তুই শুধু আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? নতুন মেঘে শিলাবৃষ্টি তো একলা আমিই নই, এই তো আমার সঙ্গে জয়া আছে, তার দিকে নজর দিতে পারিস না? ওও তো আমারই সঙ্গে পড়ে এক ক্লাসে, আমারই মত দোতলার বাসিন্দে, তোর বাবার ভাড়াটে। ওর বাবা সদয়শিব ডাক্তার, চিনিস তো তাকে, স্টেথিসকোপেব মালা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, লাগ না তার পিছনে। আমার বাবাব মত সে গোবেচারা নয় আমার বাবার মত সে শুধু কলম সাব করে বসোনি তার অনেক ছোরা-ছুরি আছে, অনেক ছুঁচ-কাঁচি, তার গর্তে গিয়ে নাক ঢোকা না। দ্যাখ না তোর জুলুম সে কি করে বরদাস্ত করে। তুই 'ফলো' করছিস তোকেও সে 'ফলো' করাবে, করাতে করাতে একেবারে নিয়ে আসবে ফাটকেব ফটক পর্যন্ত। তারপর ঠেলে দেবে জঠরে।

সেদিন সকালের দিকে জয়ার সঙ্গে যাচ্ছে ইস্কুলে পিছনে সেই অবধারিত আভাস।

'দ্যাখ তো, ছোঁড়াটা আসছে কি না পিছনে—' টুকটুকি থামল এক পা।

জয়া তাকাল পিছন ফিরে। অনেক দূরে দূরে আসছে আভাস। ক্রমশই পদক্ষেপ বড় করছে। তা আসুক না। ইচ্ছে হলে ছুটুক না ঊর্ধ্বশ্বাসে। রাস্তা কি খালি টুকটুকির?

'তা আসছে আসুক না।' জয়া খিটখিটে গলায় বললে, 'তোর কি হয় এলে?'

'দ্যাখ দিকি কি বিচ্ছিরি, একটুও ভালো লাগে না—' প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে টুকটুকি, 'যেখানে যাব সেখানে ও।'

এত গরব কেন? যেখানে যাবে সেখানে ও! মনে মনে পাখা ঝাপটাল জয়া। এখন কি টুকটুকি একা-একা যাচ্ছে? নতুন আখের মত মিষ্টি কি শুধু একলা টুকটুকিই?

'নিজের সম্বন্ধে তোর এত দেমাক কেন বলতে পারিস?' জয়া এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল: 'ও তোকেই ফলো করছে এ তুই ভাবিস কেন? রাস্তার কি তুই একলাই শুধু মেয়ে? আর কি কেউ নেই যাকে ফলো করা যায়?'

হিংসের কাঁটালতা জয়া। দু চক্ষে দেখতে পারে না টুকটুকিকে। সব সময়েই অহঙ্কারে ডিঙ্গি মেরে চলেছে। যুধিষ্ঠিরের কীর্তি যেমন সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন ওর তেমনি কীর্তি ও স্বশরীরে যৌবন পেয়েছে। ভাবখানা এই, সবাই যেন তার দিকে ঘাড় উঁচু করে গো-চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে, ও যেন বোমা ফেলতে আসা জাপানী প্লেন। জয়া না হয় সম্প্রতি ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছে, কিন্তু তাই বলে সে কাঠকুড়ুনি নয়, অমন চলন-হেলন সেও দেখাতে পারে। শুকনো কাঠে সেও ফুটতে পারে কাঠগোলাপ। ভেল্কির থলি শুধু টুকটুকিরই হাতে নেই।

কি আসে-যায় তোর? থোড়াই কেয়ার করি এমনি ভাব দেখিয়ে চলে গেলেই চলে। কে কি বলে না-বলে তাকায় কি না-তাকায়, তোর গায়ে ফোস্কা পড়ে? আর, জিগগেস করি, তোরই বা একা-একা বেরুনোর ঠেকা কি! অফিস-বাজার করিস না, কতই আর তোর বেরুবার কথা! সঙ্গে সব সময়ে একটা আস্ত-মস্ত লোক নিলেই হয়! তোর ইচ্ছে ও যেমন জগন্নাথ হয়েছে তুই তেমনি সুভদ্রা হ। মানে ও তোকে বিরক্ত করুক আর তুই জ্বলে-পুড়ে ঝলসা হতে থাক।

'দ্যাখ না আসছে কিনা—'

'কে বলে তোর জন্যে আসছে?' দাঁড়িয়ে পড়ল জয়া: 'আসতে দে। আসছে আমার জন্যে। আমার সঙ্গে ওর কথা।' বেণীর একটা পিঠের উপর রেখে আর-একটা বুকের উপর টানল।

'ভালো, ভালো, তোরা কথা ক, আমি পালাই।' এগিয়ে গেল টুকটুকি।

কিন্তু কই, দাঁড়াল না কেন জয়া? আর আভাসই বা কেন তাকে নিয়ে জনান্তিক হল না?

কি আপ্রাণ পরিশ্রম করছে ছেলেটা! কত মাইল হাঁটছে, কত যুগ বসে আছে, কত ক্ষুধাতৃষ্ণা বিসর্জন দিয়েছে। চায় কি ছেলেটা?

উল্টোডিঙি গিয়েছে টুকটুকি, সেখানে ডিঙি নিয়ে গিয়েছে আভাস, বাঁশবেড়ে গিয়েছে, সেখানেও বেড়েছে বাঁশ হয়ে, আবার যদি কোনোদিন সরস্বনায় যায় দেখবে সর্বে বুনে রেখেছে।

এড়ানো যায় না, তাড়ানো যায় না, নড়ানো যায় না—চায় কি ছেলেটা? একদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে হয়!

ইচ্ছে করে সেদিন রবিবার সকালেই একা-একা বেরিয়ে পড়ল টুকটুকি। মাকে বললে হাসিনার বাড়ি যাচ্ছি। ভেবেছিল সময়টা বেটাইম, হয়তো দেখতে পাবে না। কিন্তু হাঁড়ির সঙ্গে যেমন শরা, ফাইলের সঙ্গে যেমন ফিতে, ঠিক উদয় হয়েছে আভাস।

নতুন রাস্তা নিল টুকটুকি। কম লোকজনের রাস্তা। ঠিক সেই পথেই নির্ভুল সারল্যে আভাস চলে এসেছে।

ফুটপাতে দাঁড়াল টুকটুকি। খানিক দূর এগিয়ে আভাসও থামল। আশ্চর্য, এ ফাঁকা-ফাঁকা রাস্তায় মেয়েটা দাঁড়াল কেন? কোথায় যাবে? এদিকে তো ট্রাম-বাস নেই। তবে কি কারু সঙ্গে মিট করবে? আগে থেকে ঠিক করে এসেছে? বাবা, যাই পারো, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। আমি তোমাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছি। তোমার কি গতিবিধি, তোমার কি আলোছায়া সব আমার মুখস্থ। সোম থেকে শুক্র, তারপর আধখানা-ছুটি শনি, পুরো-ছুটি রবি—সব আমার নখের আয়নায়। যেমন বিমান অফিসে বলে দেওয়া যায়, কোন শূন্যে কোন প্লেন ছুটেছে, তেমনি আমি আমার রকে বসেই বলে দিতে পারি তুমি এখন কি করছ, কোথায় আছ, কখন আবার দেখতে পাব তোমাকে। বাড়ি থেকে কবে বেরুবে না এবং কবে বেরুবে, বেরুলে কখন বেরুবে কোথায় যাবে, কার সঙ্গে যাবে, কি ভাবে যাবে, থাকবেই বা কতক্ষণ, আমি সব বলে দিতে পারি। গাঁথতে না পারলেও গুনতে পারি হুবহু। আর, সব সময়েই দেখেছ, তুমি যেখানে যাচ্ছ বা গিয়েছ, আমিও সেইখানে, পথে ও গন্তব্যে, দু শো গজ দূরেই হোক বা দু হাজার গজ দূরেই হোক। আর, তোমারো এমন অভ্যেস, সব সময়েই তুমি আমার জন্যে একভাবে না অন্যভাবে উচাটন। আমি না মরতেই আমার ভূত দেখছ তুমি। খেতে শুতে বসতে দাঁড়াতে চলতে ফিরতে সব সময়ে তোমার ভয় এই বুঝি আভাসের আভাস মিলল। একভাবে না হোক অন্যভাবে তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি, তোমাকে রাগিয়ে রেখেছি।

তোমাকে জানিয়ে রেখেছি।

আমার তো অন্য কোনো উপায় নেই, পদ্ধতি নেই, কি করে জানাই?

আমার চেহারা সুন্দর নয়, আমি ছাত্র হিসেবে অপদার্থ। আমার কোনো গুণ নেই, গাইতে পারি না, বাজাতে পারি না। কবিতা লিখতে পারি না, ছবিও তুলতে পারি না ক্যামেরায়। যে বখা আর হতচ্ছাড়া, সে আর কি করে জানায়? তোমাকে বিরক্ত করি, তোমাকে খেপিয়ে রাখি। তোমাকে তো আলো করতে পারি না, জ্বালাতন করতে পারি। মুঠো মুঠো পারি শুধু ঘৃণা কুড়োতে।

কিন্তু তুমি যে আরেকজনের জন্যে নিরিবিলি খোঁজো, আরেকজনের জন্যে যে তুমি উৎকণ্ঠিত তা কে জানত! আমি না হয় ধুলোর ধুলো তৃণের তৃণ, কিন্তু এমন তো কেউ আছে যার জন্যে তুমি নির্জন, যার জন্যে তুমি উৎসুক। তা হলেই হল। তা হলেই আমার তৃপ্তি।

কাকে যেন হাত তুলে ইশারায় ডাকছে টুকটুকি। কাকে? পিছন ফিরে ব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল একবার আভাস। কই, তার আগে-পিছে কেউ তো নেই রাস্তায়। এ কি অঘটন, তাকেই ডাকছে আঙুল নেড়ে, হাতছানি দিয়ে?

হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। কেন, কেন আমার পিছে-পিছে ঘোরেন সর্বদা? কেন আমাকে এক দণ্ড তিষ্ঠতে দেন না শান্তিতে? কেন অসভ্যের মতন ছড়া কাটেন? কি চান আপনি? কি আপনার অভিসন্ধি? স্পষ্ট করে বলুন। নয়তো চলুন আমার সঙ্গে থানায়। আপনার বাবা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন কিংবা আমার বাবা গা মাখতে চান না বলে ভাবছেন কেউ আপনাকে শাসন করবার নেই, দেশ থেকে রাজত্ব উঠে গিয়েছে? এমন মনেও ভাববেন না। আমিই এর হেস্তনেস্ত করব, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়—এমনি করেই বলবে নিশ্চয়ই।

কোনোদিন ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। আজ কাছে এগোতে ভয় করতে লাগল আভাসের।

'এ কি, আমাকে ডাকছ?' অবিশ্বাস্য তবু স্তিমিত ভঙ্গিতে জিগগেস করল আভাস।

'হ্যাঁ, তোমাকে।' স্পষ্ট স্থির কণ্ঠে বললে টুকটুকি।

হঠাৎ চক্ষু পেলে অন্ধের কি রকম হয় কে জানে, আভাসের মনে হল সমস্ত দিশপাশ রাস্তাঘাট, দোকান-পসার, দালান-বালাখানা ঝলমল করে উঠেছে। সমস্ত কিছু যেন নতুন কি একটা পোশাক পরে দাঁড়াল। আর সে-পোশাক আভাসের নিজেরও পরনে।

একটি মুহূর্ত, কিন্তু মনে হল দরিদ্র যেন হঠাৎ রত্ন পেয়েছে কুড়িয়ে। আভাস স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কেন বলো তো?'

'এই দেয়াল বেয়ে যে লতা উঠেছে তাতে কেমন নীল-নীল ফুল ফুটেছে দেখছ—' দুই চোখ স্বপ্নপরিপূর্ণ করে তাকাল টুকটুকি।

'হ্যাঁ, অপরাজিতা।' সুন্দর করে উচ্চারণ করল আভাস।

'এ আমাকে ছিঁড়ে দিতে পারো?'

আকাশের চাঁদ নয়, সামান্য ফুল চাইছে টুকটুকি।

'পারি। কিন্তু যাদের বাড়ি তারা যদি কিছু বলে?'

'তা বলতে পারি না। যদি বাড়ির লোকের তত লক্ষ্যই হবে তা হলে লতাটা বাইরের দিকে বাড়তে দিত না। ভিতর দিকেই টেনে রাখত।' টুকটুকি মাথার চুলটা একটু ঠিক করল: 'আমার হাত যায় না, আমার হাত গেলে আমি নিজেই পাড়তাম। দেয়ালটা যাচ্ছেতাই উঁচু। পারবে উঠতে?'

এর চেয়েও দুঃসাধ্য কাজ করে দিতে পারে, ডাঙায় ডিঙি চালাতে পারে, এমনি বীরত্বের ভাব করল আভাস। বললে, 'পারব, তবে ঐ দিক থেকে ঘুরে আসতে হবে।'

'দেখ যদি পারো।' যেন কতদিনের চেনা এমনি সুর ফোটাল টুকটুকি 'গাঢ়নীল ফুল। আমার নীল ভারী পছন্দ।'

প্রায় বশে এনে ফেলেছে। আশ্চর্য ও অসম্ভব জোর এসেছে আভাসের শরীরে, ইলেক্‌ট্রিক পোস্ট ধরে উঠে বড় রাস্তার দিক থেকে ধরেছে দেয়াল। পা রাখতে পারে এমনি একটুখানি পরিসর দেয়ালের, ভাগ্যিস কাচের টুকরো বসানো নেই, তারই উপব পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগল সন্তর্পণে। পা পিছলে পড়ে গেলেই চিত্তির। বেশ উঁচু দেয়াল, নামার সময়ও খুব সাবধান।

লতা ধরে ফুল ছিঁড়ল আভাস। বললে, 'নাও।'

নিচে থেকে আঁচল পাতল টুকটুকি। উপর থেকে আভাস ফেলতে লাগল আঁচলে। এক দুই তিন। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়, কে কখন তাড়া দেয়,, পিছু হটে পোস্ট বেয়ে নামতে গেলেও অনেকক্ষণ লেগে যাবে, এখান থেকেই লাফ দিই।

আঁচলটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল টুকটুকি। আশ্চর্য, আভাস কি ফুল? সে কি টুপ করে পড়তে পারে আঁচলে?

'পায়ে চোট লাগেনি তো?' শুশ্রূষার সুরে জিগগেস করল টুকটুকি।

'না। লাগবে কেন?' হাত-পা ঝেড়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল আভাস।

'তা হলে কত শক্ত কাজ তুমি করতে পাবো।' এক পা কাছে এসে বললে টুকটুকি।

'চুরি করা শক্ত কি!'

'অত্যন্ত শক্ত। সাহসই তো শক্ত।' একটা ফুল চুলের বিনুনিতে গুঁজল টুকটুকি: 'এমনি পোস্ট বেয়ে ওঠা, দেয়াল দিয়ে হাঁটা, দেয়ালের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়া—শক্ত বই কি। নির্জীব পোস্ট বা দেয়াল হওয়ার চেয়ে একটা বীর চোর হওয়াও ভালো।'

লজ্জিত-মুখে হাসল আভাস। বললে, 'চৌর্যই বলো বীর্যই বলো সব তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে অনেক তাহলে করতে পারো তুমি?'

'অনেক।'

'যা বলি তাই?'

মাটির দিকে মুখ করে রইল আভাস।

'তাহলে আমাকে তুমি বিরক্ত করো কেন সব সময়?' আবদারের সুর এসে গেল টুকটুকির 'কেন সব সময় যন্ত্রণা দাও?'

'তুমি বিরক্ত হও খুব?' ভাসা ভাসা চোখে তাকাল আভাস।

'ভীষণ।'

'খুব যন্ত্রণা পাও?'

'সাংঘাতিক।'

'তাহলে আর বিরক্ত করব না। আভাসের মুখটা আলো হয়ে উঠল· 'আর দেব না যন্ত্রণা।

'ঠিক?'

'এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি ' অভ্যাসবশেই যেমন বলে তেমনি বলে ফেলল আভাস, কিন্তু কাকে ছোঁবে? ছোঁয়া কি এতই সোজা?

'আমি শান্তিতে থাকি এ কি তুমি চাও না?' রাজহাঁসের মত ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করল টুকটুকি।

'চাই।'

'তাহলে আর এস না আমার পিছু পিছু। ঘুরঘুর কোরো না। যেখানে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ো না।' মমতার মধুচাক যেন ভেঙে দিল টুকটুকি· 'আমরা তো এক বাড়িতেই থাকি, একটু-আধটু দেখা হওয়াতে আমাদের বাধা কোথায়? বাড়িওলা আর ভাড়াটের মধ্যে কি ভাব হয় না? কেন তুমি রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করবে? তুমি ভালো হয়ে থাকো, ভালো হয়ে লেখাপড়া শেখো। এই নাও তুমি দুটো ফুল নাও—কত কষ্ট করে পেড়ে দিলে।'

আশ্চর্য, হাত পাতল আভাস।

কোনোদিন হাতে করে ফুল ধরেছে ভাবতে পারে না, কিন্তু এ তো শুধু ফুল নয়, এ টুকটুকির হাত, পুষ্পময় স্পর্শ।

অভাবনীয়ের অবতারণা হল।

বন্ধুরা এসে বললে, 'কি রে, কি হল, আজকাল আসিস না কেন আড্ডায়?'

এমনধারা উত্তর শুনবে কেউ কল্পনাও করেনি। আভাস গম্ভীর মুখে বললে, 'পড়ছি। পরীক্ষা দেব।'

'মাইরি?'

'দেখি না চেষ্টা করে।'

'বৃথা চেষ্টা। আর কোনোদিন পারবি না পাশ করতে।'

'আগে-আগে তাই ভাবতাম।' আভাস জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে: 'এখন মনে হচ্ছে পারব।'

'নে, বাবা, যা খুশি কর। এখন কিছু পয়সা দে, সিনেমা দেখে আসি -' বন্ধুরা হাত পাতল। একজন বললে, 'শেষ সিনটা যা করেছে মাইরি, এমন একখানা প্যাঁচ যে আপনা থেকেই মুখ দিয়ে সিটি বেরিয়ে আসে।'

আগে-আগে বন্ধুদের রেস্ত-রসদ যোগাড় করেছে আভাস। এবং মায়ের কাছ হাত পেতেও যখন পায়নি তখন বাবা নয়তো দাদার পকেট মেরেছে। নয়তো লুকিয়ে চাবি দিয়ে মায়ের দেরাজ খুলেছে। আজও সে-সকল উপায় তেমনি প্রশস্ত আছে। কিন্তু মনে সমর্থন নেই। মনে হচ্ছে যে-হাত টুকটুকিকে ছুঁয়েছে তা দিয়ে আর ম্লান কাজ সম্ভব নয়।

পকেট হাতড়ে দুটো টাকা বের করে দিয়ে দিলে বন্ধুদের। বললে 'এই নে, এর বেশি আর নেই, পারবও না এর বেশি—'

'ওরে চলে আয়, আভাস ভালো হচ্ছে—' বন্ধুরা টিটকিরি দিয়ে উঠল।

সত্যি কি ভালো লাগছে এই ভালো হওয়ার সুর! চারদিক থেকে ঝরে পড়ছে সুধাবচনের সুধাপরশের পাপড়ি। যেদিকে তাকায় সেদিকেই দেখে একটি অমল মুখের আনন্দ। একটি সৎসাহসের হাতছানি।

কিন্তু দেবানন্দ ঘোষাল ভালো হবে কবে?

নিচে পিছনের দিকে এক ঘরের ভাড়াটে, সে আর তার স্ত্রী করুণা আর তার মধ্যম ছেলে অসিত। দেবানন্দের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, পেটে কি এক দুর্দান্ত ব্যথা, থেকে থেকে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। কেউ বলে, ক্যানসার, কেউ বলে আলসার, কতরকম নাম, কতরকম উপনাম। হাসপাতালে ঘুরে এসেছে দুবার, কাটাছেঁড়াও হয়েছে, তবুও সুরাহা হয়নি। জৈব দৈব কিছুই বাকি নেই, এখন শুধু চিৎকার সার। আত্মীয়স্বজনেরা বলে, এ

শুধু তার দেহের যন্ত্রণা নয়, এ তার প্রাণের আর্তনাদ। বড় ছেলের শোক অনেকদিন ভুলে গিয়েছিল কিন্তু ছোট ছেলের শোকটাই তাকে দগ্ধাচ্ছে তিলে তিলে।

সরল মুখে তরল চোখ, বারো বছরের ছেলে, অনিত, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল গলায় কি একটা অপারেশানের জন্যে। বাইরে থেকে অপারেশান, তেমন কিছু কঠিন হবার কথা নয়। রোগাটে দুর্বল ছেলে, ভয় ছিল ক্লোরোফর্ম সামলাতে পারবে কিনা। কিন্তু না, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, বিপদ কেটে গেল দেখতে-দেখতে। ঘাও প্রায় শুকিয়ে এসেছে, ছেলের খালি বায়না--বাবা, কবে বাড়ি যাব? দিন ঠিক হয়েছে, সকালে নার্স ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেবে, সুস্থ ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরবে দেবানন্দ। করুণা দরজা ধরে তাকিয়ে আছে বাইরে।

ঐ আবার দেবানন্দ গর্জন করে উঠেছে।

আশেপাশের লোকের মনে হয় এ রোগের যন্ত্রণা নয় নয় বা শোকের আর্তি এ এক উন্মত্ত আত্মার দুর্দম অভিযোগ।

নার্স ব্যাণ্ডেজ খুলছে, বিছানার পাশে টুলে বসে আছে দেবানন্দ। অনিতের চোখে বাড়ি ফিরে যাবার ছুটিভরা স্বপ্ন।

ব্যাণ্ডেজের শেষ প্রান্ত সেফটিপিন দিয়ে আঁটা নয় আলগা গেরো দিয়ে বাঁধা। ফাঁসের দুটো অংশের যেটা ছোট সেটা ধরে টান মারলেই ব্যাণ্ডেজ খুলে যায় সহজে। কি ভুল হল নার্সের বড় অংশটা ধরে টান মারল আচমকা। গেরোটা আঁট হয়ে বসল, আর খোলা যায় না বাঁধন। একটা কাঁচি, কাঁচি নেই কোথাও? হন্তদন্ত হয়ে নার্স কাঁচির জন্যে ছুটল। ব্যাণ্ডেজ খুলতে এসেছে, একটা কাঁচি নিয়ে আসেনি। কে জানত ঘটবে এমন দুর্বিপাক! নিয়তি যেন হাতে ধরে ফাঁসের বড় টুকরোটাই তুলে দিল নার্সের হাতে। নার্স অনেক খোঁজাখুঁজি করে কাঁচি এনেছে কোত্থেকে। ততক্ষণে সমস্ত বাঁধনের বাইরে চলে গিয়েছে অনিত।

পাগলের মত বাড়ি ফিরে এসে দেবানন্দ সর্বপ্রথমে কি করল? করুণার যত কিছু পুজো-আচ্চার সরঞ্জাম ছিল, যত পট-ঘট মূর্তি-বিগ্রহ সব একত্র করে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

করুণা বললে, 'আমি তাহলে কি নিয়ে থাকি?'

তারপরেই অসুখে পড়ল দেবানন্দ। দেবানন্দ হাসল বললে, 'এই তো পেয়েছ তোমার জিনিস। সেবা, রোগসেবা। আর আমি? আমি কি পেয়েছি জানো?' অট্টহাস্য করতে চেয়েছিল দেবানন্দ, কিন্তু ব্যথায় মর্মভুদ আর্তনাদ করে উঠল· 'আর আমি পেয়েছি এই চিৎকার।'

গগনানন্দ স্বামী এসেছেন ভবতোষদের বাড়ি, সেখানে কীর্তন হবে সন্ধ্যায়। ভবতোষ আর নীলিমা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনে-জনে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। করুণা স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসে হাতে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'যাব?'

'দিশি গান শুনতে যাবে তো যাও না—'

কিন্তু এমন খুশির তরঙ্গ তুলল করুণা যেন এ শুধু দিশি গান নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। এত বেশি যে জানলা দিয়েও বাইরে তাকে ফেলা যায় না। জানলা কোথায়? জানলাটাই তো ভুল। যা বার তাই ভিতর।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল দেবানন্দ: 'যেখানে যাচ্ছ সেখানে গিয়ে জিগগেস কোরো কোনটা তিনি বেশি শোনেন, আগে শোনেন? কীর্তন, না ক্রন্দন? কোনটা তাঁর কাছে বেশি মিষ্টি লাগে? কীর্তন, না ক্রন্দন? জিগগেস কোরো, ভুলে যেও না।'

ভবতোষ আর নীলিমা অনেক কসরত করে কুকুরের পাশ কাটিয়ে যথাক্রমে চন্দ্রচূড় আর মন্দিরা দেবীকে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছে। যদি যান, আমাদের গুরুদেব আসছেন। আর তাঁর কীর্তন যদি শোনেন

'পাষাণও জল হয়ে যাবে?' একটু কি ব্যঙ্গের সুর মেশালেন চৌধুরী? 'কিন্তু আমরা তার চেয়েও কঠিন। আমরা ইস্পাত।'

'তা ছাড়া,' গাম্ভীর্যে মুখ গোলালো করে মন্দিরা বললেন, 'তা ছাড়া আমাদেরও গুরুদেব আছেন।'

চৌধুরী-দম্পতি গেলেন না কীর্তনে। হীনাবস্থার লোক ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দে, পাঠ বা কীর্তনের জন্যে একটা হলঘর নেই, ছাদের উপর মেরাপ বেঁধেছে—সেখানে কি আমাদের মানায়? তারপর কে না কে এক আখড়ার বাবাজী, কেমন গায় কে জানে!

কিন্তু দেখ, দেখ, কত মোটর এসে দাঁড়িয়েছে চন্দদের বাড়ির সামনে। তা হলে বেশ একজন কেষ্টবিষ্টু সাধু, যোত্রগোত্রহীন কেউকেটা নয়। ঐ তো ঐ দেখ নামছে। লম্বা লোটানো গরদের ধুতি, হাঁটু-ঝুল পাঞ্জাবি, বা, খাসা দেখতে তো সাধুকে। দুধে-আলতা রঙ, কাকপক্ষ চুল, স্বপ্ন-বিলোল চক্ষু, যেমনটি আমি খুঁজছিলাম। নেমন্তন্ন যখন একবার নিইনি তখন আর কি করে যাই, দ্রুতপায়ে ছাদে উঠলেন মন্দিরা। লাউডস্পিকার বসিয়েছে এদিকে। কি হৃদয়-ভুলানো গান! শুধু পাষাণ নয় ইস্পাতও গলতে থাকে।

গুরু বদলাবেন মন্দিরা।

চৌধুরী বললেন 'এ কি সম্ভব?'

'কেন নয়? ইংরেজকে খেদিয়ে অন্য গুরু বসাচ্ছ না? এবং দরকার হলে তাকে খেদিয়ে অন্যতর?' মন্দিরা চিঠি লিখছেন গগনানন্দকে। বললেন, 'মন্ত্রীবদল চললে মন্ত্রবদল চলবে না? মন্ত্রবদল বলেই তো মন্ত্রীবদল।'

কত লোক কিউ করে দাঁড়িয়ে দর্শন পায় না, চিঠির লেটারহেড ও ফোন নম্বর দেখে গগনানন্দ গাড়ি চেয়ে পাঠালেন এবং গাড়ি এলে নিজেই এলেন দর্শন দিতে।

আর দর্শন মানেই দীক্ষা।

'আগের মন্ত্র ছেড়ে দেব?' চৌধুরী তখনো যেন খুঁত খুঁত করছেন।

গগনানন্দ বললেন, 'আগেরটা ধ্বনি, এখনই মন্ত্র। মন তোর মন্তোর। তোমার মন যখন নতুন বস্তু চাইছে তার মানেই আগের মাল আর বিকোচ্ছে না বাজারে।'

তারপর বাড়িতে কীর্তন দিলেন মন্দিরা। সেদিন চন্দদের দরজায় ক'খানা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল? আজ গুনে দেখ, দশগুণেরও বেশি, পুবে-দক্ষিণে সমস্ত রাস্তা গাড়িতে ছয়লাপ। বেছে-বেছে গাড়িওলাদেরই নেমন্তন্ন করেছেন চৌধুরী। এতে বিশেষ সুবিধে এই, জুতো রাখবার জন্যে আলাদা জায়গা বা সতর্ক বন্দোবস্ত করতে হয় না। ভক্তরা তাঁদের জুতো গাড়িতেই নিশ্চিন্তে রেখে আসতে পারেন আরামে।

আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। ভবতোষ ধরল সাধুকে। 'প্রভু, কীর্তন কি শুধু এখন ও-পাড়ায়?'

দেখছ না কত আলো, কত মালা, কত জাঁকজমক! কত বড় হলঘর, ঝালরওলা ঝাড়লণ্ঠন, বেদীতে কত পুরু গদি কত বেশি ফ্যান, কত সম্ভ্রান্ত জনতা! তুমি তো ঘরের লোক হে!

নতুন গুরুকরণ করে তবুও চৌধুরীর সুখ নেই। যেহেতু চন্দদের মতন লোক এখন তাঁর গুরুভাই।

৭

এই? এরই জন্যে এত?

এটা এখন সুপ্রভাতের জিজ্ঞাসা।

এই। এরই জন্যে এত।

এটা এখন সোহিনীর বিবৃতি।

একটাতে বিস্ময়ের চিহ্ন আরেকটাতে দাঁড়ি।

স্নান করে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সুপ্রভাত জিগগেস করলে, 'তোমার ছুটি কটায়?'

'তিনটেয়।' চুলে তেল মাখছে সোহিনী 'কেন বলো তো?'

'আর কিছুক্ষণ পরে হলে আমার আফিসের গেটে তোমাকে মিট করতে বলতাম।' ছেলেমানসি সুরে বললে সুপ্রভাত।

'মিট তো নিত্যি করছি। আবার আফিসের গেটে কেন?' খুকির মত হেসে উঠল সোহিনী: 'মিট করে তারপর কি হত?'

'কোথাও কোনো কাফে কি হোটেলে খেতে যেতাম,' ব্যাকব্রাশ একবারের জায়গায় তিনবার করছে সুপ্রভাত 'ঠাকুরটার রান্নায় অরুচি ধরে গেছে।'

বাঁ হাতের তেলোতে ছোট্ট গোল করে খানিকটা তেল নিয়ে চুলের ডগাগুলো একত্র করে ঘষছে সোহিনী। বললে, 'বলো না কি খেতে চাও, আমি নিজেই রাত্রে রেঁধে দেব।'

'কি যে খেতে চাই তা কি আমি জানি আর কি যে সেই রান্নার মশলা তা বা কি তুমি জানো?'

দূর একটা ক্লান্তির সুর যেন এসে লাগল কিন্তু হাসির ঝাপটায় তা উড়িয়ে দিতে দেরি হল না সোহিনীর 'তিনটের সময় ফ্রি হবে কি? আজ তোমাকে কয়লা যোগাড় করতে বেরুতে হবে না? আর বড়বাজার থেকে কিছু শার্টিং-শাড়ি?'

'আজ কি বার?' চমকে জিগগেস করল সুপ্রভাত।

বারটা মনে পড়িয়ে দিল সোহিনী। এই বার না আর বার। সব যেন এক রঙে রঙা, এক তাপে গালাই করা। একবার দুবার তিনবার। একঝাঁক পাখি উড়ে যাবার পর শূন্য এক আকাশের একঘেয়েমি।

হ্যাঁ, একবার। প্রথম বার। সাবিত্রী ঊষার সেই প্রথম উন্মোচন। তারপরে? তারপরে আর কিছু নেই। শুধু পুনরুক্তি শুধু পুনরুল্লেখ। বারে বারে একই রেখার উপরে একই রেখা বুলোনো।

এরই জন্যে এত কেঁদেছে সুপ্রভাত? এত সেধেছে? দেয়ালে এত মাথা কুটেছে? ঠোঁট-ফাঁক-করা তীর্থের কাকের মত বসে আছে চৌকাঠের বাইরে? এরই জন্যে? এই সোফা-সেটি পর্দা-কুশান ঢাকনি-সুজনি? শুধু একটু চিকনের চিকমিক? গোল টেবিলটার নিচে ছোট এক টুকরো কার্পেট, চায়ের পটের জন্যে একটি গরম কোট, নয়তো লেপের একদিকে, বাইরের দিকে, দেখনখুশি সিল্ক। শুধু ক'টি মধ্যবিত্ত

চেকনাই, শুধু কটি হিত-মিত উত্তেজনা! এরই জন্যে এতদিনের লঙ্ঘন, এতদিনের নিহ্নব?

এই একতাল ঠাণ্ডা অভ্যেস, বিস্বাদ আলস্যের জন্যে? কটি ধোলাই করা কথা, মহড়া দেওয়া ভঙ্গি? শত রাত্রির অভিনয় নয়, নয় বা তিনশত রাত্রির--কিন্তু নিরন্ত রাত্রির অভিনয়। মুখস্থের উন্মত্ততা।

সুপ্রভাতের ইচ্ছে ছিল সোহিনী চাকরিটা আর না করে। তার সেই শিক্ষয়িত্রীর সাজটা বদলে ফেলে, সেই শিক্ষয়িত্রীর স্বাদ। সে এখন একটি প্রতীক্ষমানা গোপনচারিণীর ভূমিকা নেয়। গহনকক্ষের অন্ধকারে বন্দিনী রাজকন্যার। মোট কথা, আবার যদি সে দুর্লভের জাল বুনতে পারত চারদিকে। অন্তত যদি সে নামত রাজনীতিতে। যদি বিপ্লবের কলস আনতে পারত চোখেমুখে। সিঁথিতে সিঁদুর নয়, যদি হত তা বিদ্রোহবিদ্যুতের রসনা। হাতের নিরীহ কলম যদি হয়ে উঠত কাস্তে বা তকলি, যে কোনো নিশান। যদি বা নামতে পারত পর্দায় বা মঞ্চে বা মাইকের সামনে। আরো কতরকমই তো চাকরি ছিল মেয়েদের। যদি বা হত নার্স বা মিডওয়াইফ বা অন্তত ট্রেনের ফিমেল-চেকার।

এ সবই অবাস্তব কল্পনা, সুপ্রভাত তা বোঝে। তাব আসল কথাটা হচ্ছে এই যদি একটু অচেনা-অচেনা লাগত সোহিনীকে তার কাজের জন্যে, তার সাজের জন্যে, তার পরিপার্শ্বের জন্যে। যদি এক শিশি মিকশ্চারের এক দাগ—যে কোনো দাগ—ওষুধ না হত। খেলো জোলো আর সস্তা। যদি সে আবৃত্তি না হয়ে থাকতে পাবত সৃষ্টি হয়ে। শেষ না হয়ে বিশেষ হত।

চালু চাকরি কি কেউ ছাড়ে, না, কেউ ছাড়তে বলে? সংসারে আয় বাড়ছে আর আয়ই যখন সাংসারিক প্রতিপাদ্য, তখন কি কেউ বাদ দেয়? তাই সদরে এক তালায় দুই চাবি, একটা সুপ্রভাতেব কাছে আরেকটা সোহিনীর, কে কখন ফেরে কিছু ঠিক নেই। এবং উভয়েই আশা কবে যেন আমি গিয়ে ওকে বাড়িতে হাজিব পাই।

বেশির ভাগ দিন সোহিনীই আগে ফেরে। কিন্তু তার তো একআধদিন ইচ্ছে করতে পারে সুপ্রভাত আগে ফিবে সব তদারক করিয়ে রেখেছে, চায়ের টেবিল সাজানো ঘবদোব ফিটফাট, বারান্দায় তার একটু উদ্বিগ্ন পাইচারি। কিন্তু তা বড় একটা হবার নয। বেশির ভাগ দিন সুপ্রভাতই আসে দেরি করে। এবং সমস্তই সহজসুলভের সজ্জা পবে আছে দেখে আবাব নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এক-আধদিন জিগগেস করে সোহিনী 'এত দেবি হল ফিরতে?'

'এই দুর্ঘটের দিনে কোথায় চাল, কোথায় কাপড় তাই খুঁজে-খুঁজে ফিরছি—' সুপ্রভাত হাসে। পরে প্রায় দার্শনিকের ধূসরিমায় চলে এসে বলে: 'সঞ্চিত যা আছে তাকে মোটেই উদ্বৃত্ত মনে হয় না।'

এতক্ষণে যেন বলতে পেরেছে কথাটা। উদ্বৃত্ত নেই কার মধ্যে? স্বীকার করতে বাধা কি, তার নিজের মধ্যে। সোহিনীর তো তবু এখনও সম্ভাবনা আছে, জৈব অর্থেই আছে, সে মা হতে পারবে। কিন্তু সুপ্রভাত নিজে? সে নিঃসঙ্গ-নিঃশেষ। প্রেমিক, স্বামী, পিতা—কিছুতেই কিছুই সে পায়নি, পাবেও না। তার পিপাসার নির্বাণ নেই। হয়তো কোনো পুরুষেরই নেই।

তাই কোথায় অন্ন কোথায় বস্ত্র এই শুধু সুপ্রভাতের সন্ধান নয়, আরো এক সন্ধানে সে উদ্‌ভ্রান্ত—কোথায় ভালোবাসা? কোথায় সেই অনুভূতির পূর্ণিমা?

বিরাট নির্জন প্রাসাদ, অগণন তার কক্ষ, একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে সুপ্রভাত—এমনি নিজেকে সে কল্পনা করে। দিনের আলোর, প্রথম পাওয়ার উত্তেজনার আলোয়, সব ঘর সে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দেখে-দেখে ফিরেছে, এখন বুঝি অন্ধকার হয়ে এল, দেয়ালের পর দেয়াল, আনাচের পর কানাচ, সে হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াচ্ছে, খুঁজে পাচ্ছে না আলো জ্বালাবার সুইচ। যদি হাতে দৈবাৎ একটা ঠেকছে, টেনে টিপে দেখছে অনেক মেহনত করে, জ্বলছে না আলো, যদিও নিখুঁত করে লাইন পাতা, যদিও নিটুট ঝুলছে সব বাল্‌ব। হঠাৎ আবিষ্কার করল সুপ্রভাত মেইনই অফ্‌ হয়ে আছে। যে বিন্দুটি সমস্ত আলোর উৎস সেইটিই মৃত। তাকে দৃঢ় স্পর্শে, আঘাতের স্পর্শে উজ্জীবিত করতে হবে। কিন্তু কোথায় মেইন? কোথায় সেই অগ্নিমূল?

সোহিনী যা চেয়েছিল পেয়েছে। ঠাট, লেপাফা, সাইনবোর্ড। তার উজ্জ্বল অক্ষরের বিজ্ঞাপন। কিন্তু সুপ্রভাত যা চেয়েছিল সে কি তা পায়নি?

কিছু একটা নিশ্চয়ই সে পেয়েছে, তার প্রতীক্ষার পর্যাপ্তি, এক ঘর আরাম, এক বিছানা ঘুম—কিন্তু তাই কি সে চেয়েছিল?

তবে সে কি চেয়েছিল?

কি চেয়েছিল? উত্তর পেয়েছে সুপ্রভাত। সে সোহিনীকে কাঁদাতে চেয়েছিল।

খাওয়া খাওয়াই নয় যদি তাতে নুন না থাকে। পাওয়া পাওয়াই নয় যদি তাতে না থাকে কান্না।

শুধু সুপ্রভাত একলা কেঁদেছে, একতরফা। সোহিনী এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেনি। তার দুই চোখে আতঙ্ক ছিল, শাসন ছিল, কাঠিন্য ছিল—মমতাও ছিল—ছিল প্রশান্তি, ছিল সহিষ্ণুতা। অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু এক ফোঁটা জল ছিল না। চোখের জলে বালিশ ভেজানো দূরের কথা, আঁচলের ডগাটুকুও চোখের কোণে এনে ঠেকায়নি। একটু উন্মনা হয়নি উতলা হয়নি সুপ্রভাতের জন্যে। বরং কি নির্মমের মত তিল-তিল যন্ত্রণা দিয়েছে সুপ্রভাতকে। সেই ট্যাণ্টালাসের মত আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে রেখেছে অথচ নিদারুণ তৃষ্ণায় যেই সুপ্রভাত চুমুক দেবার জন্যে মুখ বাড়িয়েছে অমনি সরিয়ে নিয়েছে জল। মর্মমূলে বসে রক্ত চুষেছে অহর্নিশ। হাঁটা-পথে কাঁটা-পথে ধাওয়া করিয়ে ফিরেছে একের পর এক বেড়া টপকিয়ে ছেড়েছে। প্রথমে, শেষ পরীক্ষাটা পাস করো, পরীক্ষার কাছাকাছি এলে ধুয়ো তুলেছে ধ্বজায় চূড়ায় এসে উঠতে হবে। অনিদ্রচক্ষে রাত্রিদিন পড়েছে সুপ্রভাত, কত বিস্তৃত ও গভীর, আর সে কি জাগ্রত শক্তির তপস্যা! এক-একবার হাল ছেড়ে দিয়েছে, এ দুষ্পার জলধি পারবে না উত্তীর্ণ হতে, বইয়ের উপর মুখ গুঁজে বসে কেঁদেছে। আবার মুখ তুলে চোখ মুছেছে কাপড়ে, ঝাপসা অক্ষরকে ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হতে দিয়েছে। তারপর চুড়ো ছুঁয়ে যখন পাস করল, ভাবল, সোহিনী এবার তাকে একটু নিরালায় ছুঁতে দেবে। সোহিনী তাকে ফিরিয়ে দিল, বললে, ধৈর্য ধরো। একটা চাকরি যোগাড় করো আগে। সোহিনী জানে না সেদিন, সেই ফিরে যাবার দিন, মাঠের ধারে একটা বন্ধুর মতন গাছের তলায় বসে সে কেঁদেছিল। হ্যাঁ, ধৈর্য না ধরে উপায় নেই, আর স্বর্গ-মর্ত্য কর্ষণ করে, যে করে হোক, যোগাড় করবেই সে চাকরি।

হন্যের মতন সুপ্রভাত দ্বার থেকে দ্বারে, থাম থেকে থামে, ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা মাস্টারি বা কেরানিগিরি হলে তো চলবে না, চাই একটা টেঁকসই দামি প্যাকেটের উপহার। সেই কঠোর সাধনার পর যখন আবার সে জয়ী হল, চাকরি পেল, তখন আবার হুকুম জারি করল সোহিনী, বললে, বাড়ি চাই আলাদা। নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করল সুপ্রভাত। তবেই বিয়ে করল, পারল বিয়ে করতে।

উপায় কি! সনাতন বিয়ে করা ছাড়া যখন সোহিনীকে পাবার আর কোনো পথ নেই তখন ধৈর্য ধরে বসে থেকে-থেকে বিয়েই করবে সে। তার জন্যে যত কষ্ট সহ্য করবার, করবে। যত হুকুম তামিল করবার, করবে। যত উপেক্ষা হজম করবার, করবে। তারপর একবার বিয়ে হয়ে গেলে, যখন সে আবার অস্তিত্বের কারাগারে বন্দী হয়ে যাবে, তখন এই

সমস্ত যন্ত্রণার শোধ তুলব। তখন ওকে কাঁদাব, প্রাণ ভরে কাঁদাব, তার হাতে কিছু দুঃখ পেয়েছি তার নিকেশ করাব। ওর মধ্যে যদি দুঃখ না থাকে, আমার মধ্যেও মূল্য থাকবে না।

জলের তিলক থাকে না। কিন্তু অশ্রুজলের তিলক থাকে। আমার কপালে সোহিনীর হাত থেকে আমি অশ্রুজলের তিলক নেব।

কিন্তু এ কি অসম্ভব কথা, এখনো কিনা সোহিনী হুকুম করে চলেছে আর তাই কিনা নির্বিবাদে নির্বাহ করছে সুপ্রভাত। যা কিছু সর্ত সমস্তই উত্থাপন করছে সোহিনী, সুপ্রভাতের শুধু সমর্থনের পালা। সুপ্রভাত যেন এখনো নিস্তেজ, এখনো নির্মূল্য। তার মূল্য নেই যেহেতু সোহিনীর মধ্যে তার জন্যে কোনো বেদনা নেই।

যদি মূল্য চাই, মুক্তি চাই, সোহিনীর মধ্যে জাগাতে হবে বেদনা।

'তোমার নীলুদা তো কাঁচরাপাড়া থেকে শেয়ালদা সেকশনে বদলি হয়ে এসেছে,' সুপ্রভাত বললে, 'তাকে একটা চিঠি লিখলে পারো। জানো তার ঠিকানা?'

'জানি। কিন্তু তাকে চিঠি লিখতে যাব কেন?' ইস্কুলের খাতা দেখছিল সোহিনী, পেন্সিলের ডগাটা ঠোঁটের উপর এনে ঠেকাল।

'আমি আর পারি না ঘুরতে-ঘারতে।' অসহায় শিশুর মতন সোহিনীর কোলের কাছে বসে পড়ল সুপ্রভাত 'কোথায় চাল কোথায় চিনি হন্দ হয়ে গেলাম। তোমার নীলুদাকে লিখলে তোমার পরোপকারী বন্ধু—একটা সুরাহা হয়তো করে দিতে পারে।'

সোহিনী গম্ভীর হয়ে গেল। নত চোখে নিবিষ্ট হল খাতায়।

'ওরা রেলের লোক তো, ব্ল্যাক-হোয়াইট অনেক ঘাঁতঘোঁত জানা সম্ভব। একবার দেখতে পারো লিখে। যদি সহায়ের হাত বাড়িয়ে দেয় তো ভালোই, নইলে হায়-হায় করবার জন্যে তো আমি আছিই।'

তোমার সংসারের সওদা নীলুদা যোগাড় করবেন কেন এ তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা জিভের ডগায় এসেছিল সোহিনীর, কিন্তু কি ভেবে জিহ্বাকে দমন করলে। বরং সুপ্রভাতের শেষ কথাটায় একটু হাসির আমেজ আনল মুখে। বললে, 'তাঁর কি রকম কাজ কিছুই জানি না–

'সেই জন্যেই তো লেখা –' ফোড়ার মুখটা একটু উস্কে দিল সুপ্রভাত।

'বিপদে পড়লেই লোককে লেখা যায়, আর,' নিজেরও অজান্তে হৃদয়ের নিবিড় নিভৃতি থেকে সুর বেরিয়ে এল সোহিনীর 'তেমনি বিপদ হলে, মনে হয়, তিনি পারবেন না না-এসে, কিন্তু ' স্বামীর দিকে তাকাল সোহিনী।

'কিন্তু এর চেয়ে আর কি বিপদ কল্পনা করা যায়!' জামার বোতাম আঁটতে লাগল সুপ্রভাত : 'উনুনে কয়লা নেই হাঁড়িতে চাল নেই, এক কথায় চাল-চুলো কিছু নেই, অথচ পকেটে টাকা আছে, যাকে বলে স্থান আছে সংস্থান নেই—স্বাভাবিক গৃহস্থের পক্ষে এই তো কঠিনতম বিপদ। লিখে দেখই না কি হয়। যদি কিছু উপকার করতে পারে মন্দ কি—' জুতো দুটো পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল সুপ্রভাত।

অতীতের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল সোহিনীকে। নিঃশব্দের গভীর গুঞ্জরণের মধ্যে।

সুখের দিনে কি নীলুদাকে ডাকা যায়? তাকে ডাকা যায় দুঃখের দিনে ভয়ের দিনে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে। যে নদী নাম হারিয়ে একলা বসে কাঁদে সেই নদীর পারে।

চারদিকে এ কি সোহিনীর সুখের আড়ত নয়, প্রাচুর্যের গোলাবাড়ি? এর মাঝে কি ডাকা যায় নীলুদাকে?

নীলুদার মতন কি লোক হয়? তক্ষুনি সমস্ত মন বলে উঠল একতানে। সে সুখে-দুঃখে সমানস্রোত। যেমন দুঃখের প্রতি তার করুণা তেমনি সুখের প্রতি তার সৌহার্দ্য। তুমি সুখী হও তুমি নিরাময় থাকো তুমি সর্বত্র মঙ্গল দর্শন করো এ শুধু নীলুদাই বলতে পারে।

কিন্তু বলো এ কি আমার সুখ? এ কি আমার সাফল্য? শুধু ঠাট, শুধু লেপাফা, শুধু সাইনবোর্ড। তোমাকে বলতে দোষ নেই, আর, তোমাকেই বলতে পারি, এ ঠাটের বাইরেই শুধু চাকচিক্য, ভিতরে কেবল খড়, এ লেপাফার বাইরেই শুধু ফিটফাট, ভিতরে চিঠি নেই একছত্র, আর এ সাইনবোর্ডের অক্ষর যতই বৃহৎ ও উজ্জ্বল হোক এর আসলেই বানান ভুল।

তবু এই বানান ভুলের বিজ্ঞাপনেই আমার ব্যবসা করে যেতে হবে?

আর, বলো, তুমিই বলো, এ কি আমার সাফল্য? আমি সমাজের কাছে জিততে গিয়ে জীবনের কাছে, নিজের কাছে হেরে আছি। আমি, তৃপ্ত হতে চেয়েছি দীপ্ত হতে চাইনি। যে আগুনে আলো হবার কথা সেই আগুনে আমি বাসি রান্না গরম করতে বসেছি। কিন্তু না করেই বা আমি করি কি! আমার কি তার চেয়ে বেশি ক্ষমতা আছে? আমি সাধারণ, আমি মধ্যবিত্ত, আমি অগণ্য নগণ্যেরই একজন, তবু জানি আমার ট্র্যাজেডি তুমি বোঝ, আমার শত দৈন্য দৌর্বল্যের প্রতি তোমার ক্ষমাও অফুরন্ত।

উনি বলে গেলেন, তবে লিখব নাকি নীলুদাকে? খামে নয়, পাছে

কি ভাবেন চিঠি খোলবার আগের মুহূর্তে, সামান্য ছোট্ট একটা পোস্ট-কার্ড। কি লিখবে? আমার চাল-চিনি বাড়ন্ত, ছি, এ কি কখনো লেখা যায়? তবে কি লেখা যায়? সুপ্রভাত যে বলে গেল. লিখে দাও, কি ভাবে লিখতে হবে তার কোনো আভাস দিল না। সুপ্রভাত কি বলবে! তার অন্তরের কথা সোহিনী ছাড়া আর কে জানে। কিন্তু নীলুদা, তুমি এস, কত দিন তোমাকে দেখি না. তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে—এমনি করে লিখলেও তো আসবে না। তবে কি লিখবে. কেমন করে লিখবে?

একটা পোস্টকার্ড নিয়ে বসল সোহিনী। লিখল: নীলুদা, বড় বিপদ, তুমি একবার এস।

আসবে এতে? বয়ে গিয়েছে। তোমার বিপদ, তাতে আমার কি। তোমার বিপদের মধ্যে গিয়ে আমি আবার বিপদে পড়ি আমি এমন নির্বুদ্ধি নই। তুমি সুখ নিয়েছ, আমাকে আনন্দ নিতে দাও।

আর যদি এসে উপস্থিত হয়, জিগগেস করে, কি বিপদ, তা হলে কি বলতে পারবে রেশনের চাল গিলতে পারছি না, কয়লা, যার আরেক নাম কালো মিছরি, তা পাচ্ছি না কোথাও বাজারে। যদি বলতে পারেও, শুনে উঠে চলে যাবে রাগ করে। বলবে, আমি কি চোরাবাজারের দালাল না আমি তোমার নায়েব-গোমস্তা? রাগ করে চলে যাওয়াই তো উচিত। তবু যদি একবার আসে. দেখতে পাই একটু. তার সেই দীর্ঘচ্ছন্দ শ্যামল শরীর, শরীর নয় শুধু একটা বলিষ্ঠ নিস্পৃহ উপস্থিতি—আব যদি রাগ করবার আগে একটু গান শোনায়।

ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে
আপন সুধা দিয়ে ভবে দেব তারে॥

পত্রপাঠ হাজির হল নীলাদ্রি। আশ্চর্য, কলকাতাতেও তাব সাইকেল।

'এই যে এসেছেন।' প্রসন্নমুখে সুপ্রভাতই তাকে অভ্যর্থনা করল 'আজকাল বুঝি এখানেই পোস্টেড?'

হ্যাঁ, শেয়ালদায়।' চারদিকে ব্যস্ত চোখে তাকাতে লাগল নীলাদ্রি। বিপদের লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছে না কোথাও। তবে কি বিপদ একলা সোহিনীর? এমন কি বিপদ হতে পারে যা সোহিনীর একলার, যাতে সুপ্রভাত জড়িত নয়? কিন্তু সোহিনী কোথায়?

'আছেন কোথায় এখানে?'

'ভবানীপুরে।' ঠিকানা দিল নীলাদ্রি। ভাবল, এমন কি হতে পারে যে-ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে সোহিনী, সে শুধু একলা সোহিনীর জানা!

ঠিকানা শুনে উৎফুল্ল হবার ভাব করল সুপ্রভাত। বললে, 'আমাদের সাবেক বাড়ি, এজমালি বাড়ির কাছে।' বলেই সোল্লাসে ডেকে উঠল : 'সোহিনী! সোহিনী!'

সোহিনী কি পাশের ঘরে একটু সাজগোজ করছে? তার আটপ্রহরের ধুলোবালির গায়ে মাখছে কি একটু সোনার রেণুর প্রসাধন?

ঠিক তাই। সিঁদুরে আর গয়নার স্পষ্ট হয়েছে সোহিনী। প্রখর হয়েছে তার শাড়ির বৈশিষ্ট্যে। হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকে বললে, 'আমার চিঠি পেয়েছ বুঝি—'

'হ্যাঁ, কিন্তু,' হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে নীলাদ্রি বললে, 'কিন্তু কি বিপদ লিখেছ—'

স্বামী-স্ত্রীতে হেসে উঠল। সোহিনী বললে. 'বসো, বলছি।'

নিশ্চিন্ত অনুভব করে বসল নীলাদ্রি। পাশের একটা সোফাতে বসে সোহিনী বললে. 'আমাদের তো তুমি ছেড়েই দিয়েছ, কোনো খোঁজখবরই আর নাও না। তাই যদি আমাদের বিপদ শুনলে তুমি একটু উৎসুক হও—'

এত ভণিতার কি প্রয়োজন! তাই একটু অসহিষ্ণু হয়ে নীলাদ্রি বললে, 'কি দরকার তাই বলো।'

'দুনিয়ায় দরকারই বুঝি সব?' দুঃসাহসে ভর করে তবু কথা বলছে সোহিনী।

'দরকার অদরকার, বলো না কি করতে হবে?' নীলাদ্রি ছটফট করতে লাগল।

উপায় নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যেরই মানুষ নীলাদ্রি। সুতরাং বলে ফেলাই ভালো। আর কিছু নয়, ব্ল্যাক থেকে কিছু চাল, চিনি, কয়লা যোগাড় করে দিতে হবে তোমাকে। নির্লজ্জের মত বলতে লাগল সোহিনী। কিছু কাপড়-চোপড়, মশারির থান, বিছানার চাদর, দুটো ছাতা। যা যখন জুটে যায় হাতের কাছে। আমরা আন্ধিসন্ধিও জানি না, জানলেও লোকবল নেই যে উদ্ধার করি। তুমি কৃতকর্মা, অসাধ্যসাধক। তাই তোমার কাছে শরণ নিচ্ছি—

'আর আমার সেই ওষুধটা?' সুপ্রভাত মনে করিয়ে দিল : 'প্রেসক্রিপশানটা দিয়ে দিও নীলুদাকে।'

'বলো, এ-সব বিপদ নয়?' সোহিনীর চোখেমুখে কাকুতির কালিমা।

'নিশ্চয়ই, একশোবার বিপদ।' একবাক্যে সায় দিল নীলাদ্রি, একটু ক্ষণ্টক্লেশ অপমান অনাদর গায়ে মাখন না। বললে, 'তুমি এক কাজ করো।

একটা লিস্টি করো, কি কি জিনিস আর কটা বা কতটা সমূহ দরকার। আর তাই বুঝে টাকা দাও।' লজ্জা ও পীড়া এবার দেখা দিল মুখে : 'আমার অবস্থা তো জানো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব গুছিয়ে-গাছিয়ে লিখে দাও নীলুদাকে, আর সম্প্রতি এই একশোটা টাকা দিচ্ছি।' পাশের শোবার ঘর থেকে টাকা নিয়ে এসে দিল সুপ্রভাত। বললে, 'তোমরা বসো। আমি একটু বেরুচ্ছি—' তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে চেঁচিয়ে উঠল · 'নীলুদাকে খাইয়ে দিতে কিন্তু ভুলো না।'

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সোহিনী শাড়িতে-গয়নায় উসখুস করে উঠল। বললে, 'নীলুদা, আমার দিকে তাকাও।'

নীলাদ্রি তাকাল। দু হাত থেকে সোনার চুড়ির গোছা খুলে ফেলেছে সোহিনী, চকিতে আঁচলে চুলেও কেমন অসাবধান হয়ে উঠেছে। বললে, 'নীলুদা, আমার কি শুধু অন্নবস্ত্রের ক্ষুধা?'

'জানি না।' সোফা থেকে ওঠবার আগেকার মুহূর্তে নীলাদ্রি তার দেহে প্রস্তুতির কাঠিন্য আনল : 'কিন্তু যার অন্নবস্ত্রের অভাব মিটে গেছে, মাথার উপরে জুটেছে যার একটি আচ্ছাদন তার আর কি ক্ষুধা থাকতে পারে ভেবে পাই না।'

'পাও, শুধু মুখে বলো না। অনেক ক্ষুধা, অনন্ত ক্ষুধা। আচ্ছা নীলুদা,' অযত্নকে এতটুকুও সংশোধন করছে না সোহিনী, আতুর চোখে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কি মনে করো আমি সুখী?'

'নিশ্চয়ই। এমন স্বামী এই ঘরদোর সচ্ছল-স্বচ্ছন্দ সংসার এ তো ইন্দ্রাণীর সুখ।'

'নীলুদা, আমার অন্তবে সুখ নেই।'

'অন্তরে সুখ ভাবলেই অন্তরে সুখ।' নীলাদ্রি উঠে পড়ল : 'আমাব বসবার সময় নেই, তোমার লিস্টিটা শিগগির লিখে দাও আর সেই প্রেসক্রিপশান—'

মৃত্তিকার প্রার্থনার মত ঋজু দেওদার গাছ যেন উঠে দাঁড়াল মাঠের মধ্যে। তন্ময় চোখে তাকিয়ে থেকে সোহিনী বললে, 'নীলুদা, তুমি আরো কত সুন্দর হয়ে উঠেছ।'

নীলাদ্রি হাসল, বললে, 'আমাকে তুমি সুন্দর দেখছ বলেই আমি সুন্দর। তেমনি নিজেকেও তুমি সুখী দেখ, পরিপূর্ণ দেখ, তা হলেই তুমি পরিপূর্ণ।' হাত বাড়াল নীলাদ্রি : 'লিস্টি দিতে হবে না, ও আমি মনে রাখতে পারব। কিন্তু প্রেসক্রিপশানটা চাই—'

'দিচ্ছি।' ত্বরান্বিত বিশৃঙ্খলায় উঠে পড়ল সোহিনী। পাশের ঘর থেকে প্রেসক্রিপশান নিয়ে এল: 'তুমি এক্ষুনি চলে যেও না, চা খেয়ে যাও।' ব্যাকুল হয়ে হাত ধরল নীলাদ্রির।

নীলাদ্রি সস্নেহে হাত ছাড়িয়ে নিল। সমস্ত উত্তাপ আর সৌরভ নিরোধ করল ধীরে ধীরে। বললে, 'সন্ধে হয়ে গেছে, অফিস থেকেই সটান এসেছি এখানে। পরে আবার যেদিন জিনিস নিয়ে আসব চা খেয়ে যাব।'

'তুমি আমাকে আর ভালোবাস না।' চোখে অভিমান ভরে বললে সোহিনী।

'এতক্ষণ পরে এই বুঝি তুমি সিদ্ধান্ত করলে?' নীলাদ্রি ভাঁজকরা প্রেসক্রিপশানটা পকেটে পুরল।

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে সোহিনী বললে, 'পরমারা নিচের ফ্ল্যাটে আছে—'

'পরমারা মানে?'

'পরমা আর তার প্রফেসর স্বামী নলিনেশ। কি, দেখা করে যাবে?'

'তুমি বলছ দেখা করে যেতে? ওদেরও কি দরকার?' নীলাদ্রি থামল এক পা।

'না, না,' শতমুখে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সোহিনী: 'না, ওদের দরকার নেই। এমনি বলছি কথার কথা। জিনিস পাও কি না পাও আবার এস কিন্তু। যদি পারো একটা চিঠি দিয়ে এস।'

কদিন পরে বিকেলে একটা থার্ড ক্লাস ছ্যাকড়া গাড়ি দাঁড়াল দোতলা ফ্ল্যাটের গলির মুখে। গাড়িতে করে এক বস্তা চাল ও এক বস্তা কয়লা নিয়ে এসেছে নীলাদ্রি। উঠল দোতলায়। দেখল বসবার ও শোবার ঘর নিয়ে ফ্ল্যাটের যে ভাগটা আলাদা তাতে সামনেই তালা ঝুলছে। রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ইত্যাদি নিয়ে আরেকটা যে ভাগ আছে, তাতে ভাঁড়ারটা বন্ধ, রান্নারটা খোলা। রান্নাঘরের এক পাশে শুয়ে ঠাকুর ঘুমুচ্ছে ও দুভাগের মাঝখানে যে চাতাল তাতে তাশ খেলছে বাড়ির চাকর ক্ষেত্র আর তার দলবল।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দেই কান খাড়া করেছিল ক্ষেত্র। খানিক পরেই বুঝেছিল এ-শব্দে ভয় পেয়ে খেলা ভেঙে দেবার কিছু নেই। এ আগন্তুক শব্দ।

'বাবু বা মা কেউ এখনো ফেরেননি।' শব্দটা সিঁড়ির মুখে আসতেই ক্ষেত্র ঘোষণা করল।

'কখন ফিরবেন?' নীলাদ্রি থমকে দাঁড়াল।

'কখন ফিরবেন বা কে আগে ফিরবেন কেউ বলতে পারে না।' হঠাৎ নীলাদ্রির দিকে চোখ পড়তেই ক্ষেত্রর ঠাহর হল। উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, 'ও, আপনি? চিনেছি আপনাকে।' তারপর গলাটাকে ঝাপসা করল · 'মাল এনেছেন?'

চাকরের ধবনটা কি রকম অদ্ভুত মনে হল। তবু নীলাদ্রি বললে, 'এনেছি।'

'আমি এ-বাড়ির চাকর। আমার কাছে রেখে যেতে পারেন।'

'না, বাবুরা কেউ আসুন। তাদের হাতেই দিয়ে যাব। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি। তোমরা বস্তা দুটো নামিয়ে রাখো।'

খেলা আর হল না। বন্ধ দরজার বাইরে একটা টুলের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল নীলাদ্রি। জীবনে এ তার ভঙ্গি নয়। কিন্তু কি করবে, যদি চাকরের দল মাল কিছু পাচার করে তাই পাহারা দেওয়া দরকার। নিজের মনেই হাসল একবার নীলাদ্রি। কার মাল কে পাচার করে আর কেই বা তার চৌকিদার!

'ও মা, তুমি এসেছ?' কলকল করে উঠল সোহিনী· 'তোমাকে বলেছিলুম একটা খবর দিয়ে আসতে। তুমি যেন কেমন!' হাতঘড়িব দিকে তাকাল, হিসেব করে দেখল সুপ্রভাতেবও ফিরতে বেশি দেবি নেই। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ল সত্যি-সত্যি কেন নীলাদ্রিব আসা 'কি, পেয়েছ কিছু?' চাবি দিয়ে তালা খুলল সোহিনী।

নীলাদ্রি রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করল।

দেখে এসে আহ্লাদে দশখানা হয়ে পড়ল সোহিনী। নীলাদ্রির হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে তাকে সোফায বসিয়ে দিলে। বললে, 'ইচ্ছে করলে তুমি কি না করতে পারো। শুধু আমাব বেলাযই কিছু করলে না। আমাকে কাঙালিনী করে রাখলে।'

'তোমাকে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী কবেছি।' ভবাট গলায় বললে নীলাদ্রি।

'বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই মর্তে সীতা। আর যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ।'

'আর হ্যাঁ, এই নাও সেই ওষুধ।' পকেট থেকে প্রেসক্রিপশান আর ওষুধ বার করল নীলাদ্রি। কথা ঘুরিয়ে দিতে চাইল।

কিন্তু কথা আবার ফিরিয়ে আনে সোহিনী। বললে 'এত তুমি করছ এর তুমি কোনো দাম নেবে না?'

'দাম তো অনেক আগে থেকেই নেওয়া হয়ে আছে। এ আমি তো

শোধ দিচ্ছি।' নীলাদ্রি উঠে পড়ল। বললে, 'তোমার ছুটি হয়ে গেলেও আমার এখনো ছুটি হয়নি। আমাকে আবার এখন অফিস ছুটতে হবে।'

'কে বললে আমার ছুটি হয়ে গেছে?' গভীর বিলোল কটাক্ষ করল সোহিনী: 'আমার ছুটির এখনো ঢের বাকি।' তবু নীলাদ্রিকে চলে যেতে দেখে আবার দরজার কাছে ঘেঁসে এল: 'তোমার আজও কিছু খাওয়া হল না। বলো আবার কবে আসবে?'

'শুক্রবার। সেদিন কিছু কাপড়চোপড় পাবার কথা আছে।'

'ঠিক এস। জিনিস পাও কি না পাও লক্ষ্যও করো না। আর দেখ,' হাতঘড়ির দিকে সোহিনী তাকাল আরেকবার সময়ের ব্যবধানের আবার হিসেব করল, তারপর স্বর গাঢ় করল: 'আর দেখ ঠিক দুক্কুরবেলায় এস। অনেকক্ষণ সময় হাতে নিয়ে। সেদিন খেতে হবে কিন্তু।'

'তাই আসব।' দ্রুত পায়ে চলে গেল নীলাদ্রি।

সুপ্রভাত বাড়ি এলে সৌভাগ্যের সূচীপত্র খুলে ধরল সোহিনী। সরু ধবধবে চাল আর, সত্যি, মিছবির তালের মতই কয়লা। আর এই দেখ তোমার ওষুধ।

খুশিতে উজ্জ্বল হল সুপ্রভাত। বললে 'আমার সঙ্গে দেখা হল না। আবার কবে আসবে বলেছে?'

'দিনক্ষণ কিছু বলে যায়নি। কিছু কাপড়চোপড় পাবার কথা আছে, বলেছে পেলেই চলে আসবে একদিন।'

জনান্তিকে ক্ষেত্রকে ডাকল সুপ্রভাত। জিগগেস করল, 'আবার কবে আসবে বলেছে?'

গলাটা লম্বা করে প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ক্ষেত্র ফিসফিসিয়ে বললে, 'শুক্কুরবার। ঠিক দুক্কুরবেলা।'

শুক্রবার, দুপুরবেলা ঘড়িঘণ্টা ঠিক করা ছিল না। নীলাদ্রিই আগে এসে পড়ল। শাড়ি-শার্টিংএর নমুনা কিছু এনেছে সঙ্গে করে, যদি পছন্দ হয়। এসে দেখল সোহিনী তখনো ফেরেনি। এ-ভাগের দরজায় তালা মারা, ও-ভাগের দরজায় ছিটকিনি তোলা। চাকরদের তাশ খেলার আড্ডা আজ বসেনি। নিঝঝুম বাড়িঘর। শুধু চাতালে টুলটি রাখা আছে সন্তর্পণে।

কাপড়ের বাণ্ডিলটা টুলের উপর রেখে পাইচারি করতে লাগল নীলাদ্রি। একটু আগেই বোধহয় এসে পড়েছে। কি করবে, আজ অফিসে এই সময়টাই অবসর।

কতক্ষণ পরেই সোহিনী এসে হাজির। রোদে-গরমে ধৈর্যে-আবেগে

দজ হচ্ছে বেশে-বাসে। 'জানি এসেই তোমাকে দেখতে পাব। তবু কি রকম ছুটেছি দেখ না।' হাসিতে-খুশিতে উছলে পড়ছে ঝলক দিয়ে। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চাবি খুজতে লাগল সোহিনী। বললে, 'জানো, তোমার জন্যে আজ স্কুল পালিয়েছি আমি।'

'আমার জন্যে, না শাড়ি-শার্টিংএর জন্যে?'

'তাই বটে?' তালায় চাবি পরাল সোহিনী . 'দাও না শাড়ি-শার্টিং বাইরে ছুঁড়ে। কে চায় ওসব জঞ্জাল?'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পাখাটা খুলে দিল সোহিনী। কাপড়ের বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে নিয়ে নীলাদ্রি তাকে অনুসরণ করল। সোফায় বসে কাগজের মোড়কটা সরিয়ে নীলাদ্রি বললে, 'এই দেখ, এরকম শাড়ি, এ তোমার পছন্দ?'

মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসে আলস্যে একটু শিথিল হল সোহিনী। বললে, 'ও কে দেখে? যাকে সাজাবে বলে নিয়ে এসেছ, তাকে দেখ। বলি, সে তোমার পছন্দ?'

'সে আমার পছন্দ-অপছন্দের বাইবে। সে আমাব সোহিনী—শোভিনী। চিরন্তনী।'

'সোহিনী মানে তো সোহাগিনীও হয়, তাই না নীলুদা?'

'সে তুমি তোমার স্বামীব সোহাগিনী বলে।'

'আচ্ছা, নীলুদা, আমাকে তুমি পাওনি বলে তোমাব দুঃখ হয় না?'

নীলাদ্রি অবাক হবার ভাব করল। বললে, 'কে বললে তোমাকে পাইনি? তোমাকে না পেলে কি তোমার কাছে আসতে পারি, বসতে পারি, তোমার দুটো উপকার করে দেবার অধিকার পাই দুহাতে?'

সোহিনীর চোখ ছলছল কবে উঠল। বললে, 'নীলুদা এত অল্প তোমার আকাঙ্ক্ষা?'

'অল্প হতে যাবে কেন? আমার তো কুশলের আকাঙ্ক্ষা। কুশলেব আকাঙ্ক্ষা কি কখনো অল্প হয়? তোমার ভালো হোক, তোমার সুখ হোক এ কি কখনো আমি ছোট করে, অল্প করে বলতে পারি?'

সোজা হয়ে উঠে বসল সোহিনী। বললে, 'আগে ভাবতাম নীলুদা, তুমি উদাসীন, পরে মনে হত তুমি নির্মম, এখন মনে হচ্ছে তুমি দুর্বল, তুমি ভীরু—'

'ভীরু?'

'তা ছাড়া আবার কি।' বাইরের খোলা দরজাব দিকে একবার তাকাল

সোহিনী : 'আমি এখন কত স্বাধীন, কত নিরাপদ, অথচ তোমার একটুও সাহস নেই।'

'আমার সাহস নেই?' যেন ঘা খেল নীলাদ্রি, এমনি নিশ্বাস ফেলল। বললে, 'আমার সাহস ছিল বলেই তো আবার দেখতে পারলাম তোমার মুখ, নিজের মুখও দেখাতে পারলাম তোমাকে। সেই সেদিন আমার কাছে তুমি চিরদিনের মত ঘৃণিত হয়ে যেতে চেয়েছিলে, আমি সেই অপমৃত্যু থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছি—শুধু তোমাকে নয়, নিজেকেও। সেই আমার সাহস। আর সেই সাহসেই উজ্জ্বলের সামনে দাঁড়িয়েছি উজ্জ্বল হয়ে।'

সোহিনী চাঞ্চল্যে মর্মরিত হয়ে উঠল। বললে, 'নীলুদা, কথা ছাড়ো। আমি উজ্জ্বল নই, আমি মলিন। আমার আর যা-ই থাক বা যতই থাক, আমি তুমি ছাড়া অপূর্ণ -'

নীলাদ্রি উঠে পড়ল। বললে, 'সেই অপূর্ণতাই প্রাপ্তি। মিলনের মূর্তি ক্ষণিকের মূর্তি, কিন্তু বিরহের মূর্তি শাশ্বত শুভ্রতা দিয়ে তৈরি। সে-মূর্তি ভাঙে না, মোছে না, দাগ ধরে না শীতে গ্রীষ্মে, রোগে-জরায় সব সময়েই নিটুট থাকে, নিখুঁত থাকে। সে কি, কথাই বলবে শুধু, এক গ্লাস শরবত বা এক কাপ চা খেতে দেবে না?'

'দিচ্ছি, চাকরটা যেন কোথায় গেছে। এক কাজ করো নীলুদা।' সোহিনী নীলাদ্রির হাত ধরল, অনুনয়ের সুর মিশিয়ে বললে, 'তোমার তো হাতে ঢের সময় আছে, শোবার ঘরে চলো। সেখানে বিছানায় বিশ্রাম করো, আমি তোমার জন্যে চা করে আনি- '

'কেন, ক্ষেত্তর এখনো আসেনি?' পাশের ঘর থেকে, অন্ধকার শোবার ঘর থেকে সুপ্রভাত কথা কয়ে উঠল।

এক দোয়াত কালো কালি কে ঢেলে দিল সোহিনীর মুখে। তার রঙ-রোদ, রাগরাগিণী সমস্ত এক নিমেষে উবে গেল। তালাবন্ধ অন্ধকার ঘরে কি করে আসতে পারল, থাকতে পারল সুপ্রভাত! বাইরে থেকে ঢোকবার আর তো কোনো দ্বিতীয় পথ নেই। বাথরুমের দরজা দিয়ে? সে তো সব সময় ভিতর থেকেই খিল দেওয়া, জমাদার এলে একবার তা খুলে দেওয়া হয়—সে তো রোজ সকালে। আর আজ সুপ্রভাত বেরিয়ে যাবার পর সোহিনী বেরিয়েছে, আর সে-সময় সমস্ত খিল ছিটকিনি যে আটকানো ছিল, এতে সে নিঃসন্দেহ। তবে কি শোবার ঘরের জানলা ভেঙে ঢুকেছে, নিচে থেকে পাইপ বেয়ে?

কে জানে কি।

এত বড় ভয়ের সামনে কোনোদিন দাঁড়ায়নি সোহিনী, যখন সুপ্রভাত বেরিয়ে এল নিজের থেকে। যেন কিছুই জানে না, কিছুই শোনেনি—দেখেনি, যেন এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, এমনি ভাব করে পরিষ্কার মুখে বললে, 'ক্ষেত্তরটা কোথায় গেল বলো তো?'

সোহিনী কথা বলল না, মুখ তুলল না কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর নীলাদ্রি আস্তে আস্তে দু-পা এগিয়ে এল দরজার দিকে।

'অফিসে শরীরটা খারাপ হল বুঝে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম বাড়ি।' যেন সুপ্রভাতই অপরাধী, তারই ব্যাখ্যাবর্ণনা দরকার · 'দরজা খুলে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। খোলা তালাটা কড়াতে ঝুলছিল বাইরে, তাড়াতাড়িতে তার মুখের চাবিটা তুলে নেওয়া হয়নি। আর বুদ্ধিমান চাকর, ভেবেছে বাবু বুঝি ভুল করে চাবি না দিয়েই বেরিয়ে গেছেন বাড়ি থেকে। একবার ভেতরে উঁকি মেরে দ্যাখ কি অবস্থা, তা নয়, তালায় চাবি ঘুরিয়ে দিব্যি চলে গেছেন আড্ডা দিতে। এদিকে আমি যে আমার নিজের ঘরে বন্দী, তা আর ওর খেয়াল নেই।'

সোহিনী ভিতরে-ভিতরে থরথর করে কাঁপছে, এত গরমেও তার শীত করছে, আশ্চর্য সে নড়তে-চলতেও পারল না, বসে পড়ল, ভেঙে পড়ল সোফায়। দু হাঁটুর উপর দু কনুই রেখে বদ্ধ আঙুলের উপর চিবুক রেখে গুম হয়ে রইল।

দরজার কাছ বরাবর এসে নীলাদ্রি বললে, ঘরের মধ্যে কে আছে না আছে কোনো দিকে না তাকিয়ে, 'আর দুটো জিনিস এখনো বাকি—মশারি আর দুটো ছাতা। দেখি যোগাড় হয়ে যাবে হয়তো।'

তারপর বাইরে বেরিয়ে আবার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে · 'আবার যদি কখনো দরকার হয়—'

'ভদ্রলোককে ডাকো।' সুপ্রভাত অস্থির হয়ে বললে, 'বা ভদ্রলোকের কি দোষ!'

পাষাণীভূত হয়ে রইল সোহিনী।

'বা, শরবত কিংবা চা করে দাও। বোঝা বয়ে কতদূর থেকে এসেছেন শ্রান্ত হয়ে। ডাকো। বিশ্রাম করতে বলো বিছানা পেতে দাও।'

দু হাতের আঙুলগুলি মেলে ধরে তাতে মুখ ঢাকল সোহিনী।

শুনতে পেল নীলাদ্রির নেমে যাবার শব্দ।

নেমেই বা কোথায় যায় এখন নীলাদ্রি? বিপদে রক্ষা করবে সোহিনীকে, এ সে তাকে কোন বিপদের মুখে রেখে গেল? একেবারে না এলেই পারত! বিচ্ছেদের পর এই তো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, কেউ

কারু খবর রাখে না, মুখ-দেখাদেখি থাকে না পর্যন্ত। কেন তার এই স্পর্ধা হতে গিয়েছিল যে, সে নিরভিমানে সোহিনীর উপকার করবে, এবং সোহিনী যাকে নির্দিষ্ট করবে, তার। খুব উপকার সে করে দিয়ে এসেছে। যে অহঙ্কার করে এমনি করেই সে গুঁড়ো হয়ে যায়।

আর কোনোদিন যেন দেখা করতে না ছোটে। হিসেব করে যে টাকাটা বাঁচবে তা যেন পাঠিয়ে দেয় মনি-অর্ডারে।

পরমা না জানি কেমন আছে। একবার তাকে দেখে গেলে কেমন হয়!

এই বুঝি পরমাদের ফ্ল্যাট। গলি দিয়ে বাইরে এলেই খোলা রাস্তার উপর সদর। মন্দ কি, একবার উঁকি মারি। দেখি সে কেমন স্বাধীন, সে কেমন নিরাপদ!

এ-ফ্ল্যাটেও ঢুকতেই প্রথমে বসবার ঘর, পিছনে শোবার। বসবার ঘরের দরজা খোলা। যায় কি না যায় ঘুরঘুর করতে লাগল নীলাদ্রি।

ঘরের মধ্যে নলিনেশ বসে আছে আর তার মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসে আছে একজন মহিলা। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। ঘরটা কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া, বিরলভূষণ। সোফা-গালচে কিছু নেই, একটা শাড়ি সেলাই করে পর্দা। কটা তক্তার কটূক্তি। এই দারিদ্র্যের মাঝখানে ঐ সম্ভ্রান্ত মহিলাটি কে? টেবিলের উপর যখন তার হাত-ব্যাগটা আছে, তখন নিশ্চয়ই সে পরমা নয়, সে বাইরের লোক। তাছাড়া এ পরমার চেয়ে অন্যরকম, গায়ে এর ভাবি বয়সের ঢেউ।

কিন্তু ভরদুপুরে নলিনেশ বাড়ি কেন? সুপ্রভাত না-হয় মাথার ব্যথার দরুন অফিস পালিয়েছে কিন্তু নলিনেশের কলেজ কি আজ ছুটি? এ তো কলকাতা, এখানে নলিনেশের কলেজ কোথায়? একবার বন্ধক তো চিরকাল বন্ধক, তেমনি একবার মাস্টার তো চিরকাল মাস্টার। কলকাতায় এসে খোলা পায়নি কোনো কলেজ?

'আসুন আসুন নীলুদা ' নলিনেশ চিনতে পেরেছে।

যে মহিলাটি উপস্থিত ছিলেন তাঁকে উদ্দেশ করে নলিনেশ বললে, 'এই সেই নীলুদা যার কথা বলছিলাম তোমাকে, যিনি সেদিন উকিল ধরিয়ে জামিন পাইয়ে দিয়েছিলেন যিনি সেদিন বাধা দিয়েছিলেন শহীদ হতে—'

যাক, সুর ঠিক ধরতে পেরেছে নীলাদ্রি, যেহেতু তার মুখে রসিকতার হাসিটি এখন ফুটন্ত। নীলাদ্রি বললে 'পরমা কোথায়?'

মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করে নলিনেশ বললে, 'ইনিও এসে এই প্রশ্ন

করছিলেন। পরমা আমার কাছেই আছে, আমাকে এখনো ত্যাগ করেনি, তবে—'

'বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ, না, সম্প্রতি বাইরে বেরিয়েছে একটু। বেশি দূরে নয় হয়তো, এই কাছেই, কাস্টমস অফিসের বাসুদেব ব্যানার্জির বাড়িতে। তিনি একটা মেয়ে-ইস্কুলের কর্তা, যদি সেখানে পরমার একটা চাকরি হয়—'

'তাহলে চাকরির সন্ধানে বেরিয়েছে বলো।' ভদ্রমহিলা ফোড়ন কাটল।

'কি আর করা! আমি যখন বেকার!' পাঁজরভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নলিনেশ।

এ আবার আরেক কাহিনী। জলছাড়া মাছের মত অস্বস্তি লাগতে লাগল নীলাদ্রির। দোরগোড়ায় সাইকেলটা তার আছে এই তার একমাত্র আরাম।

নলিনেশ বললে, 'বসুন না। বোধহয় বেশি দেরি হবে না। লোক নেই, নইলে আনতাম ডাকিয়ে।'

'আরেকদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।' নলিনেশ সাইকেলটাকে চেনমুক্ত করল, তারপর চলে গেল একটানা।

মহিলাটি ঠেস দিয়ে বললে, 'এমন বিয়ে করলে যে, তোমাকে একেবারে নিষ্কর্মা বেকার করে দিল!'

'আর বোলো না। একেবারে সর্বস্বান্ত।'

'কত তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কত বড়ফট্টাই, কত লম্বাইচওড়াই, কিছুতেই বিয়ে করব না। বিয়ে করা মানেই হ্যানো, বিয়ে করা মানেই ত্যানো—' মহিলা জিভের সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গিটাও বাঁকা করল: 'বিয়ে যে করে সে অমুক, বিয়ে কর সে তমুক—কত তো কংগ্রেসি বক্তৃতা—সব ভেসে গেল।'

'সব।'

'কি দুর্বার সেই শক্তি মেয়েটার একবার দেখলে হয়!' মহিলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নলিনেশের চোখের মধ্যে: 'কি দেখে ভুললে!'

'কিছু না। রজনীগন্ধার ডাঁটের মত রিক্ত একটা মেয়ে, উপরের দিকে একথোপা সাদা ফুল, চুল আর চোখ আর ভুরু—কি যে দেখলাম কে জানে। যে দেখাল, সে-ও জানে না কি দেখাল!'

'তুমি একটা ঝানু মাস্টার আর ও তোমার কাঁচ ছাত্রী—' জিভ তো নয়, যেন বেত তুলল মহিলা।

কাতর মুখ করে নলিনেশ বললে, 'এসব কথা অনেক হয়ে গিয়েছে, অনেক অনেক। দয়া করো, তুমি আর ওকথা তুলো না।'

টেবিলের উপর রাখা তার হাত-ব্যাগের স্ট্র্যাপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে মহিলা বললে, 'তোমার তো কত চুলচেরা বিচার, যাকে তুমি বলতে যাথার্থ্যনিরূপণ, কত তোমার যান্ত্রিক বাস্তব বুদ্ধি, হিতাহিত তোল—কিছু দিয়েই রুখতে পারলে না নিজেকে?' এ তিরস্কার না অভিমান কে বলবে?

নলিনেশকে কেমন হতাশের মত শোনাল: 'নিজেকে পারলেও ওকে পারলাম না। আমি তো ভিজে কাঠ, কিন্তু ও দুর্দান্ত আগুন। কতটা আগুন হলে ভিজে কাঠ তার সমস্ত শৈত্য, শব্দ ও ধোঁয়ার পর বিশুদ্ধ জ্বলে উঠতে পারে, তুমিই বোঝ—'

'বুঝেছি। সব সুবোধেরই এক গোয়াল।' রাগে যেন আরো একটু স্পষ্ট হল মহিলা: 'এক চিলতে একটা পুঁচকে মেয়ের কাছে হেরে গেলে?'

'তোমাকে কি বলব, অনেক কসরত করেছি—অনেক প্রক্রিয়া, তবু কিছুতেই পারলাম না। যখন অকূলপ্লাবন বন্যা আসে, তখন সব বাঁধই বালির বাঁধ হয়ে যায়।'

'আমি এই ধসে-যাওয়া, গলে-যাওয়া বাঁধ দেখতে আসিনি।' বললে সেই মহিলা, তার ব্যাগের স্ট্র্যাপটা নাড়তে-নাড়তে: 'সেই বন্যা-কন্যাকে দেখতে এসেছি।'

এ যেন রাগ নয়, এ যেন বিদ্বেষ। যা এই মহিলা করতে পারেনি, কোনো মহিলাই করতে পারেনি তা এক মফস্বলের নিষ্পালিশ নিরীহ মেয়ে করতে পারল, এ যেন কিছুতেই সহ্য করা যাচ্ছে না গা পেতে। এ শুধু নলিনেশের হার নয়, সমস্ত সূর্যমুখীর হার। সমস্ত বয়স্ক ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মুখে চুনকালি আর যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়েও জয়ী হয়, গুণে নয়, খাতিরে প্রাধান্য পায়, তার প্রতি রোম যেন কিছুতেই নিবতে চায় না। তুষের আগুনের মতই জ্বলতে থাকে।

'শুধু বিধ্বস্ত বাঁধই নয়,' নলিনেশ আচ্ছন্নের মত বললে, 'তার পরেকার এই সারশূন্য শস্যশূন্য মাঠটাও দেখ। দেখ না এই কি হয়ে গেছি'

'কি হয়ে গেছ?' একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বোধ হয় মহিলা। একটা ছেঁড়া-বোতাম পাঞ্জাবির নিচে গর্তওলা গেঞ্জির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দুদিন যে দাড়ি কামায়নি, তা যেন শুধু আলস্যের নয় দৈন্যের প্রতীক। ঔদাস্যের আরেক মানে যে বিরক্তি, তা যেন চার পাশে পরিস্ফুট।

কি হয়ে গিয়েছ! মহিলার সুরে একটু কি করুণার সুর লাগল? ঘৃণার বদলে একটি মানবিক আবেদন?

তবে শোনো, তারপর কি হল।

মণিলাল যখন মামলায় কাবু করতে পারল না, কলঙ্কের ধুলোয় যখন পারল না ধাঁধিয়ে দিতে, তখন জাত মারতে চাইল, তার মানে ভাত মারতে চাইল। সংসারে যার ভাত নেই, তারই জাত নেই।

কলেজ-কমিটিতে নালিশ নিয়ে গেল মণিলাল। পাঠদ্দশায় যে শিক্ষক ছাত্রীকে নিয়ে সরে পড়ে, সে কলেজের শিক্ষক থাকতে অনুপযুক্ত, তার চরিত্র আদর্শের অপঘাত। সরে পড়া কি বলছেন, বিয়ে করা, সুষমার মধ্যে আশ্রয় পাওয়া। সমস্ত রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হয়েও সমাজে আবদ্ধ থাকা। ওসব তত্ত্বকথা ছাড়ো। কমিটি বললে, যা লটপট করেছ, সমস্ত শহরে ঢিঢিক্কার। ভালোয় ভালোয় কাজে ইস্তফা দাও। তারপর যথা ইচ্ছা তথা যাও।

মুখ কাঁচুমাচু করে নলিনেশ বললে, 'কাজে ইস্তফা দিলে খাব কি?'

'ওরকমভাবে বলবার কি হয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার মত?' পরমা ধমকে উঠল: 'বলোগে, যখন বিয়ে হয়েছে, তখন পরমা ছাত্রী নয়, তখন সে বেরিয়ে এসেছে কলেজ থেকে, তখন সে বিত্তে বয়সে সর্বঅর্থেই সাবালিকা, তখন সে ছুকরী নয় ধাড়ি, মেয়ে নয় মহিলা। বলোগে, কি মিনিমুখোর মত থাকো?'

নলিনেশ কমিটিতে নিজেই সওয়াল কবলে। পরমার যুক্তি একটাও বাদ পড়ল না।

কমিটি বললে, ওটা টেকনিক্যাল যুক্তি। আসলে ঘনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতার কালক্রম কলেজে থাকাকালীন। অর্থাৎ মতিচ্ছন্ন ব্যবহারটা করেছ পড়াতে-পড়াতে। ডিম যখনই ফুটুক, তা দিয়েছ পড়ার টেবিলে। সুতরাং আদর্শের দিক থেকে এ নিন্দনীয়।

'এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে কলেজের কোনো মাথাব্যথা নেই।' নলিনেশ বললে।

'কারু মনঃপীড়া, কারু শিরঃপীড়া।' কমিটি প্রত্যুত্তর করল 'আসলে কলেজের সুনামে দাগ পড়বে। যে দেখবে, সেই বলবে, এই সেই গুণধর। একটা শুধু কথাই হেঁটে বেড়াবে সারাক্ষণ, এই কলেজের মেয়েরা মাস্টারের সঙ্গে ধৃষ্টতা করে আর মাস্টাররা ছাত্রীর সঙ্গে ইয়ারকি দেয়। মেয়েরা সন্ত্রস্ত হবে, অভিভাবকেরা কুণ্ঠিত, আর সৎ শিক্ষকেরা লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে না। সুতরাং কথা বাড়িও না। লেজ গুটোও। একটা খতমী দরখাস্ত ঝাড়ো।'

'চাকরি ছেড়ে দেওয়া মুখের কথা?' পরমা গর্জে উঠল: 'বিশেষত [illegible]ত্ব হবার দায়িত্ব নেবার পর?'

'অসম্ভব।' সায় দিল নলিনেশ।

যদি নিজের থেকে না ছাড়ো আমরা তাড়িয়ে দেব। কমিটি ঘোষণা করল।

কোন আইনে?

গণতন্ত্রের আইনে। ভোটের জোটে। গভর্নিং বডির সমস্ত সভ্যই হাত তুলেছে তোমার বিরুদ্ধে। অপরাধ? প্রফেসন্যাল মিসকন্ডাক্ট। চাকুরিগত অপপ্রয়োগ। উকিল যদি তার মক্কেলনীকে বিয়ে করে, অর্থ গ্রাস করতে এসে যদি অর্ধ গ্রাস করে বসে অর্ধাঙ্গিনী বানায়, তা হলে কি আইনের আওতায় পড়ে, না, তার সনদ বাতিল হয়? তেমনি মাস্টার যদি বিদ্যাদান করতে এসে প্রাণ দিয়ে ফেলে, মাইনে নিতে গিয়ে যদি হাতখানাও পকেটস্থ করে, তাহলে কেন তার চাকরি যাবে? দস্তখত বিনে যেমন দলিল মিথ্যে, তেমনি চাকরি বিনে জীবন মিথ্যে।

কিন্তু কমিটির ধ্বজার মুষ্টি কিছুতেই শিথিল হল না। যা করবার করো, চাকরি থেকে ডিসচার্জ করে দিল নলিনেশকে।

'এই অত্যাচার তুমি সইবে?' পরমা দাউ-দাউ করে উঠল।

'কিন্তু কি করব?' নলিনেশ তার পুঁথিপত্রের পাহাড়ের দিকে সাদা চোখে তাকিয়ে রইল।

কি করবে? পরমা গেল কলেজে একটা ধর্মঘটের ধ্বনি তুলতে। কিন্তু কারুরই গা বিশেষ গরম হল না। ছেলেরা সিঁদুর দেখে ইঁদুর হয়ে গেল আর মেয়েরা বেজি। ছেলেদের নৈরাশ্য মেয়েদের হিংসে। যদি সাদা সিঁথিতে আসতে, সমতল ভাবতুম, কাঁধে কাঁধ মেলাতুম, ধুমুল দিতুম। আমরা ঘরপোড়া গরু আর তুমি এখন সিঁদুরে মেঘ। তাছাড়া তুমি আর এখন আমাদের কলেজের ছাত্রী নও।

'ও! এবেলায় আমি আর এখন কলেজের ছাত্রী নই!' পরমা টিটকিরি দিয়ে উঠল 'কিন্তু উনি তো তোমাদের প্রোফেসর!'

অরণ্যে রোদন সার। ছাত্র-ছাত্রীর দল মুখ ফিরিয়ে নিল।

সারা বছরের ধুমধাম একদিনে শেষ হয়ে যাবে? এর কোনো বিহিত হবে না?

নলিনেশের গায়ে ঠেলা মারল পরমা। বললে, 'ওঠো, মামলা করো।'

'মামলা করলেই গামলা-গামলা খরচ।' বললে নলিনেশ।

'হোক খরচ। টাকা আমি দেব।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমার টাকা তবে আছে কি করতে?'

চেক-বই বের করল পরমা। জীবনে প্রথম চেক কাটল। আর তা নলিনেশের বরাবর। বীরাঙ্গনার মত বললে, 'যাও, অন্তত চেকটা ভাঙিয়ে নিয়ে এস। তারপরে উকিলের বাড়ি দুজনে যাব একসঙ্গে।'

'উকিল পাব না এখানে।' নলিনেশ আবার ঠাণ্ডা জল ছুঁড়লে।

'যদি না পাই কলকাতা থেকে আনব। সামনের কাক না আসুক দূরের কাক আসবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না।'

যে ছিল অধরা মাধুরী, জীবনের কুহকিনী দুরাশা, সে এখন মামলার তদবিরকার হয়ে উঠল। একবার নিয়ে গিয়েছিল ফৌজদারিতে, এখন ডোবাল দেওয়ানির দ'কে। মাঝখানে কলেজ কমিটির সঙ্গেও কম ঝাপটাঝাপটি গেল না। বিয়ের ব্যাপারে নোটিশ ও রেজেস্ট্রি নিয়েও মুৎফরাক্কা অনেক। বিয়ের দরুন যদি শুধু নালিশ-মোকদ্দমাই করতে হয় তাহলে রোমান্সে রোমাঞ্চ আর থাকবার নয়। প্রেমের বেলা যদি শুধু খাজনা দিতে দিতেই বয়ে যায় তাহলে বাজনা বাজবে কখন?

দুজনের এখন কথা হচ্ছে মামলার পরের তারিখ কবে আর কোন তদবিরটা করতে হবে এবং কিভাবে। উকিলের বাড়ি যাও, দফায়-দফায় টাকা দাও, একটা দরখাস্ত করতে হলে দশটা তার নকল করো নকল বিবুদ্ধ পক্ষের উকিলের বাড়ি গিয়ে দিয়ে এস, আর মামলার ডাক পড়ে কি না-পড়ে সারাক্ষণ বসে থাকো বারান্দায়। উকিলের কায়দাই হচ্ছে ভুল তারিখ দিয়ে বেকায়দায় পয়সা নেওয়া, তাই কজ-লিস্ট ঘেঁটে নিজেই তারিখ সংগ্রহ করো আর তা নিতে পেশকারের হাতে কিছু গুঁজে দাও। এদিকে ওদিকে আরো কত যে আছে কাঙালের হাত, অন্ত নেই। হাকিমের আরদালিও তাক বুঝে নাক নাচায়। জেরবার হয়ে গিয়েছে নলিনেশ।

'আর নয়, এবার চলো কলকাতায় যাই।' বললে নলিনেশ।

'মামলা?' যেন বুকের হাড় এমনি পরমা চেঁচিয়ে উঠল।

'জাহান্নমে যাক। কতদিনে শেষ হবে তার ঠিক নেই। আর শেষ হলেও নিষ্পত্তি আছে নাকি? এখানে হলেও, আপিল আছে, তারপর তস্য আপিল, প্রপিতামহ-আপিল। চূড়ান্ত হবার আগেই আমরা চূড়ান্ত হয়ে যাব, চাকরি পাবার আগেই পেয়ে যাব লাকড়ি।'

'না, না, অবিচারের প্রতিকার চাই।' মুখস্থ বুলির মত বলে উঠল পরমা।

'তার জন্যে অনির্দিষ্ট সময় চুপচাপ বসে থাকতে হবে?' বিরক্তির

সুরে বললে নলিনেশ: 'রোজগারের পথ দেখতে হবে না? এখানে একটা টিউশানি পর্যন্ত নেই। যা দুটো সামান্য পয়সা আছে তাই তুলে তুলে খাব আর মামলার খোরাক না হাতির খোরাক জোগাব এ অসম্ভব বুদ্ধি। নাও, ওঠো, প্যাক করো, এবার আমি তাড়া দিচ্ছি, তবে এই পালানোর জন্যে রাত্রের ট্রেনের দরকার নেই।'

'না, তা কি করে হয়? মাঝপথে এসে মামলা ছেড়ে দেব?' বিয়ের ব্যাপারে জিতেছে, মামলার ব্যাপারেও জিতবে, এই প্রগাঢ় বিশ্বাস পরমার। বিয়ের পরে সারা শহর ডঙ্কা মেরে বেড়িয়েছে, চাকরি ফিরে পেয়ে কমিটির সকল সভ্যকে মায় তার মামাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে। পরমার কাছে জয়ের জৌলুসেরই যেন বেশি দাম। কিন্তু এই কি সেই জয়ের চেহারা? জীবিকা নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, চারদিকে বদান্য নয়নের প্রসন্নতা নেই, কর্মহীনতার নাগপাশে বাঁধা থাকবে নির্জীব হয়ে, এ অসহনীয়। পরমার ইচ্ছে, তাই থাক, সবাইকে দেখিয়ে বেড়াও, আমরা খাসা আছি, বেশ আছি, আমাদের কিছু অসুবিধে হচ্ছে না, আমরা আমাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে সকলের মুখের উপর তুড়ি মেরে আবার বহাল হব স্বস্থানে। অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে ফেললে এই জয়ের স্ফূর্তি পাব কোথায়? শুধু কৃপণ জীবিকাই সম্বল, জয়ের প্রত্যাশায় তপস্যা করা কিছু নয়?

এই নিয়ে বিরোধ বাধল দুজনে। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হল এই শহরের বাসা তুলে দিয়ে দুজনে কলকাতা গিয়েই থাকবে, সোহিনীদের বাড়ির নিচের ফ্ল্যাটে এবং সেখান থেকেই মামলার যোগান দেবে। অন্যত্র চাকরির সংস্থান দেখবে আর শেষ পর্যন্ত যদি মামলা পায় অর্থাৎ যদি জেতে তখন বিবেচনা করে দেখবে ওখানে ফিরে গিয়ে কমিটির বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে কিনা। ইতিমধ্যে কলকাতায় যদি ভালো একটা কিছু জুটে যায় কপালগুণে—

'কপালগুণে?' পরমা ঠাট্টা করে উঠল। তার মানে নিজে কিছু চেষ্টা করবে না? চিরাচরিত আলস্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে?

'কপালগুণ ছাড়া আর কি। তোমার কপালগুণ!' দুই চোখে স্নেহ আনতে চাইল নলিনেশ 'সকলেই সিঁদুর পরে, কপালগুণে ঝলক মারে। দেখ তুমি পারো কিনা মারতে। আর জানো তো তোমার গরবে গরবিত আমি রূপস তোমার রূপে।'

একটুও হাসল না পরমা। কলকাতায় আসার পর থেকে তার মুখে আর হাসি নেই। রৌদ্রের নীলে আকাশে-ওড়া পাখির পাখার রুপোলি

স্ফূর্তি নেই ওর মধ্যে, এখন শুধু ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানার দাসত্বের ক্লান্তি।

'আর আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।' মহিলাকে উদ্দেশ করে আগের কথায় ফিরে গেল নলিনেশ: 'দেখ এই কি হয়ে গেছি!'

'কেন, চাকরি জোটেনি কিছু?' জিগগেস করল মহিলা।

'বৈষ্ণবের শোভা যেমন কপনি তেমনি মাস্টারের শোভা টিউশান। সকালে-বিকেলে দুটো টিউশান শুধু জুটেছে, মূল কোনো চাকরি নেই। এক কলেজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে বলে আরেক কলেজ নিচ্ছে না হাত বাড়িয়ে। পরমা বলছে অন্য চাকরি দেখ, অন্য চাকরি মানে কেরানিগিরি। বোঝো আমার দুর্দশা। ছিলাম কোকিল, হতে চলেছি শালিক। ছিলাম কাব্যসাহিত্যের জগতে, এখন ঢুকছি কলমপেষার জাঁতাকলে। খেরোবাঁধানো খাতার ঘুলঘুলিতে। ছিলাম রাজা হলাম কিনা মিস্টার সিমসন!'

'তোমার বই কোথায়?'

'হ্রস্ব উ এসে হ্রস্ব ইকে গ্রাস করেছে। প্যাকিং বাক্সে আছে বন্ধ হয়ে। ওদের মুখের দিকে তাকাতেও সাহস হয় না।'

'আর মামলা?'

'মামলা ডিসমিসড ফর নন-প্রসিকিউশন।'

'তবে এখন উপায়?' শুধু নাটকীয় হবার জন্যেই বললে মহিলা।

'উপায় তুমি।'

'আমি?'

'তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমাকে বাঁচাতে পারে।'

'আমি? আমি কি করে বাঁচাব? আগাপাশতলা তাকাতে লাগল মহিলা।

'তুমি যদি দয়া করে উমাশশী হও।'

'তার মানে? আমি তো উষসী।' মহিলা আবার তার হাতব্যাগে হাত রাখল।

'তুমি যে উষসী উষসী গুহ, তা কে না জানে!' গৌরবের ভাব করল নলিনেশ: 'তুমি ইনসিওরেন্সের এজেন্ট, তুমি ন্যাশনাল সেভিংস বেচ তুমি গার্লগাইডের কর্ত্রী তোমার অনেক প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এও সকলের জানা। তবু এও কারু অজানা নয় যে, একদিন তুমি অনায়াসে উমাশশী হতে পারতে। আর আমি, আমিই তোমাকে উষসী করে রেখেছি।'

'কিন্তু উমাশশী কে?' উষসী আকুল হয়ে উঠল।

'আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী।' হেসে উঠল নলিনেশ।

'তুমি কি পাগল হয়েছ?' চোখ বড় করে তাকাল উষসী।

'প্রেমিক হতে হলে পাগল হতে হয় মাঝে মাঝে।'

'কথাটা যদি স্পষ্ট করে বলো—' উষসীর ভঙ্গি তখনও উচ্চকিত।

'বলছি।' নলিনেশ আরো একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বসল: 'পরমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে বহুতর চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত বলেছি, শুধু ওকে নয়, সমস্ত শহরময় রাষ্ট্র করে দিয়েছি, আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে, জীবিত, শুধু-জীবিত নয়, জীবন্ত, পূর্ণাঙ্গ এবং সচল—অর্থাৎ সোজা বাংলায় জ্যান্ত, আস্ত ও চালু স্ত্রী—তবুও—'

'তবুও?' উস্কে দিল উষসী।

'তবুও মেয়ে দমে না, মেয়ে কমে না। জেদ কেবল বাড়তেই থাকে—'

'তার মানে বিশ্বাসই করেনি যে, তুমি বিবাহিত।' উষসী জেরা-করা উকিলের মত বললে, 'যদি বিবাহিতই হবে তবে স্ত্রী কি কাছে থাকবে না, সংসার করবে না স্বামীর সঙ্গে?'

'তারও একটা কারণ খাড়া করেছিলাম।' নলিনেশের মিথ্যার জন্যে এতটুকু অনুশোচনা নেই: 'বলেছিলাম স্ত্রীর সঙ্গে আমার ঝগড়া, অবনতি, তাই সে আলাদা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, না দৈহিক না লৈখিক। যেমন কর্তব্য, ক'মাস মাসোয়ারা পাঠিয়েছিলাম, পরে তা সে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই থেকেই সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি—'

'একেবারে পুরোপুরি ছেদ করতে গেলে কেন?' শাসনের কটাক্ষ হানল উষসী: 'আবদ্ধ অবস্থায় আছে অসুস্থ অবস্থায় আছে, দু পাঁচ দশ মাস পরে আসবে, এমনি একটা বব তুললেই হত। তাহলেই তো ঘেঁসত না মেয়েটা।'

'উষসী, ঐটুকুই মায়া। একেবারে ঘেঁসবে না এও যে প্রাণে সয় না। ঘেঁসুক অথচ ভয় দেখুক এই চেয়েছিলাম। যদি ভয় দেখে নিজের থেকে লেজ গুটিয়ে নেয় তো নিক। সর্বক্ষণ এই ভয় রেখেছিলাম বাঁচিয়ে যে যে-কোনো মুহূর্তে হাজির হতে পারে উমাশশী। স্ত্রীত্বের দাবি কোনোদিন তামাদি হয় না, ছেঁড়া সুতোয় পাক দিয়ে আবার পাকাতে পারে গোলমাল। দেখ, ভেবে দেখ এসব ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে কিনা, শেষে যেন আমাকে দুষো না।' নলিনেশ চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল: 'প্রলয়ঙ্করী মেয়ে বললে, না, ভয় করি না। আসুক সে, আমার প্রেমের শক্তিতে তাকে আমি পরাভূত করব। যে স্বামী-ছাড়া হয়ে থাকে, স্বামীর সঙ্গে ঘর করে না, যে পরিত্যক্ত, তার আবার কিসের দাবি? একবার তেজ দেখ মেয়ের!'

'তার তেজের কারণ,' উষসী শান্তমুখে বললে, 'তুমি প্রথম স্ত্রী থাকতে তাকে বিয়ে করছ। যখন তাকে বিয়ে করছ তখন নিশ্চয়ই তার প্রতি আসক্তিই তোমার ষোল আনা, প্রথমার প্রতি এক আধলাও নয়। তার দোষ কি, সেই বিশ্বাসেই সে তেজস্বিনী।'

'হ্যাঁ, আমাকে বলেও ছিল সে-কথা।' নলিনেশ চেয়ারের এ-হাতল থেকে ও-হাতলে ভর বদলাল: 'বলেছিল তুমি যখন আমাকে বিয়ে করছ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে স্পষ্ট দিনের আলোয়, তখন তার মানেই হচ্ছে উমাশশীর প্রতি তোমার মন নেই—মন উঠে গেছে—তাহলে আমার ভয় কিসের?'

'তুমি কি বললে?' প্রশ্নালু চোখে তাকাল উষসী।

'আমি বললাম, তবু বলা কি যায় মানুষের মন হাওয়ায়-ওড়া খড়কুটোর মত, কখন কোন নিশ্বাসে কোন দিকে ভেসে যাবে কেউ জানে না। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মেয়ে, বললে, আমার মনের মাশুলে সে মন আমি ষোল আনা উশুল করে নিয়েছি, উমাশশীর সাধ্য কি তাতে ভাগ বসায়? উমাশশীর উমা বিসর্জনে আর শশী অস্তাচলে, অমাবস্যায়!'

'এত?'

'এত উষসী, তুমি এখন একবার আমার সেই পরিত্যক্ত উমাশশী হও।' পস্টাপস্টি উষসীর হাত ধরল নলিনেশ: 'তুমি একবার তাকে পরীক্ষা করো, দেখ তার কেমন আন্তরিকতা! তার ভালোবাসায় কেমন সে নির্বিচল। আর দেখ তোমাকে সে কি করে হটায়। তার স্পর্ধার শিখা কতদূর ওঠে।'

'তুমি আছ বেশ।' হাত ছাড়িয়ে নিল উষসী· 'উমাশশী সাজতে গিয়ে আমি এখন অকারণে সিঁদুর পরব।'

'না, না, তার ব্যবস্থাও করে রেখেছি।' নলিনেশ আবার একটু হাত বাড়াল কিন্তু উষসী সরল না: 'বলে রেখেছি, উমাশশী মাতাজীর আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী হয়েছে, সন্ন্যাসিনীর আগের স্তব। সংসারচিহ্ন সব মুছে ফেলেছে গা থেকে। তাই,' হাসল নলিনেশ: 'তাই তোমাকে সিঁদুর পরতে হবে না, শুধু বাংলামতে আঁচলটা একটু খুলে-মেলে গায়ে জড়ালেই হবে। আর চুল? আলগা খোঁপাটা ভেঙে ফেলে ছড়িয়ে দিতে পারবে না পিঠময়? আর মাথার কাপড়টা নামাও। ব্রহ্মচারিণীরা চিরকন্যা।'

'যে মেয়ে আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণী,' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল উষসী: 'সে আবার ফিরে আসবে কেন?'

'মানুষের মন বিশেষত মেয়েদের মন কখন কি কাণ্ড বাধায়, দেবতারাও জানে না। সে কথাটাও তাকে বলা আছে।'

'বলা থাক,' দু হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক করল উষসী: 'ও সবের মধ্যে আমি নেই। আমি যা আমি তাই। আমি উষসী, আমি উমাশশী হতে যাব কেন?'

'উষসী আর উমাশশীর মধ্যে শুধু একটি 'মা'-এর তফাত। 'মা' বাদ দিলেই উমাশশী উষসী। তুমি মা নও, তোমাকে মা হতে কেউ বলছেও না, সুতরাং মা বাদ দিয়ে উমাশশী হতে তোমার বাধা কি। তুমিই খাঁটি, আদি ও অকৃত্রিম।'

ভালো করে বিস্তৃত করে তাকাল একবার নলিনেশ। একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল বলে বারেবারেই ফেরত দিতে হবে এমন কথা ভারতে-ভাগবতে কোথাও লেখা নেই। মানুষ তো এক মন নিয়ে বাস করে না, যে মন ফেরায় সে মনই আবার হাত বাড়ায় দিনান্তরে। স্পর্শে যে মন জাগে না সে মন শূন্যতায় জাগে। বলে যাবার সময় শোনে না, চলে যাবার সময় কাঁদে। সুতরাং যে উষসী একদিন বন্ধ দরজা ছিল সে এখন মুক্ত মাঠ হতে পারবে না কিংবা যে একদিন মুক্ত মাঠ ছিল সে এখন বন্ধ দরজা হতে পারবে না এমন কথা অবাস্তব।

বরং একটি প্রৌঢ়ত্বের উষ্ণ সহানুভূতি আছে ওর আঁচলের বাহুল্যে। ভারী বয়সের দৃঢ়তা, ভারী বয়সের গাঢ়তা। বুঝবে-শুনবে ভালো, রাখবে-ঢাকবে বেশি। পরিচয়ের মৃণাল জলের অনেক গভীর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবে। বন্ধুতা যদি হৃদ্য হতে হয় তবে বয়সের একটা সামীপ্য থাকা বিধেয়। আর বেশি দেরি নেই যখন ঝগড়ার সময় পরমা তাকে বুড়ো বলবে, পেকোচুলো বলবে, ক্রমে ক্রমে আরও কত কি গঞ্জনা। এবং কিছুই নলিনেশ ফিরিয়ে দিতে পারবে না, কেননা তখনও পরমা নিটুট নিখুঁত নিভাঁজ, একটিও দাঁত পড়েনি, চোখে চালশে লাগেনি, মাথাভরা জমাট চুল তখনো ঘন কোঁকড়ানো কালো কুচকুচে। সামান্য ঝগড়াতেও সমান হবার সুখ পাবে না কোনোদিন।

'কেন মেয়েটাকে কষ্ট দেবে?' বললে উষসী।

'আমাকে কম কষ্ট দিয়েছে এ পর্যন্ত?' তাপে-ক্ষোভে যেন দগ্ধ হচ্ছে নলিনেশ· 'আমাকে ভেঙেচুরে দিয়েছে উৎখাত করেছে আমাকে আমার শিকড় থেকে। তাছাড়া এ তো তার জানা কথা। আমি কিছুই লুকোইনি, আমার হাতের সমস্ত তাশ খুলে ধরেছি। যখন সে জানল যে, আমার স্ত্রী আছে আর যে-কোনো মুহূর্তে সে এসে তার দাবি তুলতে পারে তখন সে সেকথা শোনেনি কেন, কেন রেহাই দেয়নি আমাকে? আজ সেই সঙ্ঘর্ষের লগ্ন উপস্থিত, যে সঙ্ঘর্ষের জন্যে সব সময়ে সে প্রস্তুত। কতদিন ব্যঙ্গ করে

বলেছে আমাকে, কই তোমার উমাশশী কই? আজ তুমি এসেছ। তুমিই সেই উমাশশী।'

উষসী কটাক্ষ করল। আর সেই কটাক্ষে দেখল শ্যামল-শান্তের প্রকাশ যে নিস্তব্ধ বনস্পতিরূপে এতদিন দেখে এসেছিল নলিনেশকে সে একটা সামান্য লতার আক্রমণে নিশ্চেষ্ট-নিষ্প্রাণ। সমস্ত গ্রন্থিল জটিলতাকে শিথিল করতে না পারলে তার আর মুক্তি নেই।

দোষ কার? গাছের না লতার? গাছ তো দাঁড়িয়ে থাকে, লতাই এগিয়ে আসে। না কি গাছই হাতছানি দেয়?

ঐ, ঐ আসছে পরমা।

রাস্তায় দেখা গেল পরমাকে। রোদ থেকে বাঁচবার জন্যে মাথার কাপড়টা একটু বিস্তৃত করে মেলা ছাতার মত।

'যাও যাও শিগগির ভেতরে যাও।' গায়ে প্রায় ঠেলা মারল নলিনেশ : 'উমাশশী সাজো। এদিক ওদিক ঘোরো ফেরো, তোমার বাড়িঘর এমনি ভাব দেখাও।'

আশ্চর্য, উষসী কথা শুনল, তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল ভিতরে।

পরমা ঘরে ঢুকলে নলিনেশ জিগগেস করল, 'কিছু হল সুবিধে?'

'গীতালিদি তার ছেলে নিয়েই মত্ত।' খুব রাগ-রাগ ভাব পরমার : 'তারপর আরো একজন আসছে সে নিয়ে অহঙ্কার। বলে আমি বহু সন্তানে বিশ্বাসী। তারপর এমন বিশ্রী, আমাকে জিগগেস করে, তুমি কি শাস্ত্রীয়, না বৈজ্ঞানিক?'

'আসল কথা কি হল?' নলিনেশ গম্ভীর মুখে মনে করিয়ে দিল।

'চাকরির কথা? এত মশগুল যে, স্বামীকে নাকি বলতেই ভুলে গেছে—'

'তখনই বললাম সটান বাসুদেববাবুর সঙ্গেই দেখা করো।'

'সে তো তুমি করলেই ভালো হয়, তা তুমি নড়বে না এক পা।'

'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি যে—' চোখ নামাল নলিনেশ।

'যাচ্ছি কি গেছি। শুধু বুড়ো নয়, গঙ্গার পোলের ওপার- হাবড়া, বুড়োহাবড়া। বেশ, আমিই যাব। শুধু আমার জন্যে নয়, খোদ তোমারও জন্যে। একেবারে কেরানি না হয় আরেকটু উঁচু কোনো পদের—এ কি,' হঠাৎ থমকে গেল পরমা, টেবিলের উপর ফেলে রাখা লেডিস ব্যাগ লক্ষ্য করে বললে, 'এ-ব্যাগ কার?'

যেন যার ব্যাগ তার প্রতি কি গভীর মমতা এমনি ভাবের থেকে নলিনেশ বললে, 'বুড়ির। বুড়ি এসেছে।'

মুখচোখ কুটিল হয়ে উঠল পরমার: 'কে বুড়ি?'

মুখ এতটুকুও কালো বা গলা এতটুকুও খাটো না করে নলিনেশ বললে, 'উমাশশী। উমাশশী এসেছে।' স্বরে কত বিরক্তি ও দুর্ভাবনা থাকবে, কত ক্রোধ ও প্রত্যাহার, তা নয়, তার বদলে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, যেন বা স্নিগ্ধ অভ্যর্থনা।

ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল পরমা। জিগগেস করলে 'এখানে কি করতে এসেছে?'

'কি করে বলি। জিগগেস করে দেখ না।' নিস্পৃহের মত বললে নলিনেশ।

'জিগগেস করে দেখব মানে?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল পরমা · 'তুমি জিগগেস করনি?'

'সময় পেলাম কই? ঘরে ঢুকেই টেবলের উপর ব্যাগটা রেখে ভিতরে ঢুকে গেল। শুধু বললে, আশ্রম ছেড়ে দিয়েছি।'

'তার মানে এখানে থাকবে?' রাগে পুড়তে লাগল পরমা।

'ভাবভঙ্গি দেখে তো তাই মনে হয়।'

'মনে হয়? তবে ওকে ঢুকতে দিলে কেন? কেন সরোজবাবুর মত মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলে না? সরোজবাবুর বেলায় তো সঙ্গে মা ছিল—'

সরোজবাবুর কথা শুনেছে নলিনেশ। যে শহরে তারা ছিল সেই শহরে সরোজ ছিল উঁচু খোপেব সরকাবি পায়রা। এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয়বাব বিয়ে কবেছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে সুখনীড় করেছে, একদিন দুপুরবেলা প্রথমা স্ত্রী এসে হাজির, সঙ্গে প্রবল ছাড়পত্র হিসেবে শাশুড়ীকে অর্থাৎ সরোজের মাকে নিয়ে। রিকশা থেকে নামতে দেখে দরজা বন্ধ করে দিল সরোজ। সমস্ত শহর ভেঙে পড়ল তবু সরোজ দরজা খুলল না। কারুর সাধ্যি নেই, আইনের পর্যন্ত নয় যে, তাকে দিয়ে দরজা খোলায়। রাস্তাব উপর ঘণ্টা কয়েক বসে থেকে মা আর প্রথমা স্ত্রী ফিরে গেল ইস্টিশানে।

নলিনেশ বললে, 'শুনেছি সরোজবাবুব দ্বিতীয় স্ত্রীই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তুমি বাড়িতে থাকলে না কেন? তাহলে তুমিই পারতে বন্ধ করতে।'

'আমি কি তোমার প্রাণেশ্বরীকে চিনি?'

'একজন আত্মীয় ভদ্রমহিলার বাড়িতে ঢোকবার মুখে কি করে যে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায় ভেবে পাই না।' তার পুরোনো মাস্টারিমাখা

মুখে নলিনেশ বললে, 'সরোজবাবু যে দিয়েছিলেন, তিনি তার প্রথম স্ত্রীকে খারাপ বলে সন্দেহ করতেন, তাই। কিন্তু উমাশশী সম্বন্ধে তেমন কিছুই বলবার নেই। সে বরাবর আশ্রমে কাটিয়েছে।'

'আশ্রম দেবস্থান আর তোমার তিনি পুণ্যের ঢেউ।' পরমা এ-ঘরে থাকবে না পাশের ঘরে যাবে স্থির করতে পারছে না।

'কেউ এলে পর তাকে ঠাণ্ডা হয়ে বলা যায় বা তর্ক করে বোঝানো যায় যে, তোমার এখানে স্থান নেই বা দরকার হলে রূঢ়স্বরে বলাও যায়, চলে যাও বাড়ি ছেড়ে। আগে থেকেই তাকে ঠেকানো যায় কি করে? এখন যখন চলে এসেছে তখন তুমিই তাকে বলে-কয়ে দাও না তাড়িয়ে।'

'তোমার বাড়ি, তোমার প্রাণের আত্মীয়, আমি বলতে যাব কেন?' পরমা টেবিলের একটা ধার জোর করে চেপে ধরল 'তুমি বলবে।'

'আমি তো বললাম কিন্তু আমার কথা যদি না শোনে। তখন তো ঘাড় ধরে গায়ের জোরে বার করে দিতে পারব না।'

'কেন পারবে না? চোর-ডাকাত হলে কি করতে? যে অনধিকার প্রবেশ করেছে তার আবার কিসের ওজুহাত?'

'এখন কে অনধিকারী এ আবার মামলার কথা।' তিক্তবিরক্ত মুখ করল নলিনেশ: 'এক মামলা গেছে আবেক মামলার রব তুলো না।'

'তার মানে, তাকে রাখতে চাও ঘরে থাকতে চাও তার সঙ্গে?' পরমার দুই চোখে আগুন হয়ে অশ্রু বেরল।

'এক আকাশে কি সূর্য-চন্দ্র থাকে না?'

'বেশ, তাই থাকো।' বলে বিদ্যুৎবেগে পরমা পাশের ঘরে শোবার ঘরে এসে ঢুকল। দেখল কে এক ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করছে আর টুকটাক জিনিসপত্র ঘাঁটছে আলতো হাতে।

বুঝতে পেরেছে কে, তবু হুমকে উঠল পরমা 'কে কে আপনি?'

মুখে মিষ্টি হেসে কণ্ঠে মধু ঢেলে উষসী বললে, 'তোমার দিদি।'

ওসব আশ্রমী ঢঙে ভুলবে না পরমা। ঘাড়ে ঝাঁকি মেরে বললে কর্কশকণ্ঠে, 'আমার দিদি-টিদি কেউ নেই।'

'দিদি, না থাকে না-ই থাক, কিন্তু তুমি আমার ছোট বোন। বলো তাতেও আপত্তি?'

'তাতেও আপত্তি। কারু ছোটোবোন-টোন আমি হতে পারব না কখনো না।' দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল পরমার। তবু যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বললে, 'কি চাই আপনার? কেন এসেছেন এখানে?'

'কেন এসেছি? বলব?'

'বলুন।'

'ভয় পাবে না তো?'

'ভয় পেতে-পেতে ভয় লয় হয়ে গিয়েছে।' কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ে পরমা।

'বলব? এই ভয়হীন সুন্দর মেয়েটাকে দেখতে এসেছি।' সত্যি, খানিকক্ষণ ঊষসী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মাঠগোঠের মেয়ে, মুক্ত দিগন্তের। দুই চোখে ভরা সদ্যজাগ্রত আনন্দের স্বপ্ন। কিন্তু এমন নিয়তি, এ মেয়েকেও চোখের জলে স্নান করতে হবে!

'আমাকে দেখছেন কি, ঐ কীর্তিমানকে দেখুন—'

'না, তুমিই দেখবার, তোমাকেই দেখছি। দেখছি সে কি আশ্চর্য শক্তি কি বিশুদ্ধ সুর যার বলে আর কেউ যা পারেনি তুমি তাই সম্ভব করলে।' ঊষসী এগিয়ে এসে হাত ধরল পরমার।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পরমা বললে 'আর বেশি দেখতে হবে না। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।'

'সে কি? চলে যাবে কেন?'

'হ্যাঁ, আপনি এসেছেন, আপনার আশ্রম এবার বিস্তার করুন সংসারে। আপনি থাকুন, আমি যাই।' দরজার দিকে পা বাড়াল পরমা। ভদ্রমহিলা ভালো, কটুকণ্ঠে কলহ করতে হল না, বেশ শান্ত সমাপ্তিতেই ইতি টানা যাচ্ছে।

দরজা রোধ করে দাঁড়াল ঊষসী। বললে, 'এত সহজেই হেরে গেলে?'

'গেলাম। বুঝতে পারছি আমার রহস্যের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। পরিহিত কাপড়ের মত আমি পরিচিত হয়ে গিয়েছি। আর পরাজয়ের তবে বাকি কি। আপনি থাকুন, রাজত্ব করুন। আমি পথ ধরি।' একবস্ত্রে বেরুতে চাইল পরমা।

দু হাত দিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল ঊষসী। বললে, 'আমাকে তুমি কেন ভুল করছ? আমি উমাশশী নই, উমাশশী বলে কেউ নেই পৃথিবীতে, আমি ঊষসী— ঊষসী গুহ। তুমি আমার সঙ্গে চলো ও-ঘরে।' টানতে-টানতে পাশের ঘরে নিয়ে এল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নলিনেশ। সরে গেল দরজার দিকে। বুঝল ঊষসীই হেরে গিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সে নিজে।

ঊষসী তার টেবিলে-থাকা ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে দেখাল। বললে, 'এই দেখ, আমি উমাশশী কি কোনো শশীই নই, আমি ঊষসী গুহ। আর এই দেখ, তোমার জন্যে কি এনেছি।' বলে মখমলের খাপ থেকে

ছোট অথচ সুন্দর একটা নেকলেস বার করে ধরল। পরমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, 'বলো আমি তোমার দিদি নই?'

'দিদি হতে পারেন,' এতক্ষণে চোখের মধ্যে তাকাতে পারল পরমা : 'কিন্তু ভয় তাতে বাড়ল বই কমল না।'

'ও ভাবছে,' ও পাশ থেকে নলিনেশ ফোড়ন দিল : 'ও ভাবছে উমাশশী ও উষসীতে আসলে কোনো তফাত নেই।'

'তফাত অনেক, তফাত প্রচণ্ড।' ব্যাগটা দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিল উষসী। বললে, 'তোমরা বসো, আমি যাই।'

'সে কি,' পরমার দিকে তাকিয়ে তাড়া দিল নলিনেশ : 'দিদিকে এক পেয়ালা চা খাওয়াবে না? কিংবা এক গ্লাস শরবত?'

'তোমার আত্মীয়, তুমি খাওয়াও।' পরমা রুখে উঠল।

'না তেষ্টা নেই শরীরে। কোনো কিছুর দরকার নেই। আমি চলি।' চলে গেল উষসী।

'কি, যাও না পিছু পিছু?' খেঁকিয়ে উঠল পরমা।

'কি দরকার। মনই যেতে পারে।'

গলার হারটা খুলে ফেলল পরমা, ভাবল জানলা দিয়ে ফেলে দিই ছুঁড়ে। পরে ভাবল, শত হলেও সোনা, কখন কি কাজ দেয় ঠিক কি।

সন্ধের আগে স্বয়ং বাসুদেব এসে হাজির।

নলিনেশ ভাবল কোনো কাজের খবর নিয়ে এসেছে বুঝি। পরমাও খুশি-খুশি। কিন্তু বাসুদেব যা এনেছে তা আনন্দেব খবর নয় আতঙ্কের খবর। বললে, 'সুপ্রভাতকে ডাকুন।'

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে নলিনেশ হাঁক পাড়ল। বললে, 'নিচে আসুন, বাসুদেববাবু ডাকছেন।'

সুপ্রভাত নিচে আসতেই উপবে উঠে গেল পরমা। দেখল দীর্ঘদিন রোগভোগের পর অতিক্লেশে উঠে বসেছে সোহিনী। যেন পঙ্গপালেব দল উড়ে গিয়েছে মাঠের উপর দিয়ে।

বললে, 'ও তোর কি হয়েছে সোহিনী?'

কথা বলার লোক পেয়ে, সহজ ছন্দে নিশ্বাস ফেলবার পরিবেশ পেয়ে যেন বাঁচল সোহিনী। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দরজার দিকে। পরমা তো বটেই, নির্ভুল পরমার কণ্ঠস্বর। কিন্তু সোহিনী এ কাকে দেখছে? যেন বাসাহারা অন্ধকারে পাখাঝাপটানো পাখি। উঠে দাঁড়াল সোহিনী, 'এ তোর কি হয়েছে পরমা?'

'কে জানে কি।' পরমা সোহিনীর হাত ধরল 'হয়তো তোর যা

হয়েছে আমারো তাই।' তারপর একটু থেমে, হাত ধরে টান দিয়ে: 'চল নিচে চল। বাসুদেববাবু ফিসফিস করে কি সব বলছেন ভয়ের কথা। চল শুনি গে।'

ভয়ের কথায় পাংশু একটু হাসির রেখা ফোটাল সোহিনী। ভাগ্যের নিষ্ঠুর চাতুরীর কাছে যারা বলি তাদের আবার ভয় কি।

'এ আরেকরকম ভয়।' অজানতে পরমার গলাও আচ্ছন্ন হয়ে এল, 'আরেকরকম দুর্দিন।'

'চল দেখি গে।' যেন অনেক বাঁধন থেকে লঘু হল সোহিনী, খুশির একটু বা লহর তুলল শূন্যে। আরেক ভয়ে এ ভয় ডুবে যাক হারিয়ে যাক। আরেক দুর্দিনে মুছে যাক আজকের দুঃসময়।

সোহিনী-পরমা নিচে নেমে গেল।

গোল হয়ে বসে বাসুদের নলিনেশ আর সুপ্রভাত কথা কইছে। বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই, আলাউদ্দিন যে পুলিশের ডি-আই-জি, সে বাসুদেবের বন্ধু। সে খবর পাঠিয়েছে বাসুদেবকে, এই অঞ্চলে গোলমাল আসন্ন।

গোলমাল, কিসের গোলমাল?

যেমন কলকাতায় নানান এলেকায়, নানান পকেটে হচ্ছে ইদানীং।। দাঙ্গাহাঙ্গামা। লুটতরাজ। কাটাকাটি। বক্তারক্তি।

এখানে আমরা তো শান্ত, প্রতিরোধের সমস্ত সামর্থ্যের বহির্ভূত, এখানে আমাদের উপর হামলা করবে কেন?

ও সব যুক্তির কথা মামলার সওয়াল-জবাবের কথা ছাড়ুন। বিপদ আসছে তার প্রতিষেধে প্রস্তুত হোন। একটা বাড়ি তৈরির পক্ষে একটা গাছের অস্তিত্বই যথেষ্ট প্রতিরোধ, যথেষ্ট প্রতিবন্ধক। গাছ বলতে পারে, আমি তো নিরীহ নির্বাক, আমাকে কাটবে কেন? আমাকে রেখে ওদিক থেকে ঘুরে গিয়ে বাড়ি করলেই হয়। বাড়ির কর্তা বললে, না, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ তার পাশ ঘেঁসেই আমার বাড়ি উঠবে। ও জায়গাটাই যে আমার মনের মত, আর তোমার সান্নিধ্য আমার মতে অকল্যাণ। তোমাকে তাই উচ্ছেদ না করে আমার সুখ নেই স্থিতি নেই। অন্তত সুখস্থিতির ধারণা নেই। সুতরাং হট যাও, কাটা পড়ো।

এ গাঁজাখুরি কথা দুমাস আগে থেকে শুনেছি যেদিন আবদুল রসিদ ডে হল সেদিন থেকে। ওদের আন্দোলনও তো ইংরেজেরই বিরুদ্ধে। সেদিক থেকে আমরা ওরা এক নৌকোর সোয়ারি। এক নৌকোর সোয়ারি কখনো নাও ডোবায়?

তবু কাণ্ডারি হুঁশিয়ার হতে আপত্তি কি? দেখলে না সেদিন কেমন খোলা মশাল নিয়ে প্রকাণ্ড মিছিল করল, শেষকালে আগুন লাগাল কাঠের গোলায়। দেখলে না? কাঠের গোলা ইংরেজের?

লাগাক আগুন, ও সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা, খুচরো গুণ্ডামি। ওতে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তা ছাড়া ডি-আই-জি কেন কি উদ্দেশ্য এ খবর পাঠিয়েছে, কি তার আসল মতলব কে জানে। 'প্যানিকি' বা ভয়-খেকো হয়ে মনোবল হারানোর কোনো মানে হয় না। এ-সবই ষড়যন্ত্র। তা ছাড়া আলাউদ্দিন নামে কোনো লোক বন্ধু হতে পারে এ তার দুরাশা।

তবু নলিনেশের মন খানিকটা যুক্তিঘেঁসা। বললে, মন্দ কি, সাবধানের বিনাশ নেই। হ্যাঁ, পাড়ার সকলকে জানান দিয়ে রাখা ভালো কথা। সম্পদে একলা বিপদে একত্র। অবিশ্যি, আমরা পিছন দিকে আছি, আমাদের দিকে দৃষ্টি তত সজাগ নাও হতে পারে। চোখ পড়বে বেশি সরখেল চন্দ চৌধুরীদের উপর। চলুন ভবতোষকে জানিয়ে আসি। সরখেল থাকলে সরখেলকেও।

আর চৌধুরীকে?

তার কি ভয়? তার ফটকে বাঁধা মস্ত কুকুর, কত তার দারোয়ান-চাকর, বন্দুকধারী কত সেপাই-পাইক, সে এ-সবে গ্রাহ্যও করে না। সে তো টিন দিয়ে তৈরি নয়, ইস্পাত দিয়ে তৈরি, তার পিছনে রাজশক্তির প্রশ্রয়-প্রসাদ। সে এ-সব ভয়ের কথা কানেও তুলবে না।

কানে তোলা উচিত নয়। সুপ্রভাত আবার ব্যক্ত করল অভিমত। দিব্যি লোকজন গাড়িঘোড়া চলেছে রাস্তায়। হাসছে খেলছে কোলাহল করছে ছেলেরা। বারান্দায় মেয়েরা এসে দাঁড়াচ্ছে ফিরিওলাদের থেকে জিনিস কিনছে, সাজগোজ করে রাস্তায়ও বেরিয়েছে কেউ-কেউ। সিনেমায় চলেছে। নিত্যদিনের সুখস্থ চেহারা। ঐ তো গ্যাসওয়ালা মই নিয়ে বেরিয়েছে। আলোকে খচিত হয়ে উঠছে নগরী। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম প্রহরের চাঁদ উঁকি দিয়েছে পূব দিগন্তের বেড়া ধরে।

বাসুদেব-নলিনেশ ঘুরুক বাড়ি-বাড়ি, সুপ্রভাত ওসব গুজবে বিশ্বাস করে না। মুখে মুখে গুজব কথাই আজব কথা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু মনের গোপন গহনে পরমা-মোহিনী কামনা করতে লাগল আসুক কালো রাত, কালো ঝড় তুলে কালো সমুদ্রের ঢেউ। ভাসিয়ে নিয়ে যাক, তলিয়ে নিয়ে যাক, অতল পাতালে সব নিশ্চিহ্ন করে দিক।

শরীরে বড় ব্যাধি হলে ছোট আঘাতের যন্ত্রণা যেমন ভুলে যায় মানুষে, তেমনি সেই ভয়ের প্লাবনে দূর হয়ে যাক এসব ক্ষুদ্র সংশয় ছলনা,

দুঃখ-গ্লানি, নীচতা-দীনতার অশান্তি। বিরোধ-বিচ্ছেদের জন্ম নয়, আসুক প্রত্যক্ষ উদ্যত মৃত্যুভয়।

মুখস্থ মৃত্যু নয়, রক্তাক্ত মৃত্যু।

বুকের উপর লুব্ধ প্রেমিকের চুম্বন নয়, আততায়ীর নৃশংস অস্ত্রের তীক্ষ্ণ স্পর্শ।

৮

সকাল থেকেই পাড়াটা কেমন যেন বুকচাপা রুগীর মত ছোট-ছোট নিশ্বাস ফেলছে। কেমন একটা জ্বর-জ্বর ছ্যাঁকছেঁকে ভাব। এখানে-ওখানে মহল্লার মাতব্বরদের জটলা। গুজগুজ ফিসফিস ইতিউতি তাকানো। যেন ঈদের চাঁদ দেখা গেল কিনা, খবর এল কিনা টেলিগ্রামে, তারই জন্যে উসখুস। যেন কোন উপরওয়ালার ফরমানের প্রতীক্ষা।

না, কিছু নয়, বৃষ্টি হয় না, অথচ একটুকরো ঘন কালো মেঘ করে আকাশের কোণে, তেমনি চেহারা। বাকি আকাশে দিব্যি ঝলক-দেওয়া রোদ।

কোর্টে গেল ভবতোষ। বন্দুকটা কোর্টের মালখানায় আছে। আর্দালিকে বললে নিয়ে যেতে। বলা যায় না আত্মরক্ষায় লাগতে পারে বন্দুক। একটা ফাঁকা আওয়াজেই হয়তো সমস্ত পরিষ্কার। 'আর শোনো,' উদয়প্রতাপকে বললে ভবতোষ, 'তুমিও থেকে যেয়ো মিশির।'

'বহুত আচ্ছা।' বন্দুক হাতে পেয়ে মিশিরের বুকের ছাতি আরো ফুলে উঠল।

জয়া বললে, 'আমি যাব না ইস্কুলে। কি সব গোলমাল লাগতে পারে। বাবা বারণ করে দিলেন।'

টুকটুকি বললে, 'আমি যাব। আভাস বলেছে এগিয়ে দেবে ইস্কুল পর্যন্ত।' আভাস সিঁড়ির নিচেই ট্রাউজার্সে বেল্ট আঁটছে। তাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল টুকটুকি, 'কি, নেবে তো সঙ্গে করে?'

'নেব। নেব বলেই তো পোশাক পরলাম। চলে এস।' নিচে থেকে তাড়া দিল আভাস।

জয়ার ইচ্ছে হল সেও যায়। কেমন ভয়-ভয় করবে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেমন গা ছমছম করবে সারাক্ষণ, কি মজাই না হত আজ স্কুলে গেলে! আর আভাস সঙ্গে থাকলে কেউ তাদের জলের ছিটেটি পর্যন্ত

দিতে পারবে না। সব গুন্ডারাই তো আভাসের চেনা। কিন্তু একবার বারণ করে দিয়ে এখন আর যাব বলা যায় না। মন কেমন করতে লাগল জরায়। দাঙ্গা হবে—তার চেয়েও এ যেন বেশি সন্তাপ।

'কি, ভয় নেই তো কিছু?' টুকটুকি আরেকবার মনে করিয়ে দিল।

'কিসের ভয়? আমাকে সব্বাই চেনে। আপনা-আপনি ভাবে।' অপাঙক্তেয়দের সঙ্গে একদিন অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছিল বলে গর্বের ভাব করল আভাস : 'যারা চেনে না তারাও ফুল-প্যান্ট দেখে ঘাবড়ে যাবে, ঠিক করতে পারবে না। এখনো ঘটনা তো কিছু ঘটেনি। ঘটলে পাজামা পরে নেব। লুঙ্গিও আছে খোপ-খোপ—'

'তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ রক্ষী হয়ে এই তো যথেষ্ট ঘটনা।' অন্য অর্থে বললে টুকটুকি। মহীয়সীর মত বললে।

তাইতেই আভাস পরিপূর্ণ। বললে, 'যতক্ষণ জানবে তুমি আমার লোক কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না। হ্যাঁ, পাশাপাশি চলো। পা মিলিয়ে। যাতে লোকের বুঝতে সন্দেহ না হয় তুমি আমার আপনার।'

ডাক্তার সদয়শিবও ডিসপেনসারিতে গেল, গলায় স্টেথিসকোপের মালা ঝুলিয়ে। বললে, আমাকে ছাড়া কারু ত্রাণ নেই। রামে মারলেও আমি রাবণে মারলেও আমি। আমি দল বেদলের বাইরে। আমিই বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি।

সোহিনী বললে সুপ্রভাতকে, 'কি, আফিসে যাবে নাকি?'

'বা, আফিসে যাব না কেন?' টাই বাঁধতে বাঁধতে বললে সুপ্রভাত, 'যত সব বাজে গুজব। এ অঞ্চলে কিছু হবে না, পারে না হতে।'

'আমারও সেই মত।' স্বামীর সঙ্গে সায় দিতে পেরে শান্তি পাচ্ছে সোহিনী। বললে, 'তবু যদি পাও কারো গাড়িতেই ফিরো।'

'না, না, দিব্যি ট্র্যাম-বাস আছে, পরের গাড়ির ভরসা করতে যাব কেন?' পরে সোহিনীর দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললে, 'কি, তোমার ভয় করবে না তো?'

'না, নিচে পরমারা আছে, ভয় কি!'

কি ভালো লাগছে স্বামীর সঙ্গে অন্য ভয়ের কথা কইতে।

'হ্যাঁ, ভয় কি! দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে রেখে দিও। কাউকে বুঝতে দিও না ভিতরে তুমি আছ।' তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বললে সুপ্রভাত 'হ্যাঁ, তোমার কি ভয়, তুমি তো স্বাধীন, তুমি তো নিরাপদ—'

'কি, যাবে না টিউশানিতে?' পরমা জিগগেস করল নলিনেশকে।

'মাথা খারাপ! এমন একটি সোনার ওজুহাত পেয়ে কেউ কামাই না করে ছাড়ে?' আলস্যে বিস্তৃত হল নলিনেশ।

'চারদিকের চেহারা দেখে ভয়ের কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।' স্বাভাবিক হতে পেরে যেন স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে পরমা।

'চারদিকের চেহারা দেখতে গিয়ে নিজের চেহারাখানা যেন দেখিও না বাইরে।' বললে নলিনেশ, 'ভয়ের প্রত্যক্ষ এখনো কিছু নেই বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা থমকানো ভাব। একটা ঝড় যেন খানিকক্ষণের জন্যে স্থগিত হয়ে আছে আকাশে। কেমন ভারী ভারী হাওয়া, লোকজনের মুখচোখ কেমন ঘোর-ঘোর। তা ছাড়া চিহ্নিত দিন তো কাল, শুক্রবার।'

'আচ্ছা, যদি আমাদের বাড়ি আক্রমণ হয়?' পরমার গলা ফ্যাকাসে শোনাল।

'আমাদের বাড়ি আক্রমণ করবে কেন? নিচের তলায় গরিব এক মাস্টার, উপরের তলায় ফোতো এক সাহেব। আমাদের বাড়িতে কি সোনাদানা আছে, না নগদ টাকার কুড়? কোন কোন বাড়িতে যেতে হবে তা এদের লেখা আছে লিস্টিতে। তবে ঝড়তি-পড়তি কিছু ঢুকে পড়তে পারে, টাকাপয়সা বা জিনিসপত্রের লোভে নয়, সর্বভোগের সার যুবতী স্ত্রীর লোভে—'

'যদি সত্যি আসে?' পরমা নলিনেশের বাহু আঁকড়ে ধরল। অনেক-দিন পর সজ্ঞানে স্পর্শ করল স্বামীকে।

যেন কিছু নয়, যেন ডাল-ভাত এমনি করে বললে নলিনেশ, 'যদি আসে লড়াই করব। আততায়ীর হাতে প্রাণ দেব। তোমার কি হবে জানি না, কিন্তু যাই হোক, একবারটি অন্তত ভাবতে পারবে নলিনেশ যতই বুড়ো হোক, অকর্মণ্য হোক, স্ত্রীর ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।'

'না, অমন করে বোলো না।'

'করতে পারব কি না কে জানে বলতে দোষ কি!' নিজের মনে হাসল নলিনেশ: 'দাও বাজারের থলেটা দাও, বাজারটা একবার ঘুরে আসি।'

'মীনাক্ষী!' পুত্রবধূকে ডাকলেন চৌধুরী। বললেন, 'একবার প্রদোষকে ডেকে দাও।'

পাঞ্জাবি-পাজামা-চটিপরা ব্যারিস্টার ছেলে কাছে এসে দাঁড়াল।

'কেমন বুঝছ?' জিগগেস করলেন চৌধুরী।

'কাণ্ডকারখানা হয়তো কিছু হবে, কিন্তু আমাদের দিকে আসবে না।' দিব্যজ্ঞের মত বললে প্রদোষ।

'আমাদের দিকে আসবে না। যেহেতু আমরা ইংরেজের খাসবরদার!' কিন্তু সেই ইংরেজ কি আছে?'

'কচ্ছপের মত কামড় দিয়ে আছে।'

'তাকে থাকা বলে না। কামড়টাই শুধু আছে, কচ্ছপ নেই। সুতরাং,' গলা নামালেন চৌধুরী: 'গুলিবন্দুক মজুত আছে?'

'আছে।'

'ছুঁড়তে পারবে?'

কান চুলকোল প্রদোষ: 'পারব।'

'জুয়েলারি রেখেছ কোথায়?'

'বাক্স-আলমারি থেকে সরিয়েছি। কাঠের আলমারির পিছনে ছোট-ছোট কাঁটা পুঁতেছি। তাতে সার-সার রেখেছি ঝুলিয়ে। দেয়ালঘেঁসা আলমারি, কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।' দেয়ালও যাতে শুনতে না পায় তেমনি করে বললে প্রদোষ।

'ভালো করেছ। ছাদে ইট-পাটকেল মজুত আছে?'

'আছে।'

'কিন্তু ছুঁড়বে কে?'

প্রদোষ আবার কান চুলকোল 'লোকজনেরই অভাব বাবা।'

খোকনকে জল-ভর্তি টবে বসিয়ে স্নান করাচ্ছে গীতালি। খোকন নিজে যেমন স্নান করছে তেমনি জলের উপর প্রবল থাপ্পড় মেরে-মেরে মাকেও স্নান করাচ্ছে। দুই স্নানে তার ডবল আনন্দ।

গীতালি বললে 'গোলমাল বাধলে আলাউদ্দিন সাহেব জিপ পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন?'

'বলেছে তো।' বললে বাসুদেব।

'তা হলে আর ভাবনা কি।'

'তবে গোলমালে ঠিক সময়ে মনে থাকলে হয়।' বাসুদেবের কি একটু সন্দেহ হল?

'আগেই সন্দেহ করো কেন? আগে গোলমাল হোক।' ছেলেকে বুকের উপর চেপে ধরে শাড়ির আঁচলে তার ভিজে গা মোছাতে-মোছাতে গীতালি বললে, 'আমার তো মনে হয় তেমন বিশেষ কিছুই হবে না। ভয় যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই ভয়। ভয়ের ভয়, ভূতের ভয়ই তাই আমাদের বেশি।'

বাসুদেব চিন্তিত মুখে কি ভাবতে লাগল।

'তুমি আফিসে যাবে তো?' ভাবনায় ছেদ ঘটাল গীতালি।

'যা, যাব বই কি।' তাড়া খেয়ে উঠে পড়ল বাসুদেব।

'আফিসের গাড়ি আনিয়ে নিলেই পারতে।'

'আজ তো অমনি যাই। কাল থেকে দেখা যাবে।'

রাত পোহালে কি না-জানি হয়, ভাবতে ভাবতে সটান পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরল ভবতোষ। কার্জন পার্ক পেরিয়ে চৌরঙ্গী ধরে পার্ক স্ট্রিটের মধ্য দিয়ে যত বেশি পারে লোকজনের স্পর্শ নিতে-নিতে। নগরজীবনের প্রাণস্পন্দনের ছন্দ যদি মনে এই আশ্বাস আনে বারে বারে, যে, কালও থাকবে এমনি স্বাভাবিক। ঘুরবে চাকা হাঁটবে মানুষ খুলবে দোকান বাজার।' এক রাতেই রূপসী নগরী অরণ্যে মিলিয়ে যাবে না।

পথে যেতে ওয়েলেসলিতে ভূপেন ডাক্তারের চেম্বারে খানিক বসে গেল।

'কি রে, তোদের ওখানে তো হবে কাল।' নিজে মির্জাপুরের দিকে থাকে, প্রায় নিশ্চিন্ত এলেকায়, তাই নির্মমের মত পারল পরিহাস করতে।

'কিছু না—' সবলে নস্যাৎ করল ভবতোষ: 'আমাদের এলেকা খুব ঠাণ্ডা, কোথাও কোনো খিরকিচ নেই। আর যেখানে দু হাতের এক হাতই পঙ্গু সেখানে তালি বাজবে কি করে?'

মুখে বলে বটে কিন্তু মনের মধ্যে ভয় থাবা ওঁচায়। যতই এলেকার মধ্যে ঢোকে ততই গা-হাত-পা ভারী হতে থাকে।

'দাদা দাদা –' রাত দশটার সময় কে ডাকছে বাইরে।

কেন কে জানে সরখেলরা অনেক আগেই সদর বন্ধ করে দিয়েছে, উপরের ঝুল-বারান্দা থেকে ভবতোষ দেখল, ফরিদ।

জলের মত তাড়াতাড়ি নেমে এল ভবতোষ। কি ব্যাপার? কিছু হবে-টবে?

'কিছু বলা যায় না।' ফুটপাথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বললে ফরিদ: 'তবে জনতা যদি এবার বোঝে আমরাই রাজা আর আমাদের দমন করতে বা শাসন করতে কোনো রাষ্ট্র জেগে নেই, তা হলে কিছু না হওয়াটাই বিচিত্র। তবে কিছু হোক বা না হোক ভয় পাবেন না, বউদিকেও ঘাবড়াতে বারণ করবেন—আমি আছি।'

আমি আছি। এ যেন একা ফরিদের কথা নয়, আরেকজনের। ভবতোষ ফরিদের হাত চেপে ধরল। ফরিদ বললে, 'যান, শুয়ে পড়ুন গে।'

ভোর হল। কাক-মুরগি ডাকল। পথে কাগজওয়ালা রুটিওয়ালা চাওয়ালা বেরুল। কোথায় কি! সব যে-কে-সে। ট্রাম বেরিয়েছে।

কাঁচ রোদ গাছের পাতায় ও রাস্তার পিচে সমান ঝিকমিক করে উঠেছে। কলে জল এসেছে। উনুনের ধোঁয়া উঠছে বাড়ি-বাড়ি।

সকাল আটটায় মিছিল বেরুল। মাইলের পর মাইল, লোকের পর লোক। কি আশ্চর্য, মেয়েরা পর্যন্ত আছে। লাবণ্য ও লালিত্যের ছিটেফোঁটা হয়ে। ধ্বনি আছে পতাকা আছে কিন্তু লাঠিসোটা দেখা গেল না, না বা ফেনিল প্রমত্ততা। বরং বেশ একটা স্ফূর্তির আবহাওয়া। শ্রী ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুগতি। শুনতে না হোক, ভালোই লাগল দেখতে। এধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে ভবতোষরা, ওধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চৌধুরী-বাড়ি। এবং যা এতদিন হয়নি এতক্ষণ ধরে হয়নি, পরস্পর পরস্পরকে। চোখভরা বোবা বন্ধুতার দৃষ্টিতে।

সোহিনী বললে, 'আজ তো আফিস কোর্ট ছুটি, মিছিল বেরুবার পর থেকে এ অঞ্চলে ট্রাম নেই, তুমি কেন বেরুচ্ছ?'

'ওরে বাবা, ভীষণ জরুরি একটা কাজ পড়ে আছে আফিসে না গেলেই নয়। তা ছাড়া,' সুপ্রভাত জানলা দিয়ে তাকাল দূর মিছিলের দিকে: 'না যাওয়ারই বা কারণ কি! ঘটনার মধ্যে শুধু তো একটা মিছিল। ট্রাম এ-অঞ্চলে না থাক অন্য অঞ্চলে পাব। তা ছাড়া পায়ে-হাঁটা লোককে আটকাবে কে? আটকাবেই বা কেন?' সুপ্রভাত বেরিয়ে গেল।

বেলা তিনটে পর্যন্ত চলল শোভাযাত্রা। আনন্দ কোলাহল। ফূর্তি। রঙ্গতরঙ্গিমা।

এই? শেষ পর্যন্ত চাপল্যের হাওয়াতেই উড়ে গেল ভয়ের মেঘ? ঝড়ের পত্র? মনে মনে হাসল ভবতোষ। মিশিরকে বললে ফিরে যেতে।

মিশিরও গিয়েছে, ডেকে উঠেছে কোটালের বান। দঙ্গলে দঙ্গলে বেরিয়ে আসছে লোক হৈ-হৈ করতে-করতে। হাতে লাঠি বল্লম শাবল তরোয়াল। ওরা কারা? ওরা লুঠেল, লুট করতে বেরিয়েছে।

রাস্তার মোড়ে একটা রেডিওর দোকান লুট হয়ে গেল। একটা বাসনের দোকান। একটা মুদিখানা।

ছুরি চলল এদিক ওদিক।

মল্লিক বাজারে ঢুকে পড়েছে একদল, দরাজ-হাতে শুরু হয়েছে লুটতরাজ। দরকার-অদরকার যে যা পারছে নিচ্ছে ঝুড়িতে করে, ছালায় পুরে, ঠেলায় চাপিয়ে। লুটেরাদের মধ্যে আবার পড়ে গিয়েছে কাড়াকাড়ি। তোরা আবার মারামারি করিস কেন? জিনিসের অভাব কি? এক বাজারে না কুলোয় আরো কত শত বাজার আছে কলকাতায়। খোদ লালবাজারই যখন আমাদের তখন সব বাজারেই আমরা লাল।

হ্যাঁ, লাল। বাজার না ছাড়ে আগুন লাগিয়ে দে। নিচে রক্তের লাল, উপরে আগুনের লাল।

'মীনাক্ষী!' পুত্রবধূকে ডাকলেন চৌধুরী 'প্রদোষকে পাঠিয়ে দাও।'

প্রদোষ এলে চৌধুরী বললেন 'ফোন করে দিয়েছ?'

'দিয়েছি।' প্রদোষ বললে।

'কোথায়?'

'সর্বত্র।'

'সর্বত্র?' হাঁ করে রইলেন চৌধুরী। তাঁর নিচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল: 'কোথাও পেলে?'

'কোথাও না। কোথাও কোনো কনেকশান নেই।'

পুলিশ নেই ফৌজ নেই রাষ্ট্র নেই মন্ত্রী নেই। দয়া নেই ক্ষমা নেই বিচার নেই ভালোবাসা নেই।

'তা হলে কি হবে?' চৌধুরীর মাথার সব কটি চুল খাড়া হয়ে উঠল।

'সত্যি কি হবে?' ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এল সোহিনী: 'উনি তো এখনো এলেন না। রাস্তায় ছুরি চলেছে, সব বলছে লোকেরা, কোথায় কি করে তাঁর তবে খোঁজ করব—'

নলিনেশ বললে, 'স্ট্যাবিংএর খবর পেয়েছে, তাই এ পথে আর পা বাড়ায়নি। ভালোই করেছে, বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। এখন কে কোথায় খোঁজ করবে?'

'আমি যাব খোঁজ করতে?' ক্ষেত্র এগিয়ে এল।

বিষাক্ত চোখে তার দিকে তাকাল সোহিনী। চাকরে-মুনিবে এ আবার নতুন কি ষড়যন্ত্র কে বলবে। নিজে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ থেকে চাকরের হাতে চাবি রেখে দেওয়ার মতনই হীন কোনো বোঝাপড়া হয়তো।

এখনো তো ঠিক পাড়ার মধ্যে কোনো গোলমাল নেই, যা হচ্ছে দূরে-দূরে, এণ্টালি-মৌলালির দিকে।' বললে ক্ষেত্র 'এ দিকটা তো এখনো বেশ নর্মাল—' দু-একটা ইংরিজি বলে ক্ষেত্র 'তা ছাড়া দক্ষিণ দিকে চলে যাব, সে দিকটা তো আমাদের কিসসু ভয় নেই। আমার মনে হচ্ছে—'

সকলে তাকাল ক্ষেত্রর দিকে।

'আমার মনে হচ্ছে বাবু ভয় পেয়ে সটান তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতেই চলে গেছেন। ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসব?'

নলিনেশ হাসল। সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তার মানে ও পালিয়ে যেতে চাইছে। যে নিজের থেকেই পালাতে চায় তাকে আটকে রেখে লাভ নেই। তাকে যেতে দেওয়াই ভালো।'

ক্ষেত্র দক্ষিণ দিকে পা চালাল। খানিকটা এসে চারদিক তাকিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। গান ধরল গুনগুনিয়ে।

নলিনেশ জিগগেস করল, 'আপনার ঠাকুরটা আছে?'

'না থাকার মধ্যে।' হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না সোহিনী: 'দেয়ালের কোণে মিশে গিয়ে কাঁপছে ঠকঠক করে। মুখে বিড়বিড় করে কি বলছে অনবরত।'

'বোধ হয় জগন্নাথের নাম বলছে।'

'তুমি কোন নাথের নাম করবে কে জানে!' কুণ্ঠিত কুটিল চোখে নলিনেশকে বিদ্ধ করল পরমা।

আশ্চর্য, ভবানীপুরেব বাড়িতে গিয়ে গা-ঢাকা দিতে পারল সুপ্রভাত! যেমন চাকর তেমনি মুনিব। আলাদ বাসা নিয়ে থাকে গোড়াগুড়ি থেকেই সুপ্রভাতের ইচ্ছে ছিল না। আজ, এখন, একসঙ্গে সবাই থাকলে কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হতে পারত। থাকো একা, স্বাধীন-উদ্দাম যাতে নীলাদ্রির সঙ্গে মিলতে পারো—এ কি তারই প্রতিবাদ, তারই প্রতিশোধ?

না, ফিরতি পথের বিপদও তো অস্বীকার করবার নয়। যদি সেই জন্যেই পিছু হটে গিয়ে থাকে তো বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছে। অত সহজ করেই বা ভাবছে কেন? যদি সুপ্রভাতের নিজেরই হয়ে থাকে কোনো কঠিন বিপদ? চোখে অন্ধকার দেখল সোহিনী।

'রান্নাবান্না আজ হবে?' জিগগেস করল নলিনেশ।

'আর রান্নাবান্না!' স্বাদহীন শুকনো গলায় সোহিনী বললে।

'বা, আমি রাঁধছি। আমার এখানে খাবি।' সংশয়বঙ্কিম চোখে পরমা আবার বিদ্ধ করল নলিনেশকে· 'যা হবার হোক আমরা দুজনে একসঙ্গে।'

'আমরা দুজনে একসঙ্গে।' সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে উঠে এল হাসিনা।

এ কি ভয়ঙ্কর কথা! তুমি এখানে কি করে! ঘরের দরজা খুলে ভবতোষ আর নীলিমা বিবর্ণ হয়ে গেল।

'আব্বা দোবগোড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন।' ঘরের মধ্যে চলে এসে উজ্জ্বল নির্মল মুখে বলতে লাগল হাসিনা: 'সদর খুলিয়ে পাঠিয়ে দিলেন উপরে। পাছে কেউ দেখে ফেলে, চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।'

'এ কি, তোমাকে আমরা রাখব কোথায়?' ব্লটিং কাগজের মত শোষা, সাদা হয়ে গিয়েছে মুখ, বললে ভবতোষ।

'কেন, টুকটুকির পাশটিতে।' বলে স্তব্ধীভূত টুকটুকির হাত ধরল

হাসিনা: 'আব্বা বললেন, আমাদের বাড়ি যদি বড়ো হত তাহলে আপনাদের সব্বাইকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতাম। বাড়ি ছোট বলেই একা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের পাশে গিয়ে যাতে দাঁড়াতে পারি—'

এত দয়া এত ক্ষমা এত বিচার এত ভালোবাসাও ভাবা যায় সংসারে!

'কিন্তু তুমি আমাদের পাশে দাঁড়াবে কি!' এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবে গিয়েছে এমনি মুখে বললে নীলিমা, 'তোমাকে নিয়ে আমাদের বিপদ তো বাড়বে। ওরা যখন বুঝবে তোমাকে আমরা এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছি, তখন ওদের অত্যাচার আরো মর্মান্তিক হবে—'

'মোটেও না।' অগাধ সরল সজীব মুখে বললে হাসিনা, 'যদি দাঙ্গাবাজরা বাড়িতে ঢোকে, হামলা করে, আমি বলব—খবরদার, ওরা আমাদের লোক, ওদের ওপর চলবে না জুলুম চলবে না জবরদস্তি। বলে কোরানশরিফ তেলাওয়াত করব, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়ে দেব দরকার হলে—কিচ্ছু করতে পারবে না ওবা দেখবেন—'

'তুমি সমস্ত রাত থাকবে এ-বাড়ি?' কপালে চোখ তুলল নীলিমা।

'থাকব। থাকব টুকটুকির পাশে। সারারাত আমরা দুজনে খোদাকে ডাকব, খোদাব রহম চাইব—' তারপর নীলিমাব দিকে এগিয়ে এসে কানে-কানে বলাব মত করে বললে 'আব্বা বলে দিলেন—গায়ে কেউ গয়না রাখবেন না। ওদের কেবল লুটের দিকে লক্ষ্য'

টুকটুকি বললে, 'হাসিনা, তুই কি স্বর্গের দেবী?'

'মোটেও না। আমি মাটির মানুষ। আমি তোব বন্ধু।'

ছাদের উপরে যে চিলেকোঠা তাতে ভবতোষের আছে একটা ভাঙাভাঙা কাঠের বাক্স। চাকর ভূষণকে সঙ্গে নিয়ে নীলিমা উপরে গেল সেই কাঠের বাক্সে হাবজাগোবজা জিনিস পুরতে, যত রাজ্যের বাজে অখ্যাত জিনিস, ঘুঁটে গুল নারকোলের ছোবড়া, তারই তলায় লুকিয়ে রাখল গয়নাভরা ন্যাকড়ার পুঁটলি।

হাসিনা বললে, 'আর আব্বা বলে দিলেন বন্দুক লাঠি যদি কিছু থাকে তা যেন লুকিয়ে ফেলা হয়। ইট-লোহা মজুত থাকলে যেন তা ছোঁড়া না হয় ডাকাতদেব উপর—'

'সে আর বলতে।' ভবতোষ সায় দিল 'যদি হাজাব-হাজার লোক আসে একটা বন্দুক-লাঠি কি করবে? ববং ওসব ব্যবহার করলে ফল হবে উল্টো। প্রাণে-মানে কাউকে বাঁচতে হবে না। সব বুঝি, মা, সব বুঝি। তুমি এসেছ তুমি আছ এই আমাদের নির্ভয়—ঈশ্বরকে কোনোদিন ভাবিনি —আজ বলি এই আমাদেব ঈশ্বরের আশীর্বাদ—'

নিচের তলার লোকেরা, মানে সবখেলের পরিবার উঠে এসেছে ছাদে। ডাক্তারের পরিবারও। শুধু করুণা দেবানন্দকে ছাড়েনি।

ছাদে ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছে আভাস। চিলেকোঠার ছাদে উঠে শিক ধরে ধরে—একটা ধরে আরেকটাতে পা রেখে কায়ক্লেশে চলে যাওয়া যাবে চৌধুরীদের ছাদে। সন্দেহ কি, চৌধুরীদের বাড়ি বেশি মজবুত, বেশি সুরক্ষিত। কিন্তু পুরুষরা পারলেও মেয়েরা কি পারবে? অনেকটা উঁচু থেকে যেন লাফ দিতে হবে ও-ছাদে। পারবে কি টুকটুকি?

ভবতোষ আর নীলিমাকেও ছাদে পাঠিয়ে দিল হাসিনা। বললে, 'আমি আর টুকটুকি থাকি ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে। আক্রমণ হলে আমরাও ছাদে যাব।' তারপর হাসল সেই ভুবনমোহন হাসি· 'আগেই কৌতূহলের বাজারে আমার ভেলকির ঝাঁপি খুলে দিই কেন?'

যে যা পেবেছে খেয়ে নিয়েছে. বেশির ভাগই উপবাস। টুকটুকি আর হাসিনা ভাগাভাগি করে কিছু বিস্কুট আর সন্দেশ খেয়েছে, তাই তাদের রাজভোগ।

সব ঘরে আলো নেভানো। রাস্তায় শুধু লাঠির ঠকঠক। ভারী পায়ের চলাফেরার শব্দ। আর মাঝে-মাঝে ঘোষণা. 'এসব বাড়িও লুট করা হবে। এসব বাড়িও।'

ছাদ থেকে দেখা যায় কাছে-দূরে জ্বলছে আগুনের শিষ। তারও উর্ধ্বে জ্বলছে আকাশের চাঁদ. জ্বলছে তারার হীবেব টুকরো। যেন রক্তাক্ত আকাশে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন।

তাহলেও যেন বড়ো বেশি অন্ধকার। আলো, দিনেব আলো. সহজ-স্বভাবের স্পর্শ এসে চোখে লাগুক। এই অন্ধকাবেব অবসান হোক।

সারারাতই শুধু লাঠি ঠকঠক। ভারী পায়ের শব্দ। আব থেকে থেকে হিংস্র গলার হুমকি।

'ভোর হতেই ভোরের মত হাসল হাসিনা। বললে 'কালরাত্রি কেটে গেছে আর তবে ভয় নেই। খোদার কুদরতের শান কে বলতে পাবে। এবার আমি বাড়ি যাব জেঠিমা।'

'একা যাবে কি করে?'

'না, ঐ তো আব্বা আসছেন।' দূর থেকে দেখা গেল ফরিদকে।

ফরিদের হাতে মেয়েকে নির্বিঘ্নে সমর্পণ করতে পেরে শান্তি পেল ভবতোষ। কিন্তু দূরে-দাঁড়ানো জনতার দৃষ্টি এড়াতে পারল না। জনতা অনুসরণ করল ফরিদকে। দেখল. ফরিদ তাদের লক্ষ্যের বিষয় নয়,

কিন্তু তাদের অভিযোগ, তার স-কন্যা ও-বাড়িতে যাওয়া কেন এবং তা শান্তার মূর্তিতে না হয়ে ত্রাতার মূর্তিতে, বন্ধুর মূর্তিতে কেন?

হাসিনা বললে, 'ওরা যে আমাদের আপনার লোক।'

'ওরা কখনো আমাদের আপনার হয়?' গর্জে উঠল ভিড়ের থেকে।

'কখনো নয়, কখনো নয়।' একদল ভবতোষের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

হাসিনাকে বাড়িতে রেখে ফরিদ আবার এল ভবতোষের সাহায্যে। তখন জনতা জোয়ারের জলের মত ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সাধ্য নেই সেই ঢেউ ভেদ করে ফরিদ। কতগুলি লোক তাকে ধরে ঠেলতে ঠেলতে হটিয়ে দিতে লাগল, ঠেলতে ঠেলতে একেবারে ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। অত দয়া বা অনুরোধ দেখাতে এস না। মারা পড়বে। এতিম মজুর ঢের পাবে দুনিয়ায়।

জঙ্গীর দল বাঁশের ঘা মারছে সদরে।

'সব ছাদে যাও, সব ছাদে এস।' উপরে-নিচে সমানে গরজাতে লাগল ভবতোষ।

রাত্রির পর যে যার সংসারে ফিরেছিল, ভেবেছিল বিপদ বুঝি কেটে গিয়েছে, দিন এল মানে আরাম এল হঠাৎ আবার এ কি ধূমকেতু! উপরে-নিচে শুরু হয়ে গেল ছুটোছুটি। চাপা কণ্ঠের ভয়ার্ত চীৎকার।

দরজায় বাঁশের উদ্ধত আস্ফালন।

করুণা স্বামীকে আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। যেন তার বিস্তৃত পক্ষ দিয়ে আবৃত করবে স্বামীকে। যেন স্বামীর এই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেই রয়েছে তাব আশ্রয় তার অব্যাহতি।

শান্তস্বরে দেবানন্দ বললে, 'ওঠো। তুমিও ছাদে যাও।'

'না, না, যাব না, যাব না তোমাকে ছেড়ে।'

'না ছেড়ে গেলে লাভ হবে কি! তোমাকে জোর করে ছাড়িয়ে নেবে। তাতে কি আমার রোগ সারবে? মাঝখান থেকে তোমাকে হারাব। যাও, ওঠো, দেরি কোরো না।'

'তোমাকে ওরা মেবে ফেলবে।'

'এমন দয়া কি হবে ওদের?' দেবানন্দের দুই চোখ চকচক করে উঠল। বললে, 'আমাকে মাবুক না মাবুক তোমাকে দয়া করুক। তুমি বাঁচো। তুমি বাঁচো। যাও, পালাও।'

করুণাকে দেবানন্দ ঠেলে পাঠিয়ে দিল ছাদে।

সদর ভেঙে পড়ল।

নীলিমাকে ভবতোষ বললে, 'আমি সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াই। জনতার মুখোমুখি হই। তুমি দোতলার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছাদে পালাও।'

ভবতোষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। পিছনের দরজা বন্ধ করল নীলিমা।

'কে তোমাদের লিডার?' সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়াল ভবতোষ।

'আমরা সবাই লিডার।' জনতা একবাক্যে শব্দিত হয়ে উঠল।

যাকে কাছে পেল তারই গলা জড়িয়ে ধরল ভবতোষ। বোকার মত শোনাচ্ছে তবু বললে, 'কেন আমাদের আক্রমণ করছ? আমরা সরকারি কর্মচারী। তোমরাই তো সরকার, আমরা তো তাই তোমাদের লোক।'

'আমাদের লোক! দেখ তো লেটারবক্সে কি নাম লেখা।'

চন্দ। মার, মার ছুঁড়ে লেটারবক্স। দুর্বৃত্তদের একজন ভবতোষের দিকে লেটারবক্স ছুঁড়ে মারল। ভবতোষের কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল অঝোরে।

ভেঙে ফেলল দ্বিতীয় দরজা, দোতলার দরজা।

শুধু এ-বাড়ি নয়, আশেপাশে আরো বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে একসঙ্গে।

দিন বলে মনে হয় না, মনে হয় নিঝুম রাত। লোকালয় বলে মনে হয় না, মনে হয় জঙ্গল। মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় দুঃস্বপ্নের ছায়ামূর্তি।

হালদারের বাড়িও চড়াও হয়েছে।

হালদারের বাড়ির সকলে ছেলেমেয়ে ছোট-বুড়ো সবাই জড়ো হয়ে বসেছে গোল হয়ে। স্তব্ধ হয়ে মৃত্যুনাম জপ করছে। লেটারবক্সে নাম দেখ, কার বাড়ি। শুনতে পেল বাইরে থেকে গর্জন হচ্ছে জনতার। কে একজন পড়লে, হায়দর, এল হায়দর। আরে, এ তো আমাদের লোক। একে ছুঁসনে। চলে আয় বেআকুব।

একেবারে হুবহু, আলাউদ্দিনের জিপ এসে গিয়েছে। এখন, এই-ই তো বিপন্ময় মুহূর্ত, ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছে বন্ধু।

দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেব আর তার আড়ালে গীতালি। আর তার আড়ালে কাকিমা।

একটি পলক ফেলবার পর্যন্ত সময় নেই, এখুনি, এই অবস্থায়, যেমনটি আছেন উঠে পড়ুন জিপে। মোড়ে ঠেঙাড়ের দল তৈরি। নক্ষত্রবেগে বেরিয়ে যেতে হবে।

জিপে আরো ক'জন মহিলা ও শিশু আছে। সব আলাউদ্দিনের ব্যক্তিগত বন্ধুতার সুতো দিয়ে বাঁধা।

চলে আসুন। শিগগির, শিগগির।

'তুমি ওঠো।' গীতালিকে বললে বাসুদেব, 'আমি খোকনকে নিয়ে আসছি উপর থেকে।' বাসুদেব ছুটল উপরে।

কাকিমাকে আগে তুলে গীতালিও উঠে বসল। কিন্তু খোকনকে নিয়ে বাসুদেবের নেমে আসতে কি একটু দেরি হচ্ছে? সাজগোজের কি দরকার? এমনি বুকে করে নেমে এলেই তো হয়!

আর এক বিন্দুও দেরি করবার সময় নেই ড্রাইভারের।

'খোকন, আমার খোকন—' চিৎকার করে উঠল গীতালি।

'পারি তো পরের ট্রিপে নিয়ে যাব।' ড্রাইভার বেরিয়ে গেল তীরের মত।

দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে ভবতোষও দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে। ওরা খুঁজছে লুটের মাল আর ও খুঁজছে টিঙচার আয়োডিন আর তুলো।

ব্র্যাকেটের থেকে একটা ধুতি তুলে নিয়ে ফালা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ব্যাণ্ডেজ তৈরি করল ভবতোষ। কিন্তু মাথায় বেঁধে দেয় কে? ডাক্তার তো ছাতে শিক ধরে ডিঙোবার চেষ্টা করছে। নিজের হাতে মাথার ব্যাণ্ডেজটা কিছুতেই ভবতোষ কায়দা করতে পারছে না, বারে বারেই ফসকে ফসকে যাচ্ছে।

লেঠেলদের থেকে কে একজন এগিয়ে এসে বললে, 'দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

মুখটা চেনা চেনা লাগছে।

'আমাকে চেনেন। আমি আপনার ডিমওলা।' হাত লাগিয়ে পরিপাটি করে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ।

'তুমি কি পেলে?' জিগগেস করল ভবতোষ।

কিছুই পাইনি যদি আপনার হাতঘড়িটা দেন -' ডিমের মতন চোখ মেলে তাকাল ডিমওলা।

ভবতোষ খুলে দিল হাতঘড়ি।

পালাচ্ছে, পালাচ্ছে মেয়েরা পালাচ্ছে ছাদ দিয়ে, রাস্তার ওপার থেকে তুমুল শব্দ উঠল। ভবতোষ উঠতে চাইল ছাদে, তাকে বাধা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। আপনি আবার দল বাড়াতে যাচ্ছেন কেন? আপনি আপনার আলাদা পথ দেখুন। মেয়েরা কোথায় পালাবে? চৌধুরী-বাড়ি তো? সেখানে যাচ্ছি আমরা এর পর।

'হ্যাঁ, সেইখানে চল।' কে আর-একজন বললে, 'মরা জিনিসের বোঝা আর টানতে পারি না। এবার একটু জ্যান্ত জিনিসের বোঝা চাই—'

ভবতোষ নিচে নেমে এল। বাড়ির পিছন দিকের দরজা দিয়ে চাইল

বেরুতে। একটি অল্পবয়সের সুকুমার ছেলে দেখে তাকে কাছে ডাকল। বললে, 'তুমি তো ছাত্র?'

'হ্যাঁ, স্যার—'

'তবে আমাকে তুমি একটু সাহায্য করবে? কোনো নিরাপদ বাড়িতে পৌঁছে দেবে দয়া করে?'

'আসুন, স্যার—'

'তোমার হাতে এটা কি?'

একটু লজ্জিত হল ছেলেটি। বললে, 'একটা টাইপরাইটার।'

ভবতোষ লক্ষ্য করে দেখল তারই টাইপরাইটার। বললে, 'ভালোই হল ওটা পেলে। তুমি ছাত্র তোমার ওটা কাজে লাগবে।'

খিড়কির দরজা দিয়ে পিছনের গলিতে এল ভবতোষ। এমন দৃশ্য দেখবে স্বপ্নেও তা ভাবেনি। চৌধুরীর যে লৌহদণ্ড নিষেধের তর্জনী হয়ে ছিল তাই এখন আহ্বানের সঙ্কেত হয়ে উঠেছে। সেই দণ্ড ধরে-ধরে পার হচ্ছে এ ছাদের লোক, আর ঐ ছাদে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হাতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করছে চৌধুরী। নিজে হাত বাড়িয়ে লুফে নিচ্ছে। লাফাতে গিয়ে যাতে চোট না পায় তার জন্যে ছাদের উপর নিজ-হাতে বিছিয়ে দিচ্ছে গদি-তোষক। ওরে, আমার লোক বড়ো কম, তোরা সকলে আয় আমার কাছে, সকলকে নিয়ে আমি একত্র হই, এ বাড়িতেও হয়তো ওরা আসবে, তা আসুক, কিন্তু ওরা দেখে যাক, আমি একা নই, আমি সকলের সঙ্গে সমতল।

'এটা মনসুর ডাক্তারের বাড়ি। খুব ভালো লোক। দরজায় ঘা দিন।' ছাত্র ছেলেটি বললে।

দরজায় ঘা দিতে বেরুল মনসুর। নমস্কার করে বললে 'মাপ করুন। আশ্রয় দিতে গেলে আক্রান্ত হব।' দরজা বন্ধ করে দিল সজোরে।

'চলুন, পাশেই রহমান সাহেবের বাড়ি। তাঁর ওখানে অনেক দুঃস্থ পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। আপনাকে উনি ফেলবেন কি করে? উনি যে পুলিশ অফিসার।

'স্যার - ' নলিনেশের দরজায় কে টোকা মারল।

'কে?'

'আমাকে আপনি চেনেন। শিগগির খুলুন দরজা।'

না খুলেই বা করবে কি, দরজাটা একটু ফাঁক করল নলিনেশ। ফাঁক করতেই একটি যুবক ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। বললে, 'আমি মাহবুব। চিনতে পারছেন? আমি আপনার ছাত্র।'

নলিনেশ আমতাআমতা করতে লাগল। হবে হয়তো। ছাত্রের মুখের দিকে কি আর তাকিয়েছি কোনোদিন! কিন্তু কি ব্যাপার?

ব্যাপার সঙিন। এ বাড়ি আক্রান্ত হবে ঠিক হয়েছে।

'এ বাড়িতে আছে কি?'

'তর্ক করার বেশি কথা বলার সময় নেই, স্যার। এ বাড়িতে দুজন সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক আছেন। তাই নজর পড়েছে গুণ্ডাদের। বউদিদিদের ডাকুন, আমার সঙ্গে দিয়ে দিন এখুনি। নিয়ে যাই ওদের। ভয়ঙ্কর জটলা শুনে এসেছি রাস্তায়।'

বউদিদিদের ডাকবার দরকার নেই, সোহিনী-পরমা নিজের থেকেই চলে এসেছে ঘরের মধ্যে।

'কি যাবে এর সঙ্গে?' প্রশ্ন করল নলিনেশ।

পরমা একমুহূর্ত তাকাল নলিনেশের দিকে। ভয়পাওয়া সর্বস্বান্তের মত মুখের চেহারা। যেন এমন অবস্থায় এসেছে, পরমার মনে হল, এই প্রশ্ন এই প্রস্তাবই নলিনেশের পক্ষে সমীচীন, হয়তো বা স্বাভাবিক। শক্তি নেই যে বুক দিয়ে দাঁড়ায়, দুই বাহুতে লড়ে।

হয়তো ইচ্ছেও নেই।

বড় বেশি ক্লান্ত বড় বেশি অসহায়। যেন মুক্তি খুঁজছে, পলায়নের মুক্তি। তাই সঁপে দিতে চাইছে, চাইছে ভাসিয়ে দিতে অকূলে। তোমার যা খুশি তা হোক, যেদিকে খুশি ভেসে পড়ো, আমি বাঁচি, হাঁফ ছাড়ি।

কিংবা চাইছে হয়তো ম্লান করে দিতে, যাতে আর জ্বলতে না পারে তার নিখাদ ঔজ্জ্বল্যে। যেন তাহলেই বুঝি নলিনেশ মানসিক সাম্য পায়, কলঙ্ককে কলঙ্ক দিয়ে সম্ভাষণ করতে পাবে দুর্নামকে দুর্নাম দিয়ে।

দুচোখ ছলছল করে উঠল পরমার।

কিন্তু, এও ভাবল, লড়ে যদি প্রাণই দেয় নলিনেশ তাতে সুরাহা কি! পরমার মান কি তাতে বাড়বে? ছড়িয়ে পড়বে তার শুভ্রতার সৌরভ?

তবু যদি বলতে পারত নলিনেশ আমরা দুজনে লড়ব, দুজনে মরব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাও কি কেউ বলে? বলা সম্ভব? যদি পালিয়ে বাঁচবার পথ থাকে!

'কি, যাবে এর সঙ্গে?' নলিনেশ আবার বললে। চোখের দিকে তাকাতে পারল না, দেয়ালের দিকে মুখ করে রইল।

'আমার সঙ্গে গেলেও যাবেন, যারা আসছে তাদের সঙ্গে গেলেও যাবেন।' অদ্ভুত জোরের সঙ্গে বললে মাহবুব, 'তবে আমার পক্ষে বলবার কথা, আমি ছাত্র। স্যারের আমাকে চেনবার কথা, যদিও ঠিক মনে করতে পারছেন না

'মনে হচ্ছে।' তারপর পরমার দিকে তাকিয়ে : 'আপনি আমাকে কি করে চিনবেন?' আমি আপনার আগে বেরিয়ে এসেছি। এখন আছি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে—'।

আমি ছাত্র—এর চেয়ে বিশুদ্ধতর পরিচয় যেন হতে নেই।

পরমা তাকাল মাহবুবের দিকে। শান্ত, সুচারুদর্শন। কোথাও যেন একটু স্নিগ্ধতা আছে, দাঁড়াবার মাটি আছে পায়ের নিচে, ধরবার মত আছে কিছু দড়িদড়া। আর যদি মাটি সরে যায়, ছিঁড়ে যায় পাশরজ্জু, কি করা যাবে! আর কি বা আছে করণীয়! ভাসবে, ডুববে, যাবে তলিয়ে। এমন যার স্বামী তার আর কি হতে পারে অদৃষ্ট! কিসের তার আর তবে নির্বাচনের মর্যাদা! একবার মরেছে, না হয় আরেকবার মরবে। দেখবে সে এই নতুন মৃত্যুর চেহারা। কাপুরুষ কোথাকার!

'যাব।' বললে পরমা।

'আর আপনি?' সোহিনীকে প্রশ্ন করল নলিনেশ।

সোহিনীর বুকের মধ্যে তার শূন্য ঘর হাহাকার করে উঠল। ইচ্ছে করেই সুপ্রভাত তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে গিয়েছে এ আর এখন সে ভাবতে পারছে না। বিপদে পড়ে সুপ্রভাতই আসতে পারছে না উদ্ধারে—এ চিন্তায়ই বেশি সুখ, বেশি তৃপ্তি। আর, যাই করুক সুপ্রভাত সজ্ঞানে এই স্ত্রী সমর্পণ করে দেওয়ার দুষ্কৃতির চেয়ে তা ভালো। কিন্তু পরমা যদি যায় তা হলে সোহিনীই বা থাকে কি করে, কাকে ধরে? কে তাকে দেখে, কে তাকে বাঁচায়? আর, সত্যি করে দেখলে, তার বাঁচবারই বা মুখ কোথায়? সাধে কি আর সুপ্রভাত ছেড়ে দিয়েছে তাকে? ঠিকই করেছে। এবার বুঝি কালো মুখ সত্যিই কালো হয় আর যেন দেখতে না হয় দিনের আলোয়। সুপ্রভাত যেন ভালো থাকে তাকে কোনো বিপদ যেন না স্পর্শ করে। সোহিনীর কপালে যা আছে তা হোক। ইতিহাস বলবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে আততায়ীরা নিয়ে গেছে, স্বামী নিজের হাতে বিলিয়ে দেয়নি। সেই তার সুপ্রভাতের সম্বন্ধে গর্ব। সোহিনী যেন আর না ফেরে। যেন একটা ছুরি আমূল বেঁধে তার বুকের মধ্যে।

'আমিও যাব।' পরমাকে আঁকড়ে ধরল সোহিনী।

'তা হলে যত গয়না আছে সব পরে আসুন গা ভরে।' বললে মহাবুব। 'আর, একটা করে ভারি চাদর, পর্দাই হোক আর সুজনিই হোক, মোটা করে গায়ে জড়িয়ে নিন। আর লম্বা করে টেনে দিন ঘোমটা।'

এটা কি আশার ইশারা? কোন আশার? সে আশা কি সামনের না পিছনের? চলবার না ফেরবার?

মোটা করে গা ঢাকল দুজনে। এককণা সোনাদানাও ফেলে গেল না। উষসীর দেওয়া হারটাও না।

'আসুন।' মাহবুব দুজনকে ডেকে নিল অন্ধকারে। বাড়ির বাইরে।

এখন নলিনেশ একা ঘরে কি করবে? গান গাইতে তো জানে না, কবিতা পড়বে?

ঘরদোর বন্ধ করে অন্ধকারে অনড়ের মত বসে রইল। এ কি হল ভাবতে চাইল আদ্যোপান্ত। চেতনায় কোথাও একটা রেখা টানতে পারল না। চারদিকের কোলাহল কানে বাজতে লাগল একটা একত্রিত ধিক্কারের মত। এ সে কি করল! কে মাহবুব? কোথায়, কবে সে তাকে দেখেছে, কিসের সে ছাত্র? না, দেব না পরমাকে, মানুষের মত, পুরুষের মত একবারও বলতে পারল না? মুখ দিয়ে বার করতে পারল না? যে হামলাই আসুক, প্রতিরোধ করব, লড়ব, মরব, প্রেমের ইতিহাসে রক্তের লিপিতে রেখে যাব বীরত্বের স্বাক্ষর! যে কলঙ্কের ছাই চারদিক থেকে আচ্ছন্ন করেছে তার থেকে বেরিয়ে আসব দহনসুন্দর কাঞ্চনের মত।

কিন্তু এ কি রকম হয়ে গেল? কি ভাবছে তাকে পরমা? কেন, কৌশলও তো জয়ের উপায়। যুদ্ধ করব মুখে বললেই কি যুদ্ধ হয়? হয়তো নলিনেশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেই আততায়ীর দল নিয়ে যেত পরমাকে, নলিনেশকে দিতই না মহত্ত্বের নিশান পুঁততে। বরং বাধাই বিঘ্নকে নগ্নতর করত। এটুকু কি বুঝবেনা পরমা? কিন্তু কেমন মুখ করে চলে গেল! অনাথ-অনাদৃতের মত। সব অটুট থাকতেও কেমন লুণ্ঠিতের মত। যেন আর কোনোদিন ফিরবে না চলে যাবে নিস্তব্ধের দেশে, নিশ্চিহ্নের দেশে।

আততায়ীর দল ঢুকে পড়েছে দেবানন্দের ঘরে।

'কি, তুমি বুঝি ডিঙোতে পারনি?' ছুরি হাতে কে একজন জিগগেস করলে ঝুঁকে পড়ে।

'তুমি যদি দয়া করে দাও আমাকে পার করে। দেবে?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, আমি চোখ বুজি আর তোমার ঐ অমৃতের স্পর্শটা আমূল ডুবিয়ে দাও আমার বুকের মধ্যে, আর আমি মুহূর্তে শুধু এই বাড়ির ছাদ নয়, পৃথিবীর ছাদ ডিঙিয়ে চলে যাই—'

'আমার সময় নেই। বাক্স প্যাঁটরা কি আছে তাই খুলে দেখাও—'

আরেক দল ঢুকেছে বাসুদেবের বাড়ি।

ঘর-দোর সব হাট করে খোলা। ভিতরে নেই কোনো লোকজন, জিনসপত্র যেমন-কে-তেমন সাজানো-গোছানো। ঘরের লোক কোন ফাঁকে সরে পড়েছে খিড়কি দিয়ে। কিন্তু এ কি, এ ছেলে কার?

একা-একা অনেক কেঁদেছে, অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, এখন বুঝি ঘরের মেঝেতে বসে আপন মনে খেলছে খেলনা নিয়ে।

লোক দেখতে পেয়েই খোকন কেঁদে উঠল হাত বাড়িয়ে দিল। বললে, 'মা যাব।'

ছোরাটাকে বাগিয়ে ধরে ছেলেটাকে কোলে নিল লোকটা। আরেকজনের কোলে চালান করে দিয়ে বললে, 'এই, এটাকে থানায় জিম্মা করে দিয়ে আয়।'

'চল, তোকে তোর মার কাছে নিয়ে যাই।'

সেই আগন্তুকের কোলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খোকন। যখন সে একবার তার মায়ের খবর পেয়েছে তখন আর তার ভয় কি, কান্না কি। কোথায় মা, কে এই লোক, কে হিসেব করে। মা যাব—এটুকুর বেশি জানেনা খোকন। এটুকু জেনেই তার ঝাঁপ দেওয়া অজানায়।

আরেক দল ঢুকেছে নলিনেশের বাড়ি।

সব আনাচ-কানাচ খোঁজাখুঁজির পর তারা বললে 'এ বাড়িতে যে দুজন আওরত ছিল তারা কোথায় গেল?'

'তাদের একজন এসে নিয়ে গেছে।'

'আমাদের কেউ?'

'জানি না, তবে নাম বললে মাহবুব।'

'বাস, তা হলেই হল। তুমি তা হলে আছ কি করতে?'

একজন ছোরা উঁচিয়ে এল, বললে, 'দেব নাকি সাবড়ে?'

'আমি তো সবচেয়ে দামি জিনিস সারেন্ডার করে দিয়েছি, কোনো বাধা দিইনি, লড়াই করিনি, তবে আমাকে মারবে কেন?' কাতর সানুনয় মুখে বললে নলিনেশ।

'ছোড় দো। যাকে হোক আমাদের একজনকেই যখন দিয়ে দিয়েছে তখন একে আর মেরে কাজ নেই। তবে,' আগের কথার পুনরুক্তি করল 'তবে এই খালি ঘরে বা আছ কেন?'

'তারা যদি কোনোদিন ফিরে আসে তো কোন মূর্তিতে ফিরে আসে তা দেখবার জন্যে।' নলিনেশ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'আর এসেছে!' কুটিল চোখে হেসে উঠল লোকগুলি।

'মাহবুবের ঠিকানা কোথায় বলতে পারো?' কান্নার মত শোনাল নলিনেশকে : 'চেন তোমরা তাকে?'

'কে মাহবুব?' আবার হাসির হররা উঠল। এ যেন হাসি নয় ছিন্নভিন্ন কতগুলি অস্থিমাংসের হাহাকার।

আসল হামলা চৌধুরীর বাড়ি।

কোথায় কি দুর্গের দৃঢ়তা, লোহার ফটক, সব তৃণখণ্ড হয়ে গেল। সেই ধৃষ্ট কুকুর গেল কোথায়? ওটাকে আগে শেষ কর, ওটা কম জ্বালিয়েছে? যখনই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি গলা লম্বা করে খেঁকিয়েছে, আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেনি।

নিচে কোথাও দেখা গেল না কুকুরটাকে। কি করে যাবে? সমস্ত বিপন্ন ভয়ার্ত লোকের মত সেও আশ্রয় নিয়েছে ঠাকুরঘরে। এবং একেবারে চৌধুরীর কোলের মধ্যে। কি কৌশলে চৌধুরী তাকে শান্ত করে রেখেছেন। ও বুঝেছে, এখন চেঁচালেই প্রভুর বিপদ। তাই বাধ্য শিশুর মত চুপ করে আছে।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক ঢুকে পড়েছে, হাতে চিত্রবিচিত্র প্রহরণ। আর, একেই বলে লুট, বিশ্বের ভাণ্ডার যেন সঞ্চয় করে রেখেছেন চৌধুরী। কিন্তু এদের গয়নাগাটি কোথায়? সবই কি ব্যাঙ্কে? আটপৌরে গয়নার কিছু উদ্বৃত্ত কি তোলা থাকে না? সেসব কোথায়? সব বাক্স স্যুটকেশ আলমারির দরজাই তো খোলা পাচ্ছি কিন্তু ওদের হৃৎপিণ্ড কোথায়? বিরক্ত হয়ে বাক্স-স্যুটকেশ ছুঁড়ে মারতে লাগল, বিরক্ত হয়েই ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল আলমারি। আলমারির পর আলমারি। ঝন ঝন ঝন ঝন। সে শব্দ রক্তে তুফান তুলল চৌধুরীর। আর মন্দিরার। ইচ্ছে হল, গুলি-ভরা বন্দুকটা নিয়ে এসে দাঁড়াই সোজা হয়ে। সবচেয়ে আপসোস হল সামনের বস্তির গোয়ালাগুলো পালিয়ে গিয়েছে আগে আগে তাদেরকে দূরে ঠেলে রেখেছেন চিরকাল, আপন করেননি। তারা যদি নিজেদের আপন বলে বুঝতে পারত, পালিয়ে না যেত, আর সবাই একজোট হতে পারতাম, দেখতাম এ দাঙ্গা কার, মানুষের না পঙ্গপালের!

এখন এ নিয়ে অনুতাপ করা বৃথা। কুকুর কোলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকো।

আহা, একেই বলে লুট, লুটপাট, লুটমার—একেই বলে লুটেপুটে খাওয়া। গয়না নিয়ে লুটেরাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, পকেট ছেঁড়াছেঁড়ি। গয়না কি কমতি পড়েছে? উপরে যা না। ভারি গয়না, জ্যান্ত গয়না।

ঠাকুরঘরের দরজায় প্রবল আঘাত মারতে লাগল।

মন্দিরা দরজা খুলে দিলেন। বললেন, 'যা চাইবে তাই দেব, শুধু মেয়েদের গায়ে হাত দেবে না।'

'বেশ তাই।' রাজি হল লড়ায়ের দল : 'তবে বেটাছেলেদের আমাদের হাতে দিয়ে দিন।'

তার মানে কি ? বেটাছেলেদের কাটবে এককে করে, নিচে নিয়ে গিয়ে ? উপায় নেই, সর্ত করেছেন। নইলে মেয়েদের দিয়ে দিন।

না, ছেলেরাই বলি হবে। সব কিছুর চেয়ে মেয়েদের মান বড়। একে-একে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ছেলেদের। মেয়েরা চাদরে-কাপড়ে গা ঢাকা দিয়ে রইল। নীলিমা মুখ বার করে চেঁচিয়ে উঠল : 'ভূষণ, ভূষণ কোথায় গেল ?'

সব ফেলে চাকরের জন্যে কান্না!

ডাক্তার যেতে-যেতে বললে, 'সে আবার ছাদ ডিঙিয়ে চলে গেছে ও-বাড়ির ছাদে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল নীলিমা। যাক, বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। বেঁচে গিয়েছে এ যাত্রা।

পুরুষ সবাই নেমে গিয়েছে কিন্তু কাপড়চোপড়ের তলায় প্যাণ্ট-পরা ওটা কার পা নড়ছে ? পাশে বসে জয়া প্রাণপণে তাকে ঢাকাঢুকি দেবার চেষ্টা করছে, নিজের কাছে টেনেটুনে এনে আড়াল করতে চাইছে, কিন্তু বারেবারেই এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে পা। ও কে? ও এখানে কেন ?

'ও আমার ছেলে আভাস।' বললেন সরখেলের স্ত্রী 'ছাদ থেকে লাফিয়ে নামতে বাঁ পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙে ফেলেছে। এখন উঠতে পাচ্ছে না। দাঁড়াতে পাচ্ছে না—'

সেই ফুল তুলতে গিয়ে আরো কত উঁচু দেয়াল থেকে লাফিয়েছিলাম, কিছু হয়নি—আর আজ কিনা এই সামান্যটুকু লাফাতে গিয়ে পায়ের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেল-

'ওসব বুঝি না পুরুষ এখানে কেন ?' আততায়ী ঝকঝকে ছোরা তুলল আভাসকে লক্ষ্য করে।

মুহূর্তে কি হয়ে গেল কে বলবে ? টুকটুকি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আততায়ীর হাত চেপে ধরল। বললে, 'ও আমার লোক

কি বা গায়ের জোর টুকটুকির, ঐ তো পাতলা ছিপছিপে হিলহিলে মেয়ে, কিন্তু যেন স্পর্শে জাদুমন্ত্রের ঘোর লাগল। আততায়ী ফিরিয়ে নিল ছোরা, টুকটুকির দিকে সলজ্জ চোখে তাকিয়ে বললে, 'ঠিক আছে, থাক ও আপনাদের সঙ্গে। কিন্তু রাস্তায় ঐ একটা মিলিটারি লরি দাঁড়িয়ে আছে না ? দাঁড়ান দেখে আসি—'

আশ্চর্য, ঐ লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে কি ইঙ্গিতে নেমে গেল তার দলবল।

যে দু-একজন নামল না তারা ছোরা তুলে রইল সিঁড়ির মুখে কেউ যেন না এদিকে উঁকি মারতে আসে।

ঘটনার ঘূর্ণি উলটো দিকে পাক খেল।

রহমানের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভবতোষ মিলিটারি লরি দেখতে পেল। রহমানকে গিয়ে বললে, 'ঐ লরিকে ডাকান।'

'তার আগে এই ট্যাবলেট কটা খেয়ে ফেলুন। মাথার ঘাটা না বিগড়োয়।' রহমান ওষুধ দিল।

'ওষুধ পরে হবে। আগে ডাকান লরি।' ট্যাবলেট কটা আঙুল দিয়ে নাড়তে লাগল ভবতোষ।

'কাকে পাঠাব?'

'কাকে পাঠাবেন মানে? আপনি নিজে যান। ইউনিফর্ম পরুন।' ভবতোষ জোর গলায় বললে, 'আপনার কর্তব্য আপনাকে ডাকছে। উঠুন।'

যেন অভ্যাসবশেই ইউনিফর্ম পরল রহমান। কিন্তু তার ছেলেরা বাপকে ছেড়ে দিতে নারাজ। বললে, 'লরি এমনি এসে তুলে নিয়ে যায় নিক। কিন্তু এ বাড়িতে আশ্রিত আছে তাদের উদ্ধারের জন্যে বাবা নিজে তৎপর হয়ে লরি ডেকে এনেছেন দোরগোড়ায়, এ জানাজানি হলে বাবা খুন হয়ে যাবেন।'

'আপনি ট্যাবলেট কটা খান, একটু বিশ্রাম করুন দেখি আরো কতক্ষণ যাক ' বললে রহমান।

সেই ট্যাবলেট কটা আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল ভবতোষ। কে জানে কি। কে জানে খাঁটি কিনা, সত্যি-সত্যি ওষুধ কি না। না কি বিষ। মিত্রের বেশে শত্রুর কারসাজি।

'এই এক গ্লাশ পানি দে।' হাঁকলে রহমান।

জল এল কাঁচের গ্লাশে। ভবতোষ চোখ বুজল। খেয়ে ফেলল বড়ি কটা।

সেই আততায়ী ফিরে এল মেয়েদের কাছে। বললে 'চলুন, লরি পেয়েছি, লরিতে তুলে দিচ্ছি আপনাদের- '

মন্দিরা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর ছেলেরা, ছেলেরা কোথায় গেল? মিস্টার চৌধুরী? কুকুর?'

আততায়ী হাসল · 'সব নিচে আছেন। যদি একজনের লোক বাঁচে সবাইকার বাঁচবে।'

কিন্তু আভাসকে কি করে নামান হবে?

'আমরা কাঁধে করে নামাব।' বললে আততায়ী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা।

আততায়ী আভাসকে কাঁধে ফেলল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার কানে কানে বললে, 'কি রে, শেষকালে তোকেই মারতে ছোরা তুলেছিলাম!'

আশেপাশের ফিরিঙ্গি পরিবারের লোকগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। হাসাহাসি করছে। খুন-জখম দেখেও তাদের হাসাহাসি। ভয়বিহ্বল মানুষের অসহায় আর্তনাদ শুনেও।

মিলটারি লরির ড্রাইভারও ফিরিঙ্গি। সে বললে, 'হিন্দুদের নিয়ে যাবার অর্ডার নেই।'

'গায়ে কি লেখা আছে কার কোন ধর্ম?' আভাসের দলের লোকেরা ছেঁকে ধরল ড্রাইভারকে: 'এরা সব আমাদের লোক। নিয়ে যেতেই হবে।'

'বেশ, যাব, কিন্তু শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ নয়।'

এলগিন রোড অঞ্চলে চৌধুরীর শালির বাড়ি, আপাতত সেখানে নিয়ে চলো।

কুকুর কোলে নিয়ে বসেছেন চৌধুরী। লরি স্টার্ট দিল। দিতেই কুকুর উঠল শব্দ করে।

দুপুরের দিকেই নীলাদ্রির সঙ্গে সুপ্রভাতের দেখা।

নীলাদ্রিই এসেছে সুপ্রভাতদের ভবানীপুরের বাড়িতে খোঁজ করতে।

'নীলুদা, আপনি এসেছেন!' হাতে যেন স্বর্গ পেল সুপ্রভাত। ব্যাকুলস্বরে বললে, 'একবার যাবেন সোহিনীর কাছে?'

'কেন কোথায় সোহিনী?' নীলাদ্রি থমকে গেল।

'আমার পার্ক সার্কাসের বাড়িতে।'

'সে কি, আপনি এসেছেন আর সে আসেনি?' নীলাদ্রি যেন বিদ্ধ করল সুপ্রভাতকে।

'তাকে আনতে আর যেতে পারলাম কই?' সুপ্রভাতকে কান্নার মত শোনাল: 'আফিস থেকে বেরিয়েই শুনলাম আমাদের ওদিকে ভীষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এগুতেই পারলাম না। ভবানীপুরের বাড়িতে চলে এলাম।'

'পালিয়ে এলেন? ওকে একলা ফেলে রেখে পারলেন আসতে?'

একটা যেন প্রহারের মত লাগল নীলাদ্রির কথাটা। শুকনো মুখে সুপ্রভাত বললে, 'একলা কোথায়! বাড়িতে নলিনেশবাবু আছে পরমা আছে।'

'সে তো নিচে। দোতলায় তার নিজের সংসারে সে তো একা। তার সমস্যা তার। তাকে কে দেখে? তাছাড়া নলিনেশবাবুও পালিয়েছেন কিনা কে বলবে।'

'কিন্তু আপনি শোনেননি, সোহিনী বলেছে সে স্বাধীন সে নিরাপদ—'

তীক্ষ্ণ তিরস্কারের চোখে তাকাল নীলাদ্রি। বললে 'সেকথার প্রসঙ্গে এখনকার এ অবস্থার তুলনা? তা নিয়ে খোঁটা দেবার সময় এই? ছি ছি, আপনি কি!'

আশ্চর্য, প্রতিবাদ করতে পারল না সুপ্রভাত। নিজেকে সহসা কেমন দুর্বল, অসহায়, ছোট বলে মনে হল। নিঃস্বের মত বললে, 'এখন তবে কি করি?'

'এতক্ষণ তবে কি করছিলেন?'

'মনে মনে ছটফট করছিলাম।'

'তাই করুন। তাই বা মন্দ কি।' চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল নীলাদ্রি।

'নীলুদা।' সুপ্রভাত ডাকল। বললে 'নীলুদা, আপনি একবার যাবেন?'

'আমি?' নীলাদ্রি ফিরে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, আপনি শক্তিমান, আপনি পবিত্র, আপনি অসাধ্যসাধক।' তন্ময়ের মত বললে সুপ্রভাত।

'আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?' অন্তঃস্থলে যেন তীর ছুঁড়ল নীলাদ্রি।

'আমি?' সুপ্রভাত টলতে লাগল দ্বিধার আবর্তে।

'আপনি যদি যান তো যেতে পারি। চলুন—'

'আমি কি পারব?'

'আর পারবার কথা আমার! ছি ছি, লোকে আপনাকে কি বলবে! নিজেকেই বা আপনি কি বলবেন! এত বড় হার সইবেন কি করে?' আবার পা বাড়াল নীলাদ্রি।

'তবু, আমার অবস্থাটা ভাবুন।' সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রভাত এল কয়েক পা। বললে, 'আপনি যদি একবার যান—'

'বা, আমি যাব কেন? আমার কি। আপনার কাজ, আপনি করবেন।' নীলাদ্রি সাইকেলে বেরিয়ে গেল।

বার কতক উপর-নিচ করল সুপ্রভাত। ছাদে গেল, রাস্তায় বেরুল, আবার ঘরে ফিরে এসে দাঁড়াল জানলার শিক ধরে।

সোহিনী কি কাঁদছে? দেয়ালে মাথা ঠুকছে? বিধ্বস্ত হয়েছে কি তার ঔদ্ধত্যের রাজপ্রাসাদ? কাঙালিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে পথে? আঁচলে করে ধুলো কুড়োচ্ছে?

কাঙাল তো সে নিজে। তারই তো চূর্ণ হয়েছে পৌরুষের অহঙ্কার। সেই তো নিঃস্বত্ব, অকিঞ্চন।

যেন সোহিনী ভালো থাকে, নিটুট থাকে। যেন সুপ্রভাতের এই অসামর্থ্যের স্খালন হয়।

পোশাক পালটাল নীলাদ্রি। সাইকেলে করে বেরিয়ে গেল উত্তরে। বলেছিলে না, আমি ভীরু, আমি দুর্বল! তোমাকে উদ্ধার করতে পারব কিনা জানি না। তবে এ যেন কোনোদিন তোমার কানে যায়, আমি যাত্রা করেছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম—তোমার কুশলই মেনেছিলাম আমার কুশল বলে।

'আমার খোকন! আমার খোকন!' সমানে কাঁদছে গীতালি।

যে-বাড়িতে জিপ তাকে ছেড়ে গিয়েছে সে-বাড়িতেই এসেছে বাসুদেব। বলছে : 'ঘরের ভিতরে তখন ঢুকে গিয়েছে দাঙ্গাদাররা। আমাকে ভিতরে থাকতেই দিল না, উঠতেই দিল না উপরে। কত বললাম ছেলে আছে উপরে, নিয়ে আসি, কে শোনে কার কথা!'

'আমার খোকন! আমার খোকন!' কান্নার আর বিরাম নেই গীতালির।

সরখেলদের ফ্ল্যাটে নিচে যে দুজন পাঞ্জাবি আছে, তাদের সোনারুপোর দোকান। তাদের ঘরে ঢুকে ভূষণ বললে, 'আমাকে বাঁচান ছাদ বেয়ে আমাকে তাড়া করেছে।'

ঠেঙ্গাধারীর দল পাঞ্জাবিদের ঘরে চড়াও হল।

পাঞ্জাবিরা বললে, 'আমরা তোমাদের লোক।' আর ভূষণকে দেখিয়ে 'ও আমাদের।' বলে অজু করে নামাজ পড়তে বসল।

ছেড়ে দিল বিশ্বাস করে। ওরা চলে গেলে কোঁচড়ের ভিতর থেকে গয়নার পুঁটলি বের করল ভূষণ। সঙ্গে সঙ্গে দু পাটি বিকশিত দাঁত। বললে, 'আজকের দিনে যে পাবে সেই খাবে। কষুন, দাম কষুন, ওজন করুন।'

'পেলে কোথায়?' লোলুপ চোখে জিগগেস করল পাঞ্জাবিরা।

'ছাদের চিলেকোঠায় ডালাভাঙা কাঠের বাক্সে।' সত্য বলতে ঘাবড়াল না ভূষণ।

গয়না গয়নাই এই আসল সত্য, কার গয়না স্বপক্ষের না বিপক্ষের, এ অবান্তর।

'পরে যা হয় হবে।' বাক্সসাৎ করল পাঞ্জাবিরা। 'আগে তো বাঁচি সকলে।'

কিন্তু কে একজন এ-বাড়িতে চিৎকার করছে না?

এগিয়ে গেল ভূষণ। হ্যাঁ, দেবানন্দ ঘোষাল। ব্যথায়-যন্ত্রণায় অসহায় একাকিত্বে আর্তনাদ করছে।

'কিছু খবর বলতে পারো?'

'লরি করে কোথায় গিয়েছেন। আসবেন নিশ্চয়ই শিগগির। যতদিন না আসেন আমি সব দেখব-শুনব। আমি তো নেমকহারাম নই। বাবুরা ছাড়লেও আমি তো ছাড়তে পারি না বাড়িঘর।'

সন্ধ্যার দিকে ভবতোষের জন্যে গাড়ি করে দিল রহমান। ভবানীপুরে মাসির বাড়ি, সেদিকে চলল। কাছাকাছি এসে দেখল কে একটা লোককে কারা এলোধাবাড়ি বাঁশপেটা করছে।

গাড়ি থেকে নেমে বাধা দিল ভবতোষ : 'এ কি, ওকে মারছেন কেন? ও কি করেছে?'

'ও কি করেছে! ঐ যে আপনার মাথায় ব্যান্ডেজ আপনাকে তবে মেরেছে কে? লজ্জা করে না বলতে?'

'আমাকে মেরেছে কি এই নিরীহ রাজমিস্ত্রী, না কি এই শিশিবোতলওয়ালা বা ছাতাসেলাই?'

'হ্যাঁ, ওরাই মেরেছে।'

'মোটেই নয় ভাই, মোটেই নয়।' ভবতোষ গম্ভীর স্বরে বললে, 'আমাকে মাথায় যে মেরেছে সে ইংরেজ।'

লাঠি তুলে নিল আততায়ীরা। আহত লোকটিকে লরিতে বসিয়ে নিরাপদ এলেকায় পেঁৗছে দিল ভবতোষ।

এবার আগুন জ্বলছে ওদিকে, নিকিরিপাড়ায়, দর্জিদের বস্তিতে, দেখেশুনে চেয়েচিন্তে ছোট একখানা শালকরের দোকানে।

এদিকে রাস্তার জনতা কমে-কমে আসছে, ফুরিয়ে আসছে হৈ-হল্লা। কি ব্যাপার? ভয় ধরে গেছে, লরিবোঝাই হয়ে শিখেরা আসছে। আসুক, এবারই তবে হাওয়া বইবে প্রতিকূল।

সমস্ত ভয়ের ঊর্ধ্বে নির্ভয় আকাশ সমস্ত আগুনের ঊর্ধ্বে তারাগুলির ইশারা।

রাষ্ট্র হয়ে গেল, যারা যারা উদ্ধার পেয়েছে সমবেত হয়েছে থানায়, করায়া থানায়। পারো তো সেইখানে একবার ঘুরে এস।

তারার প্রত্যাশাভরা সন্ধ্যার আকাশের মত গীতালি বললে, 'আমিও যাব।'

'তুমি গিয়ে কি করবে? আমিই দেখে আসি।' বললে বাসুদেব।

'না, আমি যাব।' চোখের দিকে চেয়ে কান্নাভরা তীক্ষ্ণ চিৎকার করল গীতালি। যেন বলতে চাইল, তুমিই শুধু আমাকে চেনোনি, আমিও তোমাকে চিনেছি।

যেন লজ্জা পেল বাসুদেব, চোখ ফিরিয়ে নিল। কোথায় গীতালি লজ্জা পাবে, এ যেন বিপরীত ব্যাপার!

বাসুদেবের এ লজ্জার স্খালন হবে কিসে? সাহস করে তাকাল গীতালির দিকে। গীতালির দেহে নবতর সম্ভাবনা। সেই নবীনই ক্ষমা করে নেবে পুরোনোকে। যেন খোকনকে পাই, যেন পাই গীতালিকে।

দুজনেই গেল, গীতালি আর বাসুদেব।

সুপ্রভাত বাড়ি ফিরে এসে দেখল তার ঠাকুর অমলেট তৈরি করে দিয়েছে আর পেলেটে চামচের শব্দ করতে করতে তাই পরিপাটি করে খাচ্ছে নলিনেশ।

'শুনেছেন সব?' জিগগেস করল নলিনেশ।

'শুনেছি। যাক, প্রাণে যে মারেনি।' বললে সুপ্রভাত।

'না, প্রাণে মারেনি, আমাকেও না আপনাকেও না।' খেতে লাগল নলিনেশ।

'কিন্তু বসে আছেন কেন?' তাড়া দিল সুপ্রভাত. 'থানায় চলুন। খোয়া জিনিস দিচ্ছে সেখানে।'

'আমি তো মাহবুবের জন্যে বসে আছি।'

'এই আপনার ধারণা? মাহবুব বাড়িতে দিয়ে যাবে? হয় সে আদৌ ফিরবে না, নয়তো থানায় পেণছে দেবে। চলুন, দেখে আসি।'

অপরাধী যেমন থানায় যায় তেমনি করে গেল দুইজন। কোমরের দড়ি অদৃশ্য ভাগ্যের হাতে ধরা।

'আপনার স্বামী নলিনেশবাবু মহৎ—' জিপে করে থানার দিকে এগুতে এগুতে বললে মাহবুব।

'মহৎ?' পরমা ভেবেছিল কিছু বলবে না, তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অজানতে।

'একশোবার। তিনি মহৎ বলেই তো আমাকে বিশ্বাস করলেন।' বললে মাহবুব, 'আর, বিশ্বাস করলেন বলেই তো বাঁচাতে পারলাম আপনাদের, রাখতে পারলাম সম্মান। নইলে, যদি বিশ্বাস না করতেন, যদি ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে কি হত তার ঠিক কি। হিংস্র আনন্দে আততায়ীরা আক্রমণ করত, আর কে জানে, আমিই হয়তো থাকতাম তাদের দলে, হতাম তাদেরই একজন। রক্ষা করেছেন আমাকে।'

'আপনিই মহৎ।' সোহিনী বললে।

'তা যদি বলেন, নলিনেশবাবুর মহত্ত্বই তার মূল। স্পর্শমণিই লোহাকে সোনা করে। বিশ্বাসই সেই স্পর্শমণি।' সহজ দিনের আলোর